গবেষণামূলক স্মারক গ্রন্থ

# শাহাদাতে কারবালা

৪র্থ সংখ্যা ২০০৯

مقام الامام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ

ضریح مطہر حضرت سید الشہداء رضی اللہ عنہ


শাহাদাতে কারবালা মাহ্‌ফিল পরিচালনা পরিষদ

জমিয়তুল ফালাহ্ কমপ্লেক্স, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

# শাহাদাতে কারবালা গবেষণামূলক স্মারক গ্রন্থ

মাহফিল বর্ষ : ২৪ তম। প্রকাশনা বর্ষ : ৪র্থ। সংখ্যা : ৪র্থ
১ মুহার্‌রাম ১৪৩১, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৯, ৫ পৌষ ১৪১৬

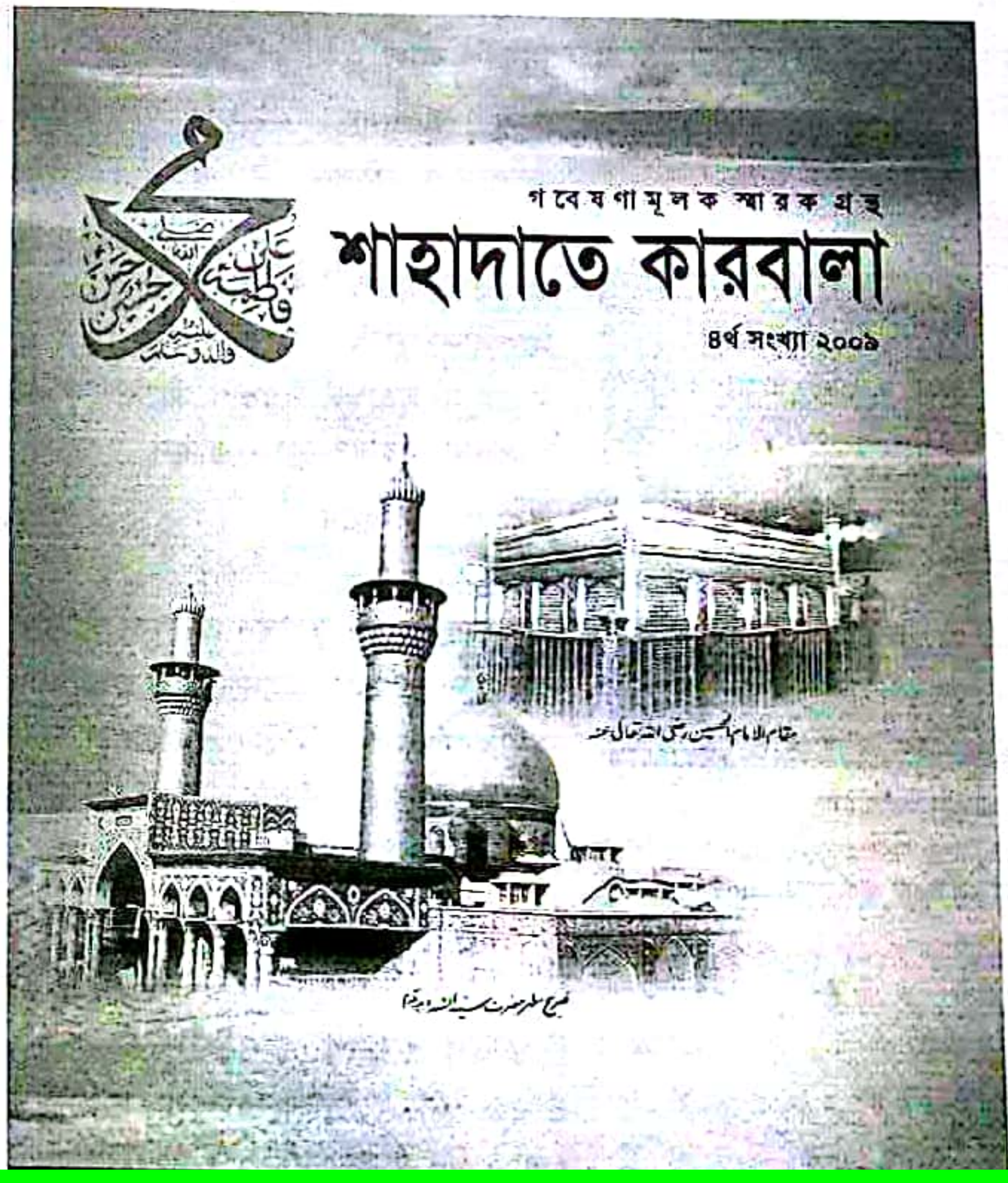


SahihAqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

শাহাদাতে কারবালা মাহ্‌ফিল পরিচালনা পরিষদ
জমিয়তুল ফালাহ্ কমপ্লেক্স, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

# শাহাদাতে কারবালা গবেষণামূলক স্মারক গ্রন্থ

মাহফিল বর্ষ : ২৪ তম। প্রকাশনা বর্ষ : ৪র্থ। সংখ্যা : ৪র্থ

**প্রচ্ছদ পরিচিতি :**
ইমাম হোসাইন (রা.)'র রওযা পাক (মাথা মোবারক), মিসর
ইমাম হোসাইন (রা.)'র রওযা পাক (দেহ মোবারক), ইরাক

**প্রকাশ কাল**
১ মুহার্‌রাম ১৪৩১, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৯, ৫ পৌষ ১৪১৬

**সম্পাদনা পরিষদ**
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল্-কাদেরী
মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্
মাওলানা মুহাম্মদ শায়েস্তা খান
মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার
মাওলানা মুহাম্মদ মুঈন উদ্দিন

**প্রকাশনা পরিষদ**
আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ
আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল লতিফ
আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক
অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহমদ
মুহাম্মদ সালামত উল্লাহ

**প্রকাশনা**
শাহাদাতে কারবালা মাহ্‌ফিল পরিচালনা পরিষদ
জমিয়তুল ফালাহ্ কমপ্লেক্স, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

**ডিজাইন ও মুদ্রণ**
ইমেজ সেটিং লি. আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মূল্য : ৬০ টাকা

**SHAHADAT-E-KARBALA**
A Research Journal

**Published by**
**Shahadat-e-karbala Mahfil Organizing Committee**
Jamiatul Falah Complex, Dampara
Chittagong, Bangladesh.
Muharram 1, 1431 December 19, 2009 Paush 5, 1416

Price : Tk. 60.00 US $ 5

শাহাদাতে কারবালা
গবেষণামূলক স্মারক গ্রন্থ

মাহফিল বর্ষ : ২৪ তম
প্রকাশনা বর্ষ : ৪র্থ
সংখ্যা : ৪র্থ
১ মুহার্‌রাম ১৪৩১
১৯ ডিসেম্বর ২০০৯
৫ পৌষ ১৪১৬

## সম্পাদকীয়

সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে মানুষের হিদায়তের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল (আ.) প্রেরণ করেন। নবী-রাসূলগণ স্ব-স্ব যামানায় উম্মতদের হিদায়তের পথ প্রদর্শন করে দীন প্রতিষ্ঠায় দায়িত্ব পালন করেন। খাতিমুন নবীয়্যীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রূপে আল্লাহর দীন 'ইসলাম'কে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ইসলামের সুষ্ঠু বিকাশে খোলাফায়ে রাশেদীন যথার্থ ভূমিকা পালন করেন। খেলাফতে রাশেদার পর ইসলামের শাশ্বত আদর্শ সমুন্নতকরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন হযরত রাসূলে করীম (দ.) এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)। ইসলামের মৌল নীতি-আদর্শ বিকশিতকরণের এক পর্যায়ে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন জিহাদে তিনি সপরিবারে কারবালার প্রান্তরে পাষণ্ড ইয়াযিদ বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ইসলামের জীবনী শক্তি বেগবান হয়। নবীজির সাজানো ইসলামের বাগানকে সুশোভিত করতে নবী দৌহিত্রের সপরিবার আত্মত্যাগ বিশ্ব ইতিহাসে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমুজ্জ্বল থাকবে। ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত সম্পর্কে অলীকূল সম্রাট হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র.) যথার্থ বলেছেন: 'দীন আস্ত হোসাইন, দীনে পানাহ্ আস্ত হোসাইন'। অর্থাৎ দীন মানেই ইমাম হোসাইন, আর দীনের সুরক্ষা হয়েছে ইমাম হোসাইনের নিকট। তাই প্রতিটি মু'মিন-মুসলমানকে ঈমানের পূর্ণতার জন্য ইমাম হোসাইন তথা আহলে বায়তে রাসূলকে ভালবাসতে হয়। স্মরণ রাখতে হবে, আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর ভালবাসা চরিতার্থ করতে ইসলামের ত্রাণকর্তা প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব (রা.) ও ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ফারূক্বে আযম হযরত উমর (রা.)কে অবহেলা করা যাবে না। ইসলামের পরিভাষায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতেমাতুয যাহ্‌রা (রা.), হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) হলেন 'পাক পঞ্জতন'। পাকপঞ্জতন সদস্য ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) এর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে গিয়ে কাতেবে ওহী হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) কে অসম্মান করা যাবে না।

পাকপঞ্জতন, কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা, করবালায় ইমাম হোসাইন (রা.) এর সপরিবার আত্মত্যাগ ও ইসলামের মৌল আদর্শের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে 'শাহাদাতে কারবালা মাহ্‌ফিল' এর প্রবর্তন। ১৯৮৬ সালে জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদে পহেলা মুহাররম হতে ১০ মুহাররম পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী এ মাহফিলের মাধ্যমে চট্টগ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম 'শাহাদাতে কারবালা মাহফিল' এর সূচনা হয়। আল্লাহ্‌পাক তাঁর হাবীবে পাকের প্রিয় দৌহিত্রের পরম আত্মত্যাগের বিশদ বর্ণনার মাহফিলটি কবুল করায় আমরা আল্লাহ্‌পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। মাহ্‌ফিল পরিচালনা পরিষদ কারবালার প্রেক্ষাপট ও এর যথার্থ চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণসহ এর শিক্ষা ও আদর্শে মুসলিম উম্মাহ্‌কে উজ্জীবিত করে আসছে। জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত 'শাহাদাতে কারবালা মাহফিল' এর আদলে আজ চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও কারবালা ও ইমাম হোসাইন (রা.) স্মরণে মাহ্‌ফিল, সভা, সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আল হামদু লিল্লাহ। বিগত চার বছর থেকে শাহাদাত দর্শন, ঐতিহাসিক কারবালা, পাকপঞ্জতন, পাষণ্ড ইয়াযিদ ও খোলাফায়ে রাশেদীনসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ 'শাহাদাতে কারবালা গবেষণা স্মারক গ্রন্থে' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এবারের এই প্রকাশনায় মুদ্রনে আর্থিক সহযোগিতা করায় সৈয়দ মুহাম্মদ সেহাব উদ্দিন আলমকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। এছাড়া আরো যারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ।

মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ, আমাদের এ স্মারকগ্রন্থ যেন সকলের কাছে সমাদৃত হয় এবং পথহারা মুসলমানদের দৃঢ় ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে শেখায়। আমিন।

# শাহাদাতে কারবালা গবেষণামূলক স্মারক গন্থ

মাহফিল বর্ষ : ২৪ তম। প্রকাশনা বর্ষ : ৪র্থ। সংখ্যা : ৪র্থ


প্রসঙ্গ : শাহাদাতে কারবালা মাহ্ফিল ০৫
আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দিন আল্-কাদেরী

ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদাত মুসলিম জাতির প্রতি এক অনন্য বার্তা ০৭
প্রফেসর ড. আ.ন.ম মুনির আহমদ চৌধুরী

আল আরবাঈন ফী মানাকিবি আবওয়াইল হাসনাইন ১৯
ড. এস এম রফিকুল আলম

আল আরবাঈন ফী মানাকিবিল হাসনাইন ২৯
মাওলানা মুহাম্মদ মুঈন উদ্দিন

তাজেদারে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদাত ৪৫
মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রেজভী

কারবালা : ইসলামের ইতিহাসের কালো অধ্যায় ৫৩
হাসান আকবর

আহ্লে বায়তে রাসূল (দ.) : রক্তাক্ত কারবালা ৫৭
মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্

পবিত্র মুহার্রম, আশুরা এবং আহলে বাইত ১০৭
মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন

ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদাত : নবী চরিত্রের একটি অধ্যায় ১১১
মাওলানা নুরুল আবছার তৈয়বী

প্রিয় নবীর ও আহলে বাইতে রাসূলের মুহাব্বত ঈমানের পরিচায়ক ১৩১
মাওলানা সাইফুর রহমান নিজামী

শাহাদাতে কারবালা মাহ্ফিল পরিচালনা পরিষদ ও আজীবন সদস্য ১৩৫


SahihAqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)



## প্রসঙ্গ ঃ শাহাদাতে কারবালা মাহ্ফিল

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল্কাদেরী*

চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম ইসলামাবাদ। প্রাকৃতিক এ অঞ্চলে যুগে যুগে অনেক অলী বুযুর্গ আগমন করেন। আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে ও বিশেষত পারস্য থেকে অনেক বণিক ও ধর্ম প্রচারক আগমন করেন এ নগরে। তাঁদের ব্যবহৃত ও প্রচলিত কিছু শব্দ এ দেশের আঞ্চলিক ভাষায় স্থান পায়। অনেক স্থানের নামকরণও হয় তাঁদের ব্যবহৃত শব্দে এবং তাঁদের নামানুসারে। কদম মুবারক, শুলকবহর (শহরে যাওয়ার রাস্তা), হালিশহর (শহরের চারপাশ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ঐহিত্য ও স্মৃতি আমাদের গৌরবান্বিত করে। এ অঞ্চলের প্রাচীন-নতুন ইসলামী নিদর্শন সাধারণ মানুষকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। হযরত বায়েজীদ বুস্তামীর আস্তানা পাক, কদম মুবারক, হযরত আমানত শাহ (র.) এর দরগাহ, হযরত বদর শাহ (র.) এর দরগাহ ও চাটিসহ নতুন নিদর্শনের মধ্যে কুতুবুল আউলিয়া হযরত শাহসুফী আল্লাহ সৈয়্যদ আহমদ শাহ (র.) এর আলমগীর খানক্বাহ শরীফ এবং জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ ইত্যাদি ধর্মপরায়ণ মানুষের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছে। জমিয়াতুল ফালাহ জাতীয় মসজিদের খতীব হিসেবে এতদঞ্চলের মুসলমানদের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। সে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের তাগিদে শতধা বিভক্ত মুসলমানদের হেদায়ত তথা সত্যের পথ দেখানো আমার অভীষ্ট লক্ষ্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথ 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' তথা সিরাতে মুস্তাকীমের প্রতি মুসলমানদের আহবান করা এবং আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের পথে আহবান করাই আমার প্রয়াস।

আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, তাগুতি শক্তির কাছে আজ মুসলমানদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পন বিবেকবান মানুষকে তাড়িত করছে। সারাবিশ্বে ইহুদী-নাসারাদের নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও তাদের বিছানো জালে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মুসলমানরা ধুঁকে ধুঁকে মরছে। যে বা যারা আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার বা তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাতে তৎপর, তাদের বিরুদ্ধে নির্মম নির্যাতন ও নিপীড়নের স্টীম রোলার চলছে। ক্ষেত্রবিশেষে গুপ্তহত্যা ও গণহত্যায় নিঃশেষ করে দিচ্ছে বিশ্বের প্রতিবাদী মুসলমানদের। তাগুতি শক্তি প্রয়োগকারীরা জানে, শত নির্যাতন করেও প্রকৃত মুসলমানদের ঈমান বিনষ্ট করা সম্ভব নয়। তাই তারা মুসলমানদের ঈমান হননের জন্য বেছে নিয়েছে বিভিন্ন কুটকৌশল। নারী ও ধন-সম্পদের লোভসহ নানাবিধ কৌশলের মাধ্যমে কিছু নামধারী মুসলমানকে ব্যবহার করে যুগে যুগে সাধারণ মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করার ঘটনা ইতিহাস স্বীকৃত।(চৌদ্দশ' বছর পূর্বে নবী করীম (দ.) ইরশাদ করেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা শিরক করবে এ ভয় আমি করি না; কিন্তু তোমাদের দুনিয়াপ্রীতিই আমার ভয়' ।) বর্তমানে মুসলমানদের একটি বড় অংশকে পার্থিব লোভ-লালসা চরিতার্থ করার হীন মানসিকতা নিয়ে দৌড়ঝাপ দেখে নবী করীম (দ.) এর এই হাদীসটি মনের অলিন্দে বার বার ভেসে ওঠে।

দুনিয়ার লোভ-লালসা হতে বিরত হেয় সঠিক মত ও সরল পথে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য দয়াল নবী (দ.) উম্মতদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদের কাছে দু'টো জিনিষ রেখে যাচ্ছি, তোমরা তা আঁকড়ে ধরলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর বাণী কুরআন মজীদ, অপরটি আমার বংশধর তথা আহলে বায়ত'। অপর এক হাদীসে নবী করীম (দ.) ইরশাদ করেন- 'আমার আহলে বায়ত হল নূহ (আ.) এর কিস্তির ন্যায়। যে সেখানে আরোহন করবে সে নাজাত পাবে, আর যে আরোহন করবে না, সে ডুবে মরবে'। আহলে বায়তের গুরুত্ব ও মর্যাদা কতখানি তা আমরা একটি ঘটনাতে দেখতে

পাই। আর তা হল- একদা নবী করীম (দ.) চাদরের আঁচল প্রশস্ত করে তাতে রাসূলে পাকসহ হযরত আলী (রা.), হযরত মা ফাতিমা (রা.), হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) বসে পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমার আহলে বায়তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, যেমন আমি তাদের ওপর সন্তুষ্ট আছি'। তাই যুগে যুগে সত্যিকার উলামায়ে কেরাম আহলে বায়তে রাসূল (দ.) সম্পর্কে সমাজবাসীকে নানাভাবে অবহিত ও সতর্ক করে আসছেন। মু'মিন বান্দারা তাঁদের শানে কিতাব লিখে, প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করে, সভা সমাবেশ ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে আহলে বায়তে রাসূলের (দ.) শান, মান-মর্যাদা প্রতিফলনে ভূমিকা রেখে আসছেন। আহলে বায়তের অন্যতম হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত ইসলামের 'মূল টার্নিং পয়েন্ট' হিসেবে বিবেচিত। তাই বলা হয়ে থাকে- 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কি বাদ'।

বার আউলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রামে অবস্থিত জমিয়াতুল ফালাহ জাতীয় মসজিদে বিগত ২৩ বছর ধরে শাহাদাতে কারবালা মাহফিলের আয়োজন করে পাক-পঞ্জতন বিশেষতঃ সৈয়্যদুশ শোহাদা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত বিষয়ে বিশদ আলোচনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৯৮৬ সালের ১লা মুহাররম থেকে ১০ মুহাররম পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত মাহফিলের মাধ্যমে চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে আশুরা দিবসের মাহাত্ম্য উপস্থাপনের ব্যবস্থা করি। আল্লাহ পাকের দরবারে মাহফিলটি কবুল হওয়ায় বর্তমানে চট্টগ্রামসহ দেশের সুন্নী মুসলমানদেরকে নানাভাবে এ মাহফিল উদ্‌যাপন করতে দেখে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এ মাহফিলের বাস্তবায়নে দেশের প্রসিদ্ধ ও হক্কানী পীর-মাশায়িখ, আলেমে দ্বীন, ইসলামী চিন্তাবিদ, ইতিহাসবিদ ও গবেষকসহ জ্ঞানী-গুণীদের পরামর্শ, উৎসাহ ও বিত্তশালী মহৎ ব্যক্তিদের আর্থিক ও শারীরিক নানাভাবে আন্তরিক সাহায্য সহাযোগিতা পেয়ে আসছি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁদের রূহের মাগফিরাত ও রাফয়ে দারাজাত কামনা করছি। আর যাঁরা এখনো এ মহান প্রয়াসে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছেন, মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাঁদের সার্বিক উন্নতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করছি। মহান পাক পঞ্জতন ও আহলে বায়তের শানে ধারাবাহিকভাবে আমাদের এ প্রয়াস অব্যাহত রাখতে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর শাহী দরবারে ফরিয়াদ করছি। আল্লাহ পাক আমাদের এ আয়োজন কবুল করুন। আমীন। বেহুরমতে সৈয়্যদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়াসাল্লাম।

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আলকাদেরী
চেয়ারম্যান, শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা পরিষদ
খতীব, জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ
অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।





## ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদাত
# মুসলিম জাতির প্রতি এক অনন্য বার্তা

প্রফেসর ড. আ.ন.ম. মুনির আহমদ চৌধুরী*

যখন থেকে এ ধরাতে সমাজনীতি রাজনীতি শুরু হয় তখন থেকেই মানুষের উত্থান পতনের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। একসময় দেখা যায়, কোন শক্তিশালী রাজা-বাদশাহর পৃথিবী জুড়ে সুনাম-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর এমন এক সময়ও আসে যখন তাকে সিংহাসন ছাড়া করে অপমান ও লাঞ্ছনার অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে হয়। যেই সিংহাসনে সে আরোহণ করল, গতকাল সেই সিংহাসনে অন্য কেউ ছিল। তাকে বঞ্চিত করে যে ব্যক্তি এতে আরোহণ করল সে মনে করে তার এ রাজত্ব সিংহাসন চিরদিন থাকবে এটা নিতান্তই ভুল ধারণা।

**পার্থিব সফলতা কোন সফলতাই নয় :**

যেসব লোককে আল্লাহ তায়ালা শক্তি সামর্থ দান করেন, তারা শক্তি সামর্থের নেশায় মত্ত হয়ে এ ধারণা পোষণ করে যে, আমরা স্থায়ী সফলতা অর্জন করেছি। এদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

لايغرنك تقلب الذين فى البلاد

অর্থ : (হে ঈমানদারগণ) কাফেরদের (নিশ্চিন্তে) দেশে ঘুরাফেরা করা যেন তোমাদেরকে ধোকায় পতিত না করে।

সূত্র : সূরা আলে ইমরান-১৯৬

এ নশ্বর পৃথিবীতে কারো সাফল্য ও কারো শক্তি সামর্থ অর্জন করা স্থায়ী সাফল্য নয়। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, হে ঈমানদারগণ বদবখ্‌ত কাফের, যালিম, ফাসিক, মুনাফিক ও শয়তানী শক্তি সামর্থের অধিকারী লোক যারা পৃথিবীতে শক্তির নেশায় দম্ভ সহকারে চলাফেরা করে, তাদের কিছুদিনের এ দম্ভ আচরণ যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে যে, তারা আসলেই সফলকাম। যখন সময় হবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন এবং এত বেশি লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন যে, যুগের পর যুগ মানুষ শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে তাদের স্মরণ রাখবে।

কুরআন মজীদে এ বিষয়ে বলা হয়েছে- متاع قليل ثم ماواهم جهنم و بئس المهاد

অর্থ : তাদের এ পার্থিব উপভোগ অতি অল্পদিনের জন্য। অতঃপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এটি অতি নিকৃষ্ট ঠিকানা।

বলা হচ্ছে, যালিম ও ফাসিকদের কিছুদিনের শক্তি সামর্থের নেশায় মত্ত হওয়া যেন, তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। কেননা, এ পার্থিব উপভোগ তো অতি কম সময়ের জন্য। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদের গ্রেফতার করবেন তখন এ মান-সম্মান প্রভাব প্রতিপত্তি সবই মরিচিকায় রূপান্তরিত হবে এবং এসব প্রজ্জ্বলিত আগুনের লীলা শিখায় পরিণত হবে। তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল বড়ই কঠিন ও মর্মন্তুদ।

অনেক লোক সিংহাসনে বসে নিজেকে খোদা দাবী করতেও দ্বিধা করেনি। পুরো দুনিয়াতে তার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কি না করেছে! কিন্তু তাকেও পরিশেষে এমন পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে যা ভাষায় প্রকাশ করাও কঠিন।

শক্তি সামর্থে উম্মাদ শাসকবর্গ ইয়াযিদী ও ফেরাউনী আচরণ করতে এবং অল্প কয়দিনের এ প্রভাব প্রতিপত্তিতে অহংকারী হয়ে উঠে। তাদের বুঝতে হবে পার্থিব সফলতা স্থায়ী কোন সাফল্য নয়। বরং যারা

মহান রাব্বুল আলামিনের ধর্মের প্রতি অবাধ্য হয় এবং আল্লাহর দেয়া বিধি বিধান পদদলিত করে আল্লাহ তায়ালা তাদের অবাধ্যতায় ঢিল দেন যাতে তারা চরম বিপর্যয়ে পৌঁছে। যখন তাদের অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার পরিণতির শেষপ্রান্তে পৌঁছে তখনই আল্লাহর শাস্তি তাদের পাকড়াও করে, তাদের নিঃশেষ করে চিরতরে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। যুগে যুগে মানুষ তাদের চরম পরিণতিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে।

ইয়াযিদেরও কয়েকদিনের জন্য দুনিয়াতে রাজত্ব ছিল। কিন্তু সে তার ঈমান বিকিয়ে নবী পরিবারের ওপর বর্ণনাতিত নির্যাতনের স্টিম রোলার চালায়। কারবালার মরুপ্রান্তরে ক্ষুধা আর পিপাসায় কাতর আহলে বায়তে রাসূল (দ.) ও তাদের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে ৭০ জনকে নির্মমভাবে শহীদ করে। অতঃপর এ ইয়াযিদের ওপর সেসময়ও আসল মানুষ তার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে এক লাখ সত্তর হাজার ইয়াযিদীকে হত্যা করল।

যে ইয়াযিদ মদীনায়ে তৈয়্যবায় তার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিল। তিনদিন যাবত মসজিদে নববীকে তাদের ঘোড়ার আস্তাবল করেছিল এবং যারা তিনদিন যাবত মসজিদে নববীতে আযান, ইকামত, নামায আদায় করতে দেয়নি। সেই ইয়াযিদের ওপর এমন সময়ও এসেছে তার কবর গাধা-ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে তার শেষচিহ্ন কবরটাও হারিয়ে গেছে; কিন্তু ইমাম হোসাইন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিজেদের তাজা রক্ত দিয়ে ইসলামকে জীবন্ত করে গেলেন এবং নিজেরা শহীদ হয়ে উম্মতকে উজ্জীবিত করে গেলেন।

**শাহাদাতে ইমাম হোসাইনের বার্তা :**

শাহাদাতে ইমাম হোসাইন আমাদেরকে দু'ধরণের বার্তা দিয়ে গেছে। ১. পরিশ্রম ও কর্মপ্রচেষ্টার বার্তা ও ২. শান্তির বার্তা।

**পরিশ্রম ও কর্মপ্রচেষ্টার বার্তা :**

শাহাদাতে ইমাম হোসাইন (রা.) এর প্রথম বার্তা কর্ম প্রচেষ্টার বার্তা। ইমাম হোসাইন (রা.)'র ভালবাসা, সম্পর্ককে প্রথাসর্বস্ব না করে বরং তাকে কার্যকারিতার বাস্তব রূপ দেয়া চাই। একেই জীবনের মূলমন্ত্র করা চাই। আমাদের শয়নে স্বপনে যেন এই মন্ত্রই হয়। আর এ সম্পর্ককে বাস্তব জীবনের মূলমন্ত্র করার মানে হল ইয়াযিদী কর্ম কী আর হোসাইনী কর্ম কী তা উপলব্ধি করা।

ইয়াযিদ প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করেনি। সে মূর্তিপূজাও করেনি, মসজিদ ধ্বংস করেনি। সে ইসলামের নাম নিয়ে মানুষকে বায়াত করাত। সে এও বলত যে, আমি নামায পড়ি। ইসলামের প্রকাশ্য অস্বীকার তো শুধু আবু লাহাবই করতে পারে। সুতরাং ইয়াযিদিয়াত হল, ইসলামের নাম মুখে নিয়ে তার সাথে প্রতারণা করা, ইসলামের নামে আমানত খেয়ানত করা, ইসলামের নাম নিয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, ভিন্ন মতাবলম্বীদের নিঃশেষ করা এবং ইসলামের পবিত্র নামটি পদদলিত করা। ইয়াযিদিয়াত হল ইসলামের সাথে প্রতারণা ও মুনাফিকি করার নাম। ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে প্রতারণা করা, আমানত খেয়ানত করা, বায়তুলমাল অপচয় করা, জনগণের সম্পদ নিজের আরাম আয়েশের জন্য খরচ করাই ইয়াযিদিয়াত।

রূহে হোসাইন আমাদের চিৎকার দিয়ে বলছে- ওহে, আমার প্রতি ভালবাসার দাবীদার! আমি দেখতে চাই, আমার প্রতি ভালবাসা অনুষ্ঠানসর্বস্ব, নাকি তোমরা বাস্তবই আমার ন্যায় আরেকটি কারবালা সংগঠিত করেছ। আমি দেখতে চাই, নব্য ইয়াযিদের প্রতি তোমাদের ইস্পাত কঠোর সংগ্রাম দানা বাঁধে কিনা? রূহে হোসাইন পুনরায় ফোরাত নদীর তীরের ধূসর মাটি রক্তে রঞ্জিত দেখতে চায়, তোমাদের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার পরীক্ষা নিতে চায়। রূহে হোসাইন দেখতে চায় বাস্তবে কে ইসলামের ঝান্ডা সুউচ্চ করার জন্য শরীর মন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। আমার প্রকৃত প্রেমিক কে?





শাহাদাতে ইমাম হোসাইনের শিক্ষা হল, দেখি! তোমাদের যুগে মুসলিম জাতির শাসকবর্গ প্রকৃত নিষ্ঠাবান কিনা? তারা ইসলামী বিধি-বিধান প্রচলন করতে সত্যিই আগ্রহী কিনা? তারা ইসলামের নামে আমানতের খেয়ানত করছে না তো? ইসলামী বিধি বিধান প্রচলনে প্রতারণা করছে না তো? যদি তারা মুখে ইসলামের নাম নেয় এবং মুনাফিকি ও প্রতারণাও করে তাহলে বুঝে নাও যে, তাদের কাজই ইয়াযিদী কাজ। হোসাইনের পয়গাম হল, যেখানেই তোমাদের সামনে ইয়াযিদিয়াতের নাম নিশানা দেখা যাবে সেখানেই হোসাইনী বাহিনীর সৈন্য হয়ে ইয়াযিদিয়াতের সকল অপশক্তিকে ক্ষত-বিক্ষত করে দাও। যদিও এতে তোমার ধন-সম্পদ, জানমাল ও প্রিয়জনদের প্রাণ গেলে, যাক।

**শান্তির বার্তা :**

ঈমানদারদের জন্য শাহাদাতে ইমাম হোসাইন (রা.) এর দ্বিতীয় বার্তা হল, শান্তির বার্তা। কতই না আফসোসের কথা যে, যখন নবী দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাতের মাস মুহাররম আসে তখন পুরো মুসলিম বিশ্বে ফেতনা ফ্যাসাদের জোয়ার বয়ে যায়, গোলাগুলি হয়, কারফিউ জারি হয়, একে অপরের গলা কাটাকাটি করে, পুরো মুসলিম বিশ্ব ফেতনা ফ্যাসাদের এ বিপর্যস্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অমুসলিমদের সামনে মুসলমানরা হাসি ঠাট্টার পাত্র হয়। মুসলমানরা না রাসূলের ওপর ঐক্যমত পোষণ করে, না সাহাবাগণের ওপর, না আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর ওপর, না কুরআনের ওপর! বরং তারা কোন শান্তির প্রস্তাবেও ঐক্যমত হয় না। বলুন! কোন্ মুখে আমরা অমুসলিমের সামনে ইসলামের দাওয়াত দেব?

**রাসূলে মুস্তফা (দ.)'র সাথে সম্পর্কই ঈমান :**

হুযুর নবী করিম (দ.) এর সাথে সম্পর্কই ঈমান। কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

محمد رسول الله و الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا

অর্থ : মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর রাসূল। যারা তার সাথে আছে, তারা কাফেরের বিরুদ্ধে কঠোর (কিন্তু) পরস্পরে দয়ালু, (হে প্রত্যক্ষকারী) তুমি তাদেরকে রুকু-সেজদায় দেখবে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করছে। সূত্র : সূরা ফাতাহ-৪৮

এ আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর কথা ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এটা ভাবনার বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালা ঈমান ইসলামের মূলমন্ত্র ও মুসলমানের পরিচয়ের জন্য যে, শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন তাহল 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'। তাঁর নামকে ঈমান ইসলামের মূলমন্ত্র হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর যে বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বায়তে রাসূল (দ.) ও খোলাফায়ে রাশেদীন উদ্দেশ্য। এদেরকে 'তাঁর সঙ্গপ্রাপ্তরা' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সঙ্গ পেয়েছেন তাদের শান হল, তারা কাফের ও ধর্মের শত্রুদের প্রতি বড় কঠোর এবং পরস্পরে বড় দয়ালু ও সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক।

উপরিউক্ত আচরণ ইসলামের শত্রু ও ঈমানদার ভাইদের প্রতি। কিন্তু যদি তোমরা তাদেরকে নির্জন রাতে নামাযের মসল্লায় দেখ তখন আপাদমস্তক একজন বিনয়াবনত দেখতে পাবে, যাতে তার প্রভুর দরবারে আপাদমস্তক আনুগত্যের প্রতীক হয়ে সেজদাবনত দেখতে পাবে। সর্বদা সে একজন ইবাদত ও আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক হয়েই থাকে। সর্বদা তারা প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মগ্ন থাকে। এ চরিত্র ও গুণাবলী সাহাবী ও আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর কাছে শতভাগ ছিল। তারপরও আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কুরআন মজীদে 'নবীজির সঙ্গপ্রাপ্ত' বলে ভূষিত করেছেন। উম্মতের সাথে তাদের পার্থক্য

নির্ণয়কারী গুণ হল, তারা রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সঙ্গ পেয়েছেন, যার কারণে তারা পৃথকভাবে সাহাবী নামে ভূষিত হয়েছেন। যদি তাদের সঙ্গ ভাগ্যে না হত তবে তাদের অন্যসব গুণাবলী দ্বারা আলেম, ফাযেল, মুজাহিদ, গাজী, মুত্তাকী ইত্যাদি হতে পারতেন, কিন্তু সাহাবী হওয়া সম্ভব হত না। এ অনন্য মর্যাদা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সঙ্গের কারণে উপার্জিত হয়েছে।

**রাসূল (দ.) এর সম্পর্কেই আহলে বায়ত ও সাহাবীগণের পরিচয় :**

উপরিউক্ত আয়াতে রাহমাতুল্লিল আলামীনের রেসালতের বর্ণনা দেয়ার পর তাঁর সঙ্গী-সাথীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা আমার প্রিয় রাসূলের সঙ্গ গ্রহণ করেছেন তাদের নিদর্শন ও গুণাবলী এরূপ যেন কুরআন মজীদ একথা আমাদেরকে অনুধাবন করতে বলে যে, আহলে বায়ত হোক কিংবা সাহাবী যার যে সম্মান হাসিল হয়েছে তা দু'জাহানের আকা হুযুর নবী করিম (দ.) এর সম্পর্ক ও গোলামীর মাধ্যমে হাসিল হয়েছে। এটি রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সঙ্গ ও গোলামীর ফসল যে, হযরত আবু বকর (রা.) 'সিদ্দিকে আকবর' হয়েছেন, হযরত ওমর (রা.) 'ফারূকে আযম' হয়েছেন, হযরত ওসমান (রা.) 'যিন-নূরাইন' হয়েছেন এবং হযরত আলী (রা.) 'হায়দারে কাররার' হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সম্পর্কই সাহাবী ও আহলে বায়তের পরিচয়। অন্যভাষায়, আল্লাহ একথাই বুঝাতে চান যে, তোমরা সাহাবীগণকে সম্মান করো আমার রাসূলের কারণে এবং আহলে বায়তে রাসূল (দ.)কেও সম্মান করো আমার প্রিয় মাহবুব নবীর কারণে। যেসব লোক হুযুর নবী করিম (দ.) এর প্রতি ঈমানের দাবীদার এবং তাঁর মুহাব্বত ও আনুগত্যের পূজারী, তোমাদের জন্য জরুরী যে, তোমরা রাসূলল্লাহ (দ.) এর কারণে সাহাবীদের ভালবাসবে এবং তাঁর আহলে বায়তকে ভালবাসবে।

**আহলে বায়ত ও সাহাবীগণের সাথে সমান সম্পর্ক রাখা চাই :**

সূরায়ে ফাতাহ এর উক্ত আয়াতের [নবীজির সঙ্গপ্রাপ্ত] অংশটি একথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়তে রাসূল (দ.) উভয়ের প্রতি সমান সম্পর্ক ও ভালবাসা রাখা প্রয়োজন। যে বা যারা রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সঙ্গপ্রাপ্তদের মধ্যে যেকোন একদল হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, চাই তারা সাহাবী থেকে কিংবা আহলে বায়তে রাসূল থেকে তারা তাদের অর্ধেক সম্পর্ক তাজেদারে কায়েনাত থেকে ছিন্ন করেছে। সুতরাং কেউ যদি চায় যে, তার ঈমান পরিপূর্ণ হোক, তাহলে তাকে অবশ্যই সাহাবী ও আহলে বায়ত উভয়ের সাথে আদব সম্মান ও মুহাব্বতের সম্পর্ক রাখতে হবে।

**বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত উম্মত :**

দূর্ভাগ্যবশতঃ ইতিহাসের পাতায় উম্মতের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হওয়ার কথা লিপিবদ্ধ হয়। যদিও সর্বদা একটি দল সহজ-সরল পথে দৃঢ়তার সাথে স্থির ছিল। তন্মধ্যে আমরা দু'টি দলের কথা বলতে চাই যাদের একদল আহলে বায়তে রাসূল (দ.)'র প্রতি এতবেশি অগ্রসর হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করেছে। আর অন্যদল সাহাবাগণের প্রতি এতবেশি অগ্রসর হয়েছে যে, আহলে বায়তের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা শুরু করেছে। ক্রমশ তাদের মধ্যে একতরফা সম্পর্ক বৃদ্ধি হতে লাগল। এভাবে একদলের সাথে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আদব, সম্মান ও ভালবাসা হ্রাস পেল এবং এভাবে তারা ঈমানের একটি অংশ গ্রহণ করলেও অন্যটি প্রত্যাখ্যান করল। এ অবস্থা হযরত শেরে খোদা আলী (রা.) এর সময়কালের শেষের দিকের রাজনৈতিক অবস্থা উমাইয়া শাসকবর্গ বিশেষত ইয়াযিদ কর্তৃক আহলে বায়তের প্রতি কারবালা যুদ্ধে নির্মম পাশবিকতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

একদলের মনোযোগ শুধুমাত্র আহলে বায়তের প্রতি নিবিষ্ট হল এবং তারা নবী করিম (দ.) এর প্রতি সম্পর্কের অন্যদিক সাহাবায়ে কেরাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সাহাবায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন





হয়ে একসময় তাদের চিন্তা-চেতনা পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম বিরোধী হয়ে পড়ল।

এদের বিরোধিতা করতে গিয়ে অন্যদল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এতবেশি মনোযোগ নিবিষ্ট করল যেভাবে প্রথমদল আহলে বায়তে রাসূলের প্রতি করেছিল একপর্যায়ে এদের সম্পর্ক ও হৃদয়ের টান আহলে বায়ত (দ.) থেকে কেটে গেল এবং সাহাবায়ে কেরামের স্মরণ করতে করতে আহলে বায়তের স্মরণ পরিহার করল। এভাবে ঈমানের একটি অংশ তাদের অন্তর থেকেও মুছে গেল।

উম্মতের দুর্ভাগ্য যে, তারা আজ দু'দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। একদল তাদের বক্তব্য, লেখনীতে এবং বংশ পরম্পরায় এ মতবাদ প্রচলন করে আসছে যে, তারাই সুন্নী যারা শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে আলোচনা করে, তাদের মুহাব্বত করে। যদি কেউ হযরত শেরে খোদা আলী (রা.), হযরত ইমাম হাসান (রা.), হযরত ইমাম হোসাইন (রা.), ইমাম যায়নুল আবেদীন (রা.) ও অন্যান্য ইমামদের স্মরণ করে এবং তাদের মানাকেব ও গুণাবলী স্মরণ করে তবে তারা 'শীয়া' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

এভাবে আরেকদলের মনোভাব এমন হল যে, কেউ আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর কথা স্মরণ করলে সে মু'মিন। আর যদি সাহাবায়ে কেরামকে স্মরণ করে তবে অমুসলিম বেঈমান। একদল আহলে বায়তকে আপন করে নিল, অন্যদল সাহাবায়ে কেরামকে আপন করে নিল। এভাবে উম্মত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

ইসলাম ধর্মে এরচেয়ে বড় অন্যায় আর কি হবে? রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে যেভাবে আহলে বায়তকে ভালবাসা ঈমানের অংশ। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সাথে সম্পর্কের কারণে সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসাও ঈমানের অংশ। সুতরাং আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর প্রতি ভালবাসার নাম দিয়ে সাহাবায়ে কেরাম তথা খুলাফায়ে রাশেদার প্রতি যারা কটুক্তি করে তারা বেঈমান অভিশপ্ত ও জাহান্নামের ইন্ধন। তারা সাহাবায়ে কেরামের শান-মানকে অস্বীকার করে না বরং তারা রাসূলুল্লাহ (দ.) এর শান-মান অস্বীকার করে।

**এ বিভক্তির ক্ষতি :**

হুযুর নবী করিম (দ.) এর উম্মত এভাবে দু' ধারায় সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ায় এ বিভক্তির ক্ষতি এই হল যে, সাহাবী ও আহলে বায়তের নামে হওয়া যুদ্ধ রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সম্পর্ক ভুলিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (দ.) এর স্মরণ তাদের মধ্যে একদলকে এভাবে প্রভাবিত করে না যেভাবে তারা সাহাবায়ে কেরামের স্মরণে প্রভাবিত হয় এবং দ্বিতীয় দল আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর স্মরণে যেভাবে প্রভাবিত হয় সেভাবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (দ.) স্মরণে হয় না। উভয় দলের মূর্খতা কোথায় থেকে কোথায় গিয়ে পৌছল। সাহাবী বলুন বা আহলে বায়তে রাসূল (দ.) বলুন সকলেই রাসূলুল্লাহ (দ.)'র সাথে সম্পর্কের কারণে সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু আফসোস! যার কারণে তাদের পরিচিতি সম্মান হয়েছে তার যিকরে সে স্বাদ ও অনুভূতি এ দু'দলের মধ্যে পাওয়া যায় না। যেন ভিত্তি ভেঙ্গে দিয়ে দালান তৈরীর তোড়জোড়।

অতএব, জরুরী বিষয় হল প্রথমে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সম্পর্ক যা সবকিছুর মূল তা মজবুত করা। যখন রাসূলুল্লাহ (দ.) ই ঈমানের কেন্দ্র ও মূলভিত্তি মনে হবে তখনই রাসূলুল্লাহর (দ.) কাছে যা পছন্দনীয় তা আমাদের কাছেও পছন্দনীয় হবে এবং যা তাঁর কাছে অপছন্দনীয় তা আমাদের কাছেও অপছন্দনীয় হবে। এভাবেই দোস্ত-দুশমনের মাপকাঠি হবেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (দ.)ই। ভুল ও দুর্বলতা এভাবে দূরীভূত করা সম্ভব যে, প্রথমে আমরা ঈমানের মূলভিত্তি বুঝতে চেষ্টা করি।

**আহলে বায়ত কারা :**

আরবী ভাষায় ঘরকে বায়ত বলা হয়। ঘর তিন প্রকার। যথা: ১. বংশীয় ঘর (সম্পর্ক), ২. অবস্থানগত ঘর (সম্পর্ক) ও ৩. জন্মগত ঘর (সম্পর্ক)।

বংশগত ঘর বলতে মানুষের সে সম্পর্ককে বুঝায় যা বংশীয় আত্মীয়তার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ বাপ-দাদার কারণে সম্পর্ক। যথা- চাচা, ফুফী ইত্যাদি।

অবস্থানগত সম্পর্ক বলতে সে আত্মীয়কে বুঝায় যা ঘরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। যথা- স্ত্রীকূল রমণীগণ।

জন্মগত সম্পর্ক বলতে সেই বংশধরকে বুঝায় যারা ঘরে ভূমিষ্ট হন। এ দ্বারা পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনীকে বুঝায়।

যখন সাধারণভাবে আহলে বায়ত বলা হয় তখন উপরে বর্ণিত তিন প্রকারের সম্পর্ককে বুঝায়। শর্ত হল, তাদের ঈমানদার হতে হবে। এ তিন প্রকারের মধ্যে কোন একটি পরিহার করলে আহলে বায়তের অর্থই পরিপূর্ণ হয় না।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে- انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا

অর্থ : (হে নবীর পরিবারবর্গ!) আল্লাহ চান যে, তোমাদের থেকে (সকল প্রকারের) কলুষতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পুতঃপবিত্র করতে। সূত্র : সূরা আহযাব-৩২

অর্থাৎ হে প্রিয়নবীর (দ.) আহলে বায়ত! আল্লাহ চান যে, তোমাদের চরিত্র, কর্মকান্ড ভেতরে বাইরে সকল অপবিত্রতা থেকে এভাবে পবিত্র হোক যেন তোমাদের পবিত্রতা অনুসরণীয় অনুকরণীয় হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল পবিত্রতা তোমাদের থেকেই প্রসারিত হোক।

**পক্ষপাত পরিহার করা চাই :**

মানুষ যখন পক্ষপাতদুষ্ট হয় তখন তার কাছে নিজের মতলব ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। ধর্মকে যখন পক্ষপাত দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন নিজের মতলব অনুযায়ী ব্যাখ্যা করাই মূল লক্ষ্য হয়। সেই দু'দল যারা সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসা ও আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসার নামে হ্রাস-বৃদ্ধির শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে একদল উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হুযুর নবী করিম (দ.) এর স্ত্রীগণ উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের বের করে দিয়েছে। অর্থাৎ তারা আহলে বায়ত থেকে 'আহলে বায়তে মাসকন' কে বের করে দিয়েছে। তারা আহলে বায়ত থেকে পবিত্র স্ত্রীগণকে বের করে বলল যে, আহলে বায়ত বলতে শুধুমাত্র শেরে খোদা হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতেমা (রা.), হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)ই উদ্দেশ্য। অবশ্যই এ চারজন আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত এবং হুযুর নবী করিম (দ.) তাদেরকে পবিত্র চাদরে স্থান দিয়েছেন এবং তাদেরকে আহলে বায়ত না মানা রাসূলুল্লাহ (দ.) এর আদেশকে অস্বীকার করা। এখানে এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, একদল কিয়দাংশ আহলে বায়তকে মুরাদ নিয়ে অন্যদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। এদের বিরোধিতা করতে গিয়ে দ্বিতীয় দল বলল- আহলে বায়ত বলতে শুধুমাত্র নবীজির পবিত্র স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য। হযরত আলী (রা.), মা ফাতেমা (রা.) ও হাসনাইন করীমাইন (রা.) আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত নয়। উভয় দল কুরআন মজীদকে তাদের স্কুলের রেজিষ্টার খাতা মনে করেছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করাবে এবং যাকে ইচ্ছা বের করবে। (নাউযুবিল্লাহ)

ওহে মূর্খরা! ঘরের সকল সদস্যই ঘরের মালিকের নিকট প্রিয় হয়। রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সাথে যারা বংশগতভাবে সম্পর্কিত, অবস্থানগতভাবে সম্পর্কিত ও জন্মগতভাবে সম্পর্কিত ঈমানদার হওয়ার শর্তে সকলেই আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (দ.) এর প্রত্যেক আহলে বায়তের সদস্য ঈমানদারদের





কাছে সমান প্রিয় হওয়াই ঈমানের দাবী। হযরত সালমান ফারসী (রা.) যিনি রাসূলুল্লাহ (দ.) এর খাদেম ছিলেন তার ঘরে আসা-যাওয়া করতেন হুযুর নবী করিম (দ.) তাকেও নিজের আহলে বায়তের মধ্যে গণ্য করেছেন। যদিও তিনি আহলে বায়তের তিন প্রকারের মধ্যে কোনটিতেই পড়েন না। রাসূলুল্লাহ (দ.) যেখানে কাউকেও তাঁর আহলে বায়ত থেকে বাদ দেন নি, সেখানে মনগড়া ব্যাখ্যা করে কিয়দাংশকে আহলে বায়ত থেকে বের করা আমাদের কী অধিকার? এটি ইনসাফ নয়, এটি মূর্খতা ও পক্ষপাতদুষ্টতা। কোন কাজে কারো বিরোধিতা করার জন্য হলে, তাতে ইনসাফ হয় না; বরং তাতে মনগড়া হ্রাস-বৃদ্ধি ও পক্ষপাত হয়। ইসলামের শিক্ষা হল, পক্ষপাত পরিহার করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। আর এজন্য উম্মতে মুহাম্মদীকে কুরআন মজীদের পরিভাষায় 'উম্মতে ওয়াসাতা' বলা হয়েছে।

و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس

অর্থাৎ, (হে মুসলমানরা) এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী উম্মত করেছি যেন তোমরা মানুষের হেফাযতকারী হও। সূত্র : সূরা বাক্বারা-১৪২

যারা মধ্যপন্থা পরিহার করে বাড়াবাড়ি ও কাটছাট করে তাদের জন্য শেরে খোদা হযরত আলী (রা.) এর নিম্নোক্ত বাণীটি বড়ই গ্রহণযোগ্য।

হযরত আলী (রা.) বলেন- 'হুযুর নবী করিম (দ.) আমাকে বলেছেন যে, তোমার সাথে হযরত ঈসা (আ.) এর সাথে একদিক থেকে সাদৃশ্য আছে। ঈসা (আ.) এর সাথে ইহুদীরা বিদ্বেষ পোষণ করত। এমনকি তারা তাকে 'ব্যভিচারিনীর পুত্র' বলতেও দ্বিধা করেনি। আর নাসারারা তার প্রতি ভালবাসায় সীমালঙ্ঘন করে তাকে খোদার স্থান দিয়েছে। সাবধান! আমার কারণেও দু'টি দল পথভ্রষ্ট হবে।

محب مفرط يفرطني بما ليس في و مبغض يحمله شنآني على ان يبهتني

'একদল আমাকে ভালবাসতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করবে, আরেক দল আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে মিথ্যা অপবাদ দেবে।' সূত্র : মিশকাতুল মাসাবীহ

শীয়া সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য কিতাব 'নাহজুল বালাগাহ' এর মধ্যেও হযরত আলী (রা.) এর অনুরূপ একটি বক্তব্য আছে।

سيهلك في صنفان محب مفرط يذهب به الحب الى غير الحق و مبغض مفرط يذهب به البغض الى غير الحق و خير الناس في حالا النمط الاوسط فالزموه و الزموا السواد الاعظم فان يد الله على الجماعة واياكم و الفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب

'আমাকে নিয়ে দু'সম্প্রদায়ের লোক ধ্বংস হবে। একদল ভালবাসায় সীমালঙ্ঘন করবে। এ ভালবাসা তাদেরকে অসত্যের দিকে নিয়ে যাবে। অন্যদল বিদ্বেষ পোষণকারী। অর্থাৎ সীমার মধ্যে কাটছাটকারী। এ বিদ্বেষ তাদেরকেও অসত্যের দিকে নিয়ে যাবে। আর সবচেয়ে উত্তম দল হল, আমাকে নিয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী। অতএব, এ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং বড়দলের সাথে থাকো। কেননা, আল্লাহর সাহায্য এ দলের ওপর। সাবধান! এ দল থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ো না। কেননা, যে জামাত থেকে আলাদা হয়েছে সে শয়তানের শিকার হয়েছে। যেভাবে পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাগল বাঘের শিকার হয়।' সূত্র : নাহযুল বালাগাহ

**আহলে বায়ত ও সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষের আলামত :**

যেসব লোক আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর প্রতি ভালবাসার নামে সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ

করে, আর যারা সাহাবীদের প্রতি ভালবাসার নামে আহলে বায়তের প্রতি বিদ্বেষ রাখে এমন ব্যক্তিরা মুখে না বললেও তাদেরকে সহজে চেনা যায়। যদি আপনি কখনো সাহাবীগণের প্রশংসায় কোন মাহফিল করবেন এবং দীর্ঘক্ষণ তাদের গুণাবলী ফাযায়েল নিয়ে আলোচনা করবেন, তখন দেখবেন একদলের চেহারা মলিন থেকে মলিনতর হওয়া শুরু হয়েছে, অস্থিরতায় ছটফট করছে। তখন বুঝতে আর বাকী থাকবে না যে, এরা হযরত আলী (রা.)'র প্রতি ভালবাসায় অতিরঞ্জিত করে সত্যপথ বিচ্যুত হয়েছে। এভাবে যদি কখনো আহলে বায়তে রাসূল (দ.), হযরত আলী (রা.), হাসান (রা.), হোসাইন (রা.) ও মা ফাতেমা (রা.) কে নিয়ে আলোচনা করেন, তখন দেখবেন অন্য আরেকটি দলের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। এরাও সত্যপথ বিচ্যুত হয়েছে। আমরা দেখছি যে, একটি দল সবসময় শুধুমাত্র আহলে বায়তে আতহারকে নিয়ে অনুষ্ঠান করে, আরেক দল সবসময় সাহাবীগণকে নিয়ে মাহফিল করে। এমনকি ১০ মুহাররম তারিখেও ইমাম হোসাইন (রা.)কে নিয়ে একটি বক্তব্যও রাখে না। তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এরা প্রত্যেকেই সত্যপথ বিচ্যুত হয়েছে। একদল অন্যদলের বিরোধিতা করতে গিয়ে মধ্যপন্থা বিচ্যুত হয়ে সমাজে ফিতনা-ফ্যাসাদের পথ প্রসারিত করছে।

**হুযুর নবী করিম (দ.) এর সাথে সাহাবী ও আহলে বায়তের সম্পর্ক :**

যদি আমরা সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়তে রাসূল (দ.) কে দেখি তবে দেখতে পাব উভয় পক্ষ রাসূলুল্লাহ (দ.) এর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেনি। হুযুর নবী করিম (দ.) যে রাতে মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন সে রাতে মক্কার কাফেররা উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর বাড়ী অবরুদ্ধ করেছিল। আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (দ.)কে হিজরত করার আদেশ দিলেন। ইতিপূর্বে অধিকাংশ মুসলমান মদীনায় হিজরত করেছে। কিন্তু হযরত আলী (রা.) ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এখনও হিজরত করেন নি। রাসূলুল্লাহ (দ.) চিন্তা করলেন তার কাছে থাকা মানুষের আমানত হিজরত করার পূর্বে কাউকে দিয়ে যাবেন। এজন্য তিনি হযরত আলী (রা.) কে মনোনীত করলেন। রাসূলুল্লাহ (দ.) হযরত আলী (রা.)কে বললেন- আমি মদীনায় হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, তুমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়। আমার কাছে কিছু আমানত আছে। আগামীকাল যার আমানত তাকে দিয়ে তুমিও চলে এসো।

সে রাতে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর শয্যা ছিল কাফেরদের লক্ষ্যবস্তু। তাঁর শয্যায় শোয়াই ছিল আত্মোৎসর্গ করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) তার 'আত-তাফসীরুল কবীর' গ্রন্থে এবং ইমাম গাজ্জালী (র.) 'ইয়াহইয়াউল উলুম' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন- 'হিজরত রজনীতে যখন রাসূলুল্লাহ (দ.) হযরত আলী (রা.)কে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাঈল (আ.) ও মিকাঈল (আ.) কে বললেন- দেখ! আলী আমার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (দ.) এর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে শুয়ে আছে। যাও, আমার ফেরেশতারা তাকে হেফাযত করো। আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা আসলেন-

قام جبرائيل عليه السلام عند رأسه و ميكائيل عند رجليه و جبرائيل ينادى بخ بخ من مثلك يا ابن ابى طالب يباهى الله بك الملائكة و نزلت الاية ومن الناس من يشترى نفسه ابتغاء مرضاة الله

হযরত জিব্রাঈল (আ.) হযরত আলীর মাথার পাশে এবং মিকাঈল (আ.) পায়ের পাশে দাঁড়ালেন। জিব্রাঈল (আ.) বড় আনন্দে উচ্চস্বরে বললেন- হে আবু তালেবের পুত্র! আজ তোমার ন্যায় আর কে আছে? আল্লাহ তায়ালা তোমাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করছে এবং এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন-

ومن الناس من يشترى نفسه ابتغاء مرضاة الله অর্থ : মানুষের মধ্যে এমন একজনও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।

সূত্র : আত-তাফসীরুল কবীর

হিজরতের রজনীতে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর শয্যায় নির্ভয়ে শুয়ে থাকা হযরত আলী (রা.) এর ত্যাগ,





বাহাদুরী ও সাহসের প্রমাণ ছিল। এভাবে যদি এ রাতে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.) এর ত্যাগ দেখি তবে সেটিও একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। এ রাতে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সাথে হিজরত করাও কম সাহস ও কম ত্যাগের কথা নয়, যখন রাসূলুল্লাহ (দ.)কে আরবের সকল গোত্র হতে বীর যুবকদের হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল।

হাদীস শরীফে আছে- যখন হিজরত করার নির্দেশ আসল, অধিকাংশ মুসলমান মদীনায় হিজরত করল। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ও মদীনায়ে মুনাওয়ারায় হিজরত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। রাসূলাহ (দ.) বললেন- একটু অপেক্ষা কর, আমি আশা করছি যে, আল্লাহ আমাকে হিজরত করার অনুমতি দেবেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন- আমার মাতাপিতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক। আপনিও কি হিজরত করবেন? রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন- হ্যাঁ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হিজরত না করে এ দুঃসময়ে রাসূলুল্লাহ (দ.)'র জন্য অপেক্ষা করলেন।

সূত্র : বুখারী শরীফ

ইমাম হাসান আসকরী তার তাফসীর গ্রন্থে এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন যে, হিজরতের রাতে রাসূলুল্লাহ (দ.) আবু বকরের ঘরের দরজায় করাঘাত করলেন। হযরত আবু বকর (রা.) ঘর থেকে বের হয়ে বললেন- আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। হুযুর! এত গভীর রাতে আপনি? রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন- মদীনায় হিজরত করার অনুমতি হয়েছে। তুমি কি আমার সাথে হিজরত করতে রাজি আছ? এবং হিজরতের সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে রাজি আছ? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন- হে, আল্লাহর রাসূল! যদি আমার একহাতে পুরো দুনিয়ার বাদশাহী হয় এবং অন্যহাতে আপনার গোলামী হয়। আমি গোলামীই গ্রহণ করব এবং এ রাস্তায় সকল দুঃখ কষ্ট বিনা দ্বিধায় কবুল করতে আমি রাজি আছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (দ.) তাকে জড়িয়ে ধরলেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন- হিজরতের রাতে রাসূলুল্লাহ (দ.)কে কাঁধে করে আবু বকর (রা.) যে কষ্ট সহ্য করে গারে ছওরে আরোহণ করেছিলেন সে রাতের সাওয়াবকে দুনিয়ার সকল ইবাদতের সাথে তুলনা করলে আবু বকরের পাল্লাই ভারী হবে।

**আহলে বায়ত ও সাহাবীগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক :**

সরল পথ বিচ্যুত দু'দলের ফেতনা ফ্যাসাদ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এ বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে যে, সাহাবীগণ ও আহলে বায়তের মধ্যে কোন লড়াই হয়নি; বরং তারা একে অপরকে ভালবাসতেন। একজন আরেকজনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

শীয়া মাযহাবের কাছে গ্রহণযোগ্য কিতাব 'কাশফুল গুম্মাহ ফি মা'রিফাতিল আইম্মাহ' গ্রন্থে উরওয়া ইবনে আবদুল্লাহর (রা.) বর্ণিত একটি ঘটনা আছে- আমি ইমাম মুহাম্মদ বাকেরকে জিজ্ঞাসা করেছি- তলোয়ারের হাতলিতে রূপা ব্যবহার করা জায়েয কিনা? তিনি বললেন- এতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর তলোয়ারের হাতলিতে রূপা ব্যবহার করেছেন। উরওয়া (রা.) বললেন- আপনিও কি তাঁকে সিদ্দীক বলেন? বর্ণনাকারী বলেন- একথা শুনে ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রা.) কেবলামুখী হয়ে বললেন-

نعم الصديق نعم الصديق نعم الصديق فمن لم يقل له الصديق فلاصدق الله قولا فى الدنيا و لا فى الاخرة

"হ্যাঁ, তিনি সিদ্দীক। তিনি সিদ্দীক। তিনিই সিদ্দীক। আর যে তাঁকে সিদ্দীক বলবেনা, আল্লাহ তার কথা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়জগতে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করবেন।"

সূত্র : কাশফুল গুম্মাহ ফী মা'রিফতিল আইম্মাহ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যখন আমার পিতা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এক জায়গায় বসতেন, তখন আমি দেখতাম তিনি অধিকাংশ সময় হযরত আলীর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম- আপনি খলীফাতুল মুমিনীন হয়েও হযরত আলীর (রা.) চেহারার দিকে কেন অপলক তাকিয়ে থাকেন? হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন- আয়েশা! আমি এজন্যই হযরত আলী (রা.)'র চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (দ.)কে বলতে শুনেছি-

النظر الى وجه علی عبادة "হযরত আলীর (রা.) চেহারা দেখা ইবাদত"।

সূত্র : আস-সাওয়ায়েকুল মুহরিকাহ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে।

সূত্র : আল মুসতাদরাক লিল হাকিম

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন-

قال رسول الله ﷺ ذكر علی عبادة "রাসূলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করেন- আলীর স্মরণই ইবাদত"।

সূত্র : কানযুল ওম্মাল

সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়তে রাসূল (দ.)'র মধ্যে অসীম ভালবাসা ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) ও যায়েদ ইবনে আরকম (রা.) বলেন- হুযুর নবী করিম (দ.) 'গাদীরে খুম' এ দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা.) এর হাত ধরে দু'বার বললেন- 'তোমরা কি জাননা যে, আমি প্রত্যেক ঈমানদারের কাছে তার জীবন ও সকল প্রিয়বস্তুর চেয়ে উত্তম? সকলেই বললেন- অবশ্যই, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন- اللهم من كنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ! তার সাথে তুমি বন্ধুত্ব রাখ যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং তার সাথে শত্রুতা রাখ যে আলীর সাথে শত্রুতা রাখে।

সূত্র : তিরমিযী শরীফ

এ ঘটনার পর হযরত ওমর (রা.) এর সাথে হযরত আলী (রা.)'র সাক্ষাত হলে হযরত ওমর (রা.) তাঁকে বললেন- هنيئا يا ابن ابی طالب اصبحت و امسيت مولی كل مؤمن ومؤمنة

'হে ইবনু আবু তালেব। সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা তুমি খুশী হও। তোমার প্রতি প্রত্যেক ঈমানদার নর-নারীর বন্ধুত্ব মোবারক হোক।'

সূত্র : মিশকাতুল মাসাবীহ

হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর খেলাফত আমলে দু'জন গ্রাম্য লোক ঝগড়া করতে করতে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়। হযরত ওমর ফারুক (রা.) হযরত আলী (রা.)কে বললেন- আপনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন। হযরত আলী (রা.) ফায়সালা করে দিলেন। তাদের মধ্যে একজন বলল- এ আলী কী মীমাংসা করবে?

فوثب عليه العمر واخذ بتلبيبه و قال ويحك ماتدری من هذا هذا مولاك و مولی كل مؤمن من لم يكن مولاه فليس مؤمن

"একথা শুনামাত্রই হযরত ওমর (রা.) তার ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন। তার গর্দান ধরে বললেন- 'জান। ইনি কে? ইনি তোমার ও সকল মুমিনের মাওলা। ইনি যার মাওলা নন, সে ঈমানদার নয়।"

সূত্র : আস-সাওয়ায়েকুল মুহরিকাহ

সৈয়্যদুনা ওমর ফারুক (রা.) এর আমলে ইরান বিজয় হলে ইরানের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ইয়াযদগিরদ এর শাহজাদী শহরবানু বন্দী হয়ে মুসলমানদের গণিমতের মালে পরিণত হয়। গণিমতের মাল বন্টনের সময় হলে মুসলিম সৈন্যরা শাহজাদী কার ভাগ্যে পড়ে তার অপেক্ষায় ছিলেন। যখন শহরবানুর পালা আসল,





তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন- 'তুমি শাহজাদী, তোমাকে কোন শাহজাদার কাছেই মানাবে। আমাদের মধ্যে ইমাম হোসাইনই শাহজাদা।' সুতরাং এ শাহজাদীকে তাঁরই সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হল। হযরত ওমর (রা.) এর সামনে তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)ও ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ পুত্রের ওপর ইমাম হোসাইনকে প্রাধান্য দিলেন। সকল সাহাবীর কাছে আহলে বায়তে রাসূল তাঁদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিলেন।

একসময় হযরত ইমাম হাসান (রা.) হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর দরবারে উপস্থিত হন। তিনি দেখলেন যে, দরজায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হল না। হযরত হাসান (রা.) মনে করলেন, যেখানে নিজপুত্রের প্রবেশ করার অনুমতি হল না, সেখানে আমার জন্য অনুমতি হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। এ ভেবে তিনি চলে গেলেন। হযরত ওমর (রা.) যখন জানলেন যে, তাঁর দরবারে হযরত হাসান (রা.) এসেছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত হাসান (রা.) এর ঘরে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন এবং বললেন- 'আপনি যে আমার কাছে এসেছিলেন তা আমি জানতাম না।' হযরত হাসান (রা.) বললেন- 'আমি আবদুল্লাহকে ফিরে আসতে দেখে মনে করলাম, আমার জন্যও অনুমতি হওয়ার কথা নয়।' তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন-

انت احق بالاذن منه و هل ابنت الشعر فی الراس بعد الله الا انتم

'অনুমতি পাওয়ার জন্য আপনি তার চেয়ে বেশী হকদার। আর এ চুলগুলো আল্লাহর পরে আপনারা ব্যতিত আর কে উৎগত করেছে?'

সূত্র : আস-সাওয়ায়েকুল মুহরিকাহ

অর্থাৎ আপনাদের কারণেই আমরা সহজ সরল পথ পেয়েছি এবং আপনাদের কারণেই আমাদের এ মর্তবা হয়েছে।

আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন- اذا جئت فلاتستاذن

"আপনি আসলে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই; সরাসরি প্রবেশ করবেন।"

সূত্র : আস-সাওয়ায়েকুল মুহরিকাহ

উপরিউক্ত সকল ঘটনা দ্বারা এটাই প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, সাহাবীগণ ও আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর মধ্যে কোন প্রকারের দ্বন্দ ছিল না; বরং তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য-মমতার সম্পর্ক ছিল। অতএব, সকল সাহাবী ও আহলে বায়তের প্রতি আদব, ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করাই ঈমান। আর এটাই হোক বর্তমান অস্থির মুসলিম বিশ্বের অগ্রযাত্রার অন্যতম পাথেয়। আমিন।

ড. আ.ন.ম. মুনির আহমদ চৌধুরী
অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চ.বি. ও
সাবেক সভাপতি,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

# আল আরবাঈন ফী মানাক্বিবি আবওয়াইল হাসনাইন

[ মাওলা আলী (রা.) ও মা ফাতেমা (রা.)'র গুণাবলী ও মর্যাদা বিষয়ক ৪০টি হাদীস ]

ড.এস.এম. রফিকুল আলম*

## হাদীস- ০১

١-عَنْ اَبِى حَمْزَةَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ يَقُولُ اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ عَلِىٌّ

অর্থ : একজন আনসারী ব্যক্তি হযরত আবু হামযা (রা.) হতে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন, আমি যায়দ ইবনে আরকাম (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা.) ঈমান গ্রহণ করেছেন।

সূত্র ঃ তিরমিযী : হাদীস নং- ৩৭৩৫, মুসনাদে আহমদ- ৪:৩৬৭

## হাদীস- ০২

٢- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَا لَ اَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِىٌّ

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা.) নামায পড়েছেন।

সূত্র ঃ তিরমিযী : হাদীস নং- ৩৭৩৪

## হাদীস- ০৩

٣-عَنْ سَلْمَانَ قَالَ اَوَّلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَرُوْدًا عَلَى نَبِيِّهَا ﷺ اَوَّلُهَا اِسْلَامًا عَلِىّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ

অর্থ : হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্নিত, তিনি বলেন : উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম হাউযে কাউসারের নিকট রাসূলুল্লাহ (দ.) এর দরবারে উপস্থিত হবেন- সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হযরত আলী ইবনে আবু তালেব।

সূত্র ঃ মুসান্নাফে আবি শায়বা : হাদীস নং- ৩৫৯৫, আল মু'জামূল কবীর : হাদীস নং- ৬১৭৪

## হাদীস- ০৪

٤- عَنْ سَعْدِ بنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ خَلَّفَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَلِىَّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اَتُخَلِّفُنِى فِىْ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ فَقَالَ اَمَا تَرضَى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوسى اِلَّا اَنَّه لَا نَبِىَّ بَعْدِى

অর্থ : হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন- হুযুর নবী করিম (দ.) তাবুক যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) কে মদীনায় রেখে যান। হযরত আলী (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন- হে আল্লাহর রাসূল (দ.)! আপনি কি রমণীকূল ও শিশুদের জন্য আমাকে ছেড়ে যাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন- তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার সাথে তোমার সে সম্পর্ক হোক যে সম্পর্ক হযরত হারূন (আ.) ও মূসা (আ.) এর সাথে ছিল? অবশ্যই আমার পরে আর কোন নবী হবে না।

সূত্র ঃ বুখারী : হাদীস নং- ৪১৫৪, মুসলিম : হাদীস নং-২৪০৪

## হাদীস- ০৫

٥-عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًا يَومَ الطَّائِفِ فَانْتَجَاه فَقَالَ النَّاسُ لَقَدْ طَالَ نَجْوَاه مَعَ اِبْنِ عَمِّه فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا انْتَجَيْتُه وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ انْتَجَاه

অর্থ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, হুযুর নবী করিম (দ.) তায়েফের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)কে ডাকলেন এবং তার সাথে কানাকানি করলেন। লোকেরা বলল- আজ আপনি চাচাত ভাইয়ের সাথে দীর্ঘক্ষণ কানাকানি করেছেন। রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন- আমি নই বরং স্বয়ং আল্লাহই তার সাথে কানাকানি করেছেন।

সূত্র ঃ তিরমিযী : হাদীস নং- ৩৭২৬, আস-সুন্নাহ : হাদীস নং- ১৩২১

## হাদীস- ০৬

٦ ـ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشًا فِيْهِمْ عَلِيٌّ قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ هُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ لَا تُمِتْنِيْ حَتّٰى تُرِيَنِيْ عَلِيًّا

অর্থ : হযরত উম্মে আতীয়া (রা.) বলেন- হুযুর নবী করিম (দ.) একটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন যাতে হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (দ.)কে দু'হাত তুলে দোয়া করতে দেখেছি যে, তিনি বললেন- হে আল্লাহ! আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না যতক্ষণ না হযরত আলী (রা.)কে আমি দেখব না।

সূত্র ঃ তিরমিযী : হাদীস নং- ৩৭৩৭, আল মু'জামূল কবীর- ২৫/৬৮:১৬৮

## হাদীস- ০৭

٧ ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ زَوَّجَنِيْ اِبْنَتَهُ وَ حَمَلَنِيْ اِلٰى دَارِ الْهِجْرَةِ وَ اَعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ رَحِمَ اللّٰهُ عُمَرَ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَ اِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَ مَا لَهُ صَدِيْقٌ رَحِمَ اللّٰهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيْهِ الْمَلَائِكَةُ رَحِمَ اللّٰهُ عَلِيًّا اللّٰهُمَّ اَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ

অর্থ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, হুযুর নবী করিম (দ.) বলেন- আল্লাহ! আবু বকরের প্রতি অনুগ্রহ করো, সে তার কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছে, আমাকে দারুল হিজরত (মদীনায়) নিয়ে এসেছে এবং বেলালকে নিজের সম্পদ দিয়ে আযাদ করেছে। আল্লাহ! ওমরের প্রতি অনুগ্রহ করো, সে সর্বদা সত্য বলে যদিও তা তিক্ত হয়। যার কারণে তার কোন বন্ধু নেই। আল্লাহ! ওসমানের প্রতি অনুগ্রহ করো, ফেরেশতাগণ তাকে লজ্জা করে। আল্লাহ! আলীর প্রতি অনুগ্রহ করো। হে আল্লাহ! সে যেখানেই থাকুক, সত্য যেন তার সাথে থাকে।

সূত্র ঃ তিরমিযী : হাদীস নং- ৩৭১৪, মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৬২৯

## হাদীস- ০৮

٨ ـ عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيٌّ مِنِّيْ وَ اَنَا مِنْ عَلِيٍّ وَ لَا يُؤَدِّيْ عَنِّيْ اِلَّا اَنَا اَوْ عَلِيٌّ

অর্থ : হুবশী ইবনে জুনাদা হতে বর্ণিত, হুযুর নবী করিম (দ.) বলেন- আলী আমার থেকে এবং আমি আলী থেকে। আমার পক্ষ থেকে আমি ও আলী ছাড়া অন্য কেউ (প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি) আদায় করতে পারে না।

সূত্র ঃ তিরমিযী : হাদীস নং- ৩৭১৯, ইবনে মাজাহ : হাদীস নং- ১১৯

## হাদীস- ০৯

٩ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ اَحَبَّ النِّسَاءِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاطِمَةُ وَ مِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ

অর্থ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত, হুযুর নবী করিম (দ.) এর নিকট নারীদের মধ্যে তাঁর প্রিয়কন্যা ফাতেমা সবচেয়ে প্রিয় এবং পুরুষদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) তাঁর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়।

সূত্র ঃ তিরমিযী : হাদীস নং- ৩৮৬৮, মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৭৩৫





## হাদীস- ১০

١٠ ـ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَ الَّذِيْ اَحْلِفُ بِهِ اِنْ كَانَ عَلِيٌّ لَاَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ عُدْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةً بَعْدَ غَدَاةٍ يَقُوْلُ جَاءَ عَلِيٌّ مِرَارًا قَالَتْ وَ اَظُنُّهُ كَانَ بَعَثَهُ فِيْ حَاجَةٍ قَالَتْ فَجَاءَ بَعْدُ فَظَنَنْتُ اَنَّ لَهُ اِلَيْهِ حَاجَةً فَخَرَجْنَا مِنَ الْبَيْتِ فَقَعَدْنَا عِنْدَ الْبَابِ فَكُنْتُ مِنْ اَدْنَاهُمْ اِلَى الْبَابِ فَاَكَبَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يُسَارُّهُ وَ يُنَاجِيْهِ ثُمَّ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ فَكَانَ اَقْرَبَ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا

অর্থ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন- আমি সেই মহান সত্ত্বার নামে শপথ করে বলছি যে, হযরত আলী (রা.) পুরুষদের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পূরণে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর অধিক নিকটতম। তিনি আরো বলেন- আমরা প্রতিদিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সেবা শুশ্রুষা করতে উপস্থিত হতাম। রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন- আলীও অনেকবার আমার সেবা শুশ্রুষা করতে এসেছে। উম্মে সালামা (রা.) বললেন- আমি বুঝতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (দ.) তাকে কোন কাজে পাঠিয়েছেন। অতঃপর যখন হযরত আলী আসলেন তখন আমি বুঝলাম যে, হয়ত তার সাথে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর কোন জরুরী কাজ আছে। তাই আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমি সকলের চেয়ে দরজার বেশি নিকটে ছিলাম। (দেখলাম) হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (দ.) এর দিকে ঝুকে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (দ.)'র সাথে কানাকানি করছেন। সেদিনের পরেই রাসূলুল্লাহ (দ.) ইন্তিকাল করেন। সুতরাং হযরত আলী (রা.)ই সবার চেয়ে প্রতিশ্রুতি পালনে বেশি নিকটতম ছিলেন।

সূত্র ঃ মুসনাদে আহমদ : হাদীস নং- ২৬৬০৭, মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৬৭১

## হাদীস- ১১

١١ ـ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا غَضِبَ لَمْ يَجْتَرِئْ اَحَدٌ مِنَّا اَنْ يُكَلِّمَهُ اِلَّا عَلِيٌّ

অর্থ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (দ.) যখন অসুস্থ হতেন তখন আমরা আমাদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) ছাড়া অন্য কেউ তাঁর সাথে কথা বলতে সাহস করত না।

সূত্র ঃ আল মু'জামূল আউসাত : হাদীস নং- ৪৩১৪, মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৬৪৭

## হাদীস- ১২

١٢ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَ اَبْنَاءَكُمْ﴾ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا وَ فَاطِمَةَ وَ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا فَقَالَ اللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلِيْ

অর্থ : হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন- যখন নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল হয়- ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَ اَبْنَاءَكُمْ﴾ অর্থাৎ আপনি বলুন! আমি আমার সন্তানদের ডাকছি, তোমরা তোমাদের সন্তানদের ডাক।) তখন হুযুর নবী করিম (দ.) হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতেমা (রা.), হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হোসাইন (রা.)কে ডাকলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বায়ত।

সূত্র ঃ মুসলিম : হাদীস নং- ২৪০৪, তিরমিযী : হাদীস নং- ২৯৯৯

## হাদীস- ১৩

١٣ ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمُرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ اَشْهُرٍ اِذَا خَرَجَ اِلٰى صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُوْلُ الصَّلَاةَ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ ﴿اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا﴾

অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (দ.) ছয়মাস পর্যন্ত যখনই ফজরের নামাযের জন্য বের হতেন তখন হযরত ফাতেমা (রা.) এর দরজার পাশ দিয়ে যেতেন এবং বলতেন- 'হে আহলে বায়ত! আল্লাহর ইচ্ছা যে, তিনি তোমাদের থেকে সকল কলুষতা দূরীভূত করবেন এবং তোমাদেরকে পূতঃ পবিত্র করবেন।

সূত্র ঃ তিরমিযী : হাদীস নং- ৩২০৬, মুসনাদে আহমদ : হাদীস নং- ১৩৪০

## হাদীস- ১৪

١٤ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى﴾ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَابَتُكَ هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُم قَالَ عَلِيٌّ و فَاطِمَةُ وَ ابْنَاهُمَا

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন এ আয়াতটি নাযিল হয় (হে প্রিয় হাবীব! আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে শুধুমাত্র আমার নিকটাত্মীয়তার প্রতি ভালবাসা চাই।) তখন সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন- 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকটাত্মীয় কারা? যাদের প্রতি ভালবাসা রাখা আমাদের ওপর ওয়াজিব হয়েছে?' রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন- আলী, ফাতেমা এবং তাদের পুত্রদ্বয় (হাসান ও হোসাইন)।

সূত্র ঃ আল মু'জামুল কবীর : হাদীস নং- ৩৪৫৬

## হাদীস- ১৫

١٥ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ وَ نَزَلَ غَدِيرَ خُمٍّ أَمَرَ بِدَوحَاتٍ فَقُمِمْنَ فَقَالَ كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالَى وَ عِتْرَتِي فَانْظُرُوا كَيْفَ تُخلِفُونِي فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوضِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَوْلَايَ وَ أَنَا مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهٰذَا وَلِيُّهُ اللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ

অর্থ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) যখন বিদায় হজ্জ পালনের পর প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তখন গাদীরে খুম-এ অবতরণ করলেন এবং তাঁবু স্থাপন করতে বললেন। অতঃপর ছাউনীযুক্ত তাঁবু স্থাপন করা হল। তিনি বললেন- মনে হয় অচিরেই আমাকে ডাক দেয়া হবে এবং আমি সাড়া দেব। (অর্থাৎ আমার ওফাত সন্নিকটে)। নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট দু'টি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি যে দু'টির একটির চেয়ে অপরটি গুরুত্বপূর্ণ। একটি আল্লাহর কিতাব ও দ্বিতীয়টি আমার বংশধর। এখন দেখার বিষয় আমার পরে তোমরা এ দু'য়ের সাথে কেমন আচরণ করছ। এরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। এভাবে হাউজে কাউসারের নিকট আমার সামনে উপস্থিত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন- নিশ্চয় আল্লাহ আমার মাওলা এবং আমি প্রত্যেক মু'মিনের মাওলা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (দ.) হযরত আলী (রা.) এর হাত উঁচিয়ে ধরে বললেন- আমি যার মাওলা ইনি তার বন্ধু। হে আল্লাহ! এর সাথে যে বন্ধুত্ব রাখবে তুমি তার সাথে বন্ধুত্ব রাখ। এবং যে তার সাথে শত্রুতা রাখে তুমি তার সাথে শত্রুতা রাখ।

সূত্র ঃ নাসাঈ হাদীস : নং- ৮১৪৮, মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৫৭৬





## হাদীস- ১৬

١٦ـ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ عَلِيٍّ الْيَمَنَ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفوَةً فَلَمَّا قَدِمتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرتُ عَلِيًّا فَتَنَقَّصتُهُ فَرَأَيتُ وَجهَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ يَا بُرَيدَةُ أَلَستُ أَوْلَى بِالْمُؤمِنِينَ مِن أَنفُسِهِم ؟ قُلتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَن كُنتُ مَولَاهُ فَعَلِيٌّ مَولَاهُ

অর্থ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি হযরত আলীর (রা.) সাথে ইয়ামেনের যুদ্ধে শরীক ছিলাম। সে যুদ্ধে তাঁর সাথে আমার সামান্য মনোমালিন্য হয়েছিল। যখন আমি যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর নিকট উপস্থিত হলাম তখন আমি রাসূলুল্লাহ (দ.) এর কাছে হযরত আলীর (রা.) ব্যাপারে অভিযোগ করতেই আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (দ.) এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে পড়ল। তিনি বললেন- হে বুরাইদা! আমি কি মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় নই? আমি বললাম, কেন নয়? হে আল্লাহর রাসূল!। রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন- শুন! আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা।

সূত্র ঃ মুসনাদে আহমদ : হাদীস নং- ২২৯৯৫, নাসাঈ : হাদীস নং- ৮৪৬৫

## হাদীস- ১৭

١٧ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ صَامَ يَومَ ثَمَانَ عَشْرَةَ مِن ذِي الْحَجَّةِ كُتِبَ لَه صِيَامَ سِتِّينَ شَهْرًا وَهُوَ يَومَ غَدِيرِ خُمٍّ لَمَّا أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَلَسْتُ وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَن كُنْتُ مَولَاه فَعَلِيٌّ مَولَاه فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَخٍ بَخٍ لَكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصْبَحتَ مَولَايَ وَ مَولَى كُلِّ مُسلِمٍ فَأَنزَلَ اللّٰهُ ﴿الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُمْ﴾

অর্থ : হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি জ্বিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখ রোযা রাখবে তাকে ষাট মাস রোযা রাখার সওয়াব দেয়া হবে। আর এটি হল, 'গাদীরে খুম' দিবস। যেদিন হযরত নবী করিম (দ.) হযরত আলী (রা.)'র হাত ধরে বলেছেন- আমি কি ঈমানদারদের বন্ধু নই? তারা বললেন- কেন নয়? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন- আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা। হযরত ওমর (রা.) বললেন- ধন্য হোন হে আবু তালিবের পুত্র! ধন্য হোন। আপনি আমার ও সকল ঈমানদারের মাওলা হলেন। এ স্থানে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন- 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পরিপূর্ণ করে দিলাম।"

সূত্র ঃ মুসনাদে আহমদ : ৪:২৮১, মুসান্নাফে আবী শায়বা : হাদীস নং- ১২১৬৭

## হাদীস- ১৮

١٨ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدرِيِّ قَالَ إِنَّا كُنَّا لَنَعرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحنُ مَعشَرَ الْأَنْصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন- আমরা আনসারী লোকেরা হযরত আলী (রা.)'র সাথে বিদ্বেষ রাখার কারণে মুনাফিকদেরকে চিনতে পারি।

সূত্র ঃ তিরমিযী : হাদীস নং- ৩৭১৭

## হাদীস- ১৯

١٩ـ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِن أَهْلِ الشَّامِ فَسَبَّ عَلِيًّا عِندَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَصَبَه ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ آذَيْتَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَه لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُم عَذَابًا مُّهِينًا﴾ لَو كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَيًّا لَآذَيتَه

অর্থ : হযরত ইবনে আবি মুলাইকা বর্ণনা করেন- সিরিয়ার এক ব্যক্তি এসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)'র নিকট হযরত আলী (রা.)'র বিরুদ্ধে কটুক্তি করল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাকে এরূপ ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন- হে আল্লাহর দুশমন! তুমি নবী করিম (দ.)কে কষ্ট দিচ্ছ এবং তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন- "নিশ্চয় যেসব লোক আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর লা'নত; এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন।" অতঃপর বললেন- যদি রাসূলুল্লাহ (দ.) (যাহেরী) হায়াতে জীবিত থাকতেন তবে অবশ্যই তোমার এ কথার কারণে তিনি কষ্ট পেতেন।

সূত্র ঃ মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৬১৮

## হাদীস- ২০

٢٠ـ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَنتَ سَيِّدٌ فِي الدُّنيَا سَيِّدٌ فِي الآخِرَةِ حَبِيبُكَ حَبِيبِي وَ حَبِيبِي حَبِيبُ اللّٰهِ وَ عَدُوُّكَ عَدُوِّي وَعَدُوِّي عَدُوُّ اللّٰهِ وَ الوَيلُ لِمَنْ اَبغَضَكَ بَعدِيْ

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ (দ.) আমার দিকে (আলীর দিকে) দৃষ্টিপাত করে বললেন- হে আলী! তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের সর্দার। তোমার বন্ধু আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধু আল্লাহর বন্ধু। আর তোমার শত্রু আমার শত্রু এবং আমার শত্রু আল্লাহর শত্রু। অভিশম্পাত সে ব্যক্তির ওপর, যে আমার পরে তোমার সাথে বিদ্বেষ রাখবে।

সূত্র ঃ মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৬৪০

## হাদীস নং- ২১

٢١ـ عَن اِبنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا مَدِينَةُ العِلمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا فَمَن اَرَادَ المَدِينَةَ فَليَاتِ البَابَ

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন- আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী সে শহরের দরজা। অতএব, যে ব্যক্তি এ শহরে আসতে চায় সে যেন এ দরজা দিয়ে আসে।

সূত্র ঃ মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৬৩৭

## হাদীস- ২২

٢٢ـ عَن عَبدِ اللّٰهِ فِي رِوَايَةٍ طَوِيلَةٍ وَحَدَّثَ فِي كِتَابِ اَبِي بِخَطِّ يَدِهِ فِي هٰذَا الحَدِيثِ قَالَ اَمَا تَرضِينَ اَنْ زَوَّجتُكِ اَقدَمَ اُمَّتِي سِلمًا وَ اَكثَرَهُم عِلمًا وَ اَعظَمَهُم حِلمًا

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ (দ.) হযরত ফাতেমা (রা.)কে বলেন- তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে এমন ব্যক্তির বিয়ে দেব, যে উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন, সবচেয়ে জ্ঞানী ও সহনশীল।

সূত্র ঃ মুসনাদে আহমদ- ৫:২৬, আল মু'জামুল কবীর- ২০:২২৯

## হাদীস- ২৩

٢٣ـ عَن عَبدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ النَّظرُ اِلَى وَجهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করেন- হযরত আলী (রা.)'র চেহারা দেখা ইবাদত।

সূত্র ঃ আল মু'জামুল কবীর : হাদীস নং- ১০০০৬, মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৬৮২





## হাদীস- ২৪

٢٤ـ عَن اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ عَلِيٌّ مَعَ القُرآنِ وَ القُرآنُ مَعَ عَلِيٍّ لَا يَفتَرِقَانِ حَتّٰى يَرِدَا عَلَى الحَوضِ

অর্থ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন- আমি রাসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছি যে, আলী কুরআনের সাথে এবং কুরআন আলীর সাথে। এ দু'টি কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। এভাবে উভয়ে আমার নিকট একত্রে হাউজে কাউসারে উপস্থিত হবে।

সূত্র ঃ আল মু'জামুল আউসাত : হাদীস নং- ৪৮৮০

## হাদীস- ২৫

٢٥ـ عَن عَبدِ اللّٰهِ بنِ عَكِيمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اَوحَى اِلَيَّ فِي عَلِيٍّ ثَلَاثَةَ اَشيَاءَ لَيلَةَ اُسرِيَ بِيْ اَنَّهُ سَيِّدُ المُؤمِنِينَ وَ اَمَامُ المُتَّقِينَ وَ قَائِدُ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আকীম (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেন- আল্লাহ তায়ালা মেরাজ রজনীতে আমাকে ওহীর মাধ্যমে আলীর তিনটি বৈশিষ্ট্য বলেছেন- ১. তিনি সকল ঈমানদারের সর্দার। ২. মুত্তাকীদের ইমাম ও ৩. তিনি (কিয়ামত দিবসে) নূরানী চেহারার লোকদের নেতা হবেন।

সূত্র ঃ আল মু'জামুল সগীর- ২:৮৮

## হাদীস- ২৬

٢٦ـ عَن اِبنِ بُرَيدَةَ قَالَ كَانَ اَحَبَّ النِّسَاءِ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاطِمَةُ وَ مِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ

অর্থ : হযরত ইবনে বুরাইদা (রা.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন- নারীদের মধ্যে হযরত ফাতেমা ও পুরুষদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ এর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়।

সূত্র ঃ তিরমিজী : হাদীস নং- ৩৮৬৮, মুসতাদারাক : হাদীস নং- ৪৭৩৫

## হাদীস- ২৭

٢٧ـ عَن ثَوبَانَ مَولَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَافَرَ كَانَ اٰخِرُ عَهدِهِ بِاِنسَانٍ مِن اَهلِهِ فَاطِمَةَ وَ اَوَّلُ مَن يَدخُلُ عَلَيهَا اَذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (দ.) এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সওবান (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (দ.) যখন কোথাও সফরের ইচ্ছা করতেন তখন পরিবার পরিজনের মধ্যে সর্বশেষ কুশল বিনিময় করতেন হযরত ফাতেমা (রা.)'র সাথে। আর সফর থেকে ফেরার পর সর্বপ্রথম হযরত ফাতিমা (রা.)'র নিকট তাশরীফ আনতেন।

সূত্র ঃ আবু দাউদ : হাদীস নং- ৪২১৩, মুসনাদে আহমদ- ৫:২৭৫

## হাদীস- ২৮

٢٨ـ عَن عَائِشَةَ اُمِّ المُؤمِنِينَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاهَا قَد اَقبَلَتْ رَحَّبَ بِهَا ثُمَّ قَامَ اِلَيهَا فَقَبَّلَهَا ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا حَتّٰى يُجلِسَهَا فِي مَكَانِهِ وَ كَانَتْ اِذَا رَاتِ النَّبِيَّ ﷺ رَحَّبَتْ بِهِ ثُمَّ قَامَتْ اِلَيهِ فَقَبَّلَتْهُ ﷺ

অর্থ : উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (দ.) যখন হযরত ফাতেমা (রা.)কে তাঁর নিকট আসতে দেখতেন তখন স্বাগতম বলতেন এবং তার জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন, তাকে চুমু খেতেন এবং

তার হাত ধরে নিজের আসনে বসাতেন। আর হযরত ফাতেমা (রা.) যখন রাসূলুল্লাহ (দ.)কে তার নিকট তাশরীফ আনতে দেখতেন তখন তিনি তাঁকে স্বাগতম বলতেন, দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁকে চুমু খেতেন।

সূত্র ঃ নাসাঈ : হাদীস নং- ৯২৩৬, ইবনে হাব্বান : হাদীস নং- ৬৯৫৩

### হাদীস নং- ২৯

٢٩ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَافَرَ كَانَ اٰخِرُ النَّاسِ عَهْدًا بِهٖ فَاطِمَةَ وَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ كَانَ اَوَّلُ النَّاسِ بِهٖ عَهْدًا فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِدَاكِ اَبِيْ وَ اُمِّيْ

অর্থ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) যখন কোথাও সফরের ইচ্ছা করতেন তখন পরিবার পরিজনের মধ্যে সবার পরে যার সাথে কথা বলতেন তিনি হযরত ফাতেমা (রা.); এবং যখন সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন সর্বপ্রথম যার সাথে দেখা করতেন তিনি হযরত ফাতেমা (রা.)। আর রাসূলুল্লাহ (দ.) ফাতেমাকে বলতেন- আমার মাতাপিতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক।

সূত্র ঃ মুসতাদরাক : হাদীস নং-৪৭৩৯, ইবনে হাব্বান : হাদীস নং- ৬৯৬)

### হাদীস- ৩০

٣٠ـ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْاَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ اِسْتَاْذَنَ رَبَّهٗ اَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَ يُبَشِّرَنِيْ بِاَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

অর্থ : হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত, হুযুর নবী করিম (দ.) ইরশাদ করেন- এক ফেরেশতা যিনি ইতোপূর্বে আর পৃথিবীতে অবতরণ করেননি, তিনি আমাকে সালাম করতে পৃথিবীতে অবতরণ করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন এবং তিনি এ সুসংবাদ দেবেন যে, ফাতেমা জান্নাতে সকল রমণীর সর্দার এবং হাসান ও হোসাইন সকল যুবকের সর্দার।

সূত্র ঃ তিরমিজী : হাদীস নং- ৩৮৭১, নাসাঈ হাদীস নং- ৮২৯৮

### হাদীস- ৩১

٣١ـ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنِّيْ وَ اِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ يَسُوْنَهَا وَ اللّٰهِ لَاتَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ بِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ

অর্থ : হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.) হতে বর্ণিত, হুযুর নবী করিম (দ.) ইরশাদ করেন- নিশ্চয় ফাতেমা আমার কলিজার টুকরো। তার অসন্তুষ্টি আমার অপছন্দনীয়। আল্লাহর শপথ! কোন ব্যক্তির নিকট রাসূলুল্লাহ ও তার শত্রুর কন্যা একত্রিত হতে পারে না।

সূত্র ঃ বুখারী : হাদীস নং- ৩৫২৩, মুসলিম : হাদীস নং- ২৪৪৮

### হাদীস- ৩২

٣٢ـ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ قَالَ يَا عَلِيُّ لَاتُحْدِثْ شَيْئًا حَتّٰى تَلْقَانِيْ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهُ ثُمَّ اَفْرَغَهُ عَلٰى عَلِيٍّ فَقَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَ بَارِكْ عَلَيْهِمَا وَ بَارِكْ لَهُمَا فِيْ شِبْلَيْهِمَا و فِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ وَ بَارِكْ لَهُمَا فِيْ نَسْلِهِمَا

অর্থ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত আলী (রা.) ও ফাতেমা (রা.)'র বিবাহ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (দ.) হযরত আলীকে বললেন- 'আমার সাথে সাক্ষাত না করে কোন কাজ করো না। অতঃপর





রাসূলুল্লাহ (দ.) পানি আনতে বললেন এবং ওজু করলেন। পরে হযরত আলী (রা.)'র ওপর পানি ঢেলে বললেন- আল্লাহ! এ দু'জনের মধ্যে বরকত এবং এ দু'জনের ওপর বরকত বর্ষণ করো। এ দু'জনের জন্য তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে বরকত দান করো।

সূত্র ঃ নাসাঈ : হাদীস নং- ১০০৮৮, আল মু'জামুল কবীর : হাদীস নং- ১১৫৩

### হাদীস- ৩৩

٣٣ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادٰى مُنَادٍ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ يَا اَهْلَ الْجَمْعِ غُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ حَتّٰى تَمُرَّ

অর্থ : হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন- তিনি রাসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছেন- কিয়ামত দিবসে এক আহ্বানকারী পর্দার আড়ালে আহবান করবেন- হে মাহশরবাসী! তোমাদের দৃষ্টি অবনত কর যাতে ফাতেমা বিনতে মুস্তফা চলে যান।

সূত্র ঃ মুসতাদারাক : হাদীস নং- ৪৭২৮

### হাদীস- ৩৪

٣٤ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ و حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ مُجْتَمِعُوْنَ وَ مَنْ اَحَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاْكُلُ وَ نَشْرَبُ حَتّٰى يُفْرَقَ بَيْنَ الْعِبَادِ

অর্থ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেন- আলী (রা.), ফাতেমা (রা.), হাসান (রা.) ও হোসাইন (রা.) এবং তাদের সাথে ভালবাসা পোষণকারী কিয়ামত দিবসে সকলেই একত্রে একস্থানে সমবেত হবেন। কিয়ামত দিবসে আমাদের পানাহার একত্রে হবে। এ পর্যন্ত যে, লোকদের মীমাংসা করা হবে।

সূত্র ঃ আল মু'জামুল কবীর : হাদীস নং- ২৬২৩

### হাদীস- ৩৫

٣٥ـ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيْ رَضِيَ اللّٰهُ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُنَادِيْ مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ يَا اَهْلَ الْجَمْعِ نَكِّسُوْا رُؤُسَكُمْ وَغُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ حَتّٰى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى الصِّرَاطِ فَتَمُرُّ وَ مَعَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ جَارِيَةٍ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ

অর্থ : হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে আরশের গভীরতা থেকে কোন এক আহবানকারী আওয়াজ দেবে "হে হাশরবাসী! তোমাদের মাথা অবনত কর এবং দৃষ্টি অবনত কর যাতে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ (দ.) পুলসেরাত পার হয়ে যান। অতঃপর তিনি পার হয়ে যাবেন এবং তাঁর সাথে সত্তর হাজার আলোকোজ্জ্বল জান্নাতি হুর থাকবেন। সূত্র ঃ কানযুল উম্মাল : হাদীস নং- ৩৪২১০

### হাদীস- ৩৬

٣٦ـ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَشْبَهَ سِمْتًا وَ دَلًّا وَهَدْيًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ قِيَامِهَا وَ قُعُوْدِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি কখনো কাউকে আলাপ আলোচনায় এবং উঠা-বসায় হযরত ফাতেমা (রা.) এর চেয়ে বেশী সাদৃশ রাসূলুল্লাহর সাথে আর কাউকে দেখিনি।

সূত্র ঃ নাসাঈ : হাদীস নং- ৯২৩৬, মুসতাদারাক : হাদীস নং- ৪৭৩২

### হাদীস- ৩৭

٣٧۔عَنْ جَابِرٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ بَنِي أُمٍّ عُصْبَةٌ يَنْتَمُوْنَ إِلَيْهِ إِلَّا ابْنَيْ فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَ عُصْبَتُهُمَا

অর্থ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেন- প্রত্যেক মায়ের সন্তানের আসাবা হন পিতা, যার দিকে তাকে নিসবত করা হয়; কিন্তু ফাতেমার সন্তান ব্যতিত। আমিই তাদের ওয়ালী ও তাদের বংশ।

সূত্র : মুসতাদারাক : হাদীস নং- ৪৭৭০

### হাদীস- ৩৮

٣٨۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِؓ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَبَبِي وَ نَسَبِي

অর্থ : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ (দ.)কে বলতে শুনেছি- 'আমার বংশ ও সম্পর্ক ব্যতিত কিয়ামত দিবসে অন্য সব বংশ ও সম্পর্ক নিশ্চিহ্ন হবে।

সূত্র : মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৬৮৪, মুসনাদে আহমদ : হাদীস নং- ১০৬৯

### হাদীস- ৩৯

٣٩۔عَنْ عُمَرَؓ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ وَ اللّٰهِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

مِنْكِ وَ اللّٰهِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ أَبِيكِ ﷺ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكِ

অর্থ : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি হযরত ফাতেমা (রা.) বিনতে রাসূল (দ.) এর নিকট আসলেন এবং বললেন- হে ফাতেমা! আল্লাহর শপথ, আমি আপনাদের চেয়ে আর কাউকে রাসূলুল্লাহ (দ.)'র নিকট অধিক প্রিয় দেখিনি। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (দ.)'র পরে আমার কাছে আপনার চেয়ে আর কেউ প্রিয় নয়।

সূত্র : মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৭৩৬, মুসান্নাফে আবি শায়বা : হাদীস নং- ৩৭০৪৫

### হাদীস- ৪০

٤٠۔عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ فَاطِمَةَ حَصَّنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَهَا اللّٰهُ وَ ذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করেন- নিশ্চয় ফাতেমা তার সম্ভ্রমকে এতবেশী হেফাযত করেছেন, যার কারণে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর এবং তাদের সন্তানদের ওপর জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন।

সূত্র : আল মু'জামুল কবীর : হাদীস নং- ১০১৮, মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৭২৬

ড. এস. এম. রফিকুল আলম
সহযোগী অধ্যাপক (আরবী বিভাগ)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়





# আল আরবাঈন ফী মানাক্বিবিল হাসনাইন

[ইমাম হাসান (রা.) ও ইমাম হোসাইন (রা.)'র মর্যাদা বিষয়ক ৪০টি হাদীস ]

মাওলানা মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন*

প্রিয়নবী সরকারে দো'আলম, তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনুর (দ.)'র প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র ইমাম হাসান (রা.) ও ইমাম হোসাইন (রা.) এর মান-মর্যাদা অত্যাধিক। তাঁদের ফযীলতের বর্ণনা সম্বলিত অসংখ্য হাদীসে রাসূল হতে পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে চল্লিশটি হাদীস এ নিবন্ধে সন্নিবেশিত হয়েছে। একই বিষয়বস্তুসম্পন্ন একাধিক হাদীসের ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সর্বজনবিদিত কিতাব হতে সংকলিত হাদীসটিই নিবন্ধে আনা হয়েছে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সহজ অনুধাবনের লক্ষ্যে প্রতিটি হাদীসের মর্মার্থানুসারে শুরুতে একটি করে শিরোনামের মাধ্যমেই হাদীসগুলো উপস্থাপিত হয়েছে। নিবন্ধে উপস্থাপিত হাদীসগুলোর যথার্থ অনুধাবন ও অনুশীলনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজ হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র মান-মর্যাদা সম্পর্কে আরও অধিক জ্ঞাত হবেন এবং সেইসাথে আহলে বায়তে রাসূল (দ.)'র প্রতি অধিক আন্তরিক ও শ্রদ্ধাশীল হবেন আশা করি।

### হাদীস- ০১

#### হুযুর নবী করিম (দ.) শাহযাদাদ্বয়ের নাম রেখেছেন

١۔ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍؓ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قَالَ قُلْتُ سَمَّيْتُهُ

حَرْبًا فَقَالَ بَلْ هُوَ حَسَنٌ فَلَمَّا وَلَدَتِ الْحُسَيْنَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قَالَ قُلْتُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا

قَالَ بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ لَمَّا وَلَدَتِ الثَّالِثَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ

مُحَسِّنٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا سَمَّيْتُهُمْ بِاسْمِ وَلَدِ هَارُوْنَ شَبَّرَ وَ شَبِيْرَ وَ مُشَبِّرَ

অর্থ : হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, যখন হযরত ফাতেমা (রা.)'র ঘরে হাসান এর জন্ম হল তখন হুযুর নবী করিম (দ.) তাশরীফ আনলেন এবং বললেন: 'আমাকে আমার সন্তান দেখাও; তাঁর নাম কি রেখেছো?' বললাম: 'আমি তার নাম হারব রেখেছি।' নবীজি (দ.) বললেন : 'না; বরং সে হবে হাসান।' অতঃপর যখন হোসাইনের জন্ম হল তখন হুযুর (দ.) তাশরীফ আনলেন এবং বললেন: 'আমাকে আমার সন্তান দেখাও; তোমরা তার নাম কি রেখেছো?' বললাম: 'আমি তার নাম হারব রেখেছি।' তিনি (দ.) বললেন: 'না; বরং সে হোসাইন।' অতঃপর যখন তৃতীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন হুযুর করিম (দ.) তাশরীফ আনলেন এবং বললেন: 'আমাকে আমার সন্তান দেখাও; তোমরা তার নাম কি রেখেছো?' বললাম: 'আমি তার নাম হারব রেখেছি।' তিনি (দ.) বললেন: না; বরং তার নাম মুহসিন।' অতঃপর বললেন: 'আমি তাদের নাম হযরত হারূন (আ.) এর সন্তান শাব্বার, শাব্বীর ও মুশাব্বার এর নামের ওপর রেখেছি।' [আরবী ভাষায় উক্ত তিনটি নাম হলো- হাসান, হোসাইন ও মুহসিন]

সূত্র : আল-মু'জামুল কবীর: হাদীস নং- ২৭৭৪, মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৭৭৩

### হাদীস- ০২

### হাসান ও হোসাইন জান্নাতী নামসমূহের দু'টি নাম

٢ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ إِسْمَانِ مِنْ أَسْمَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَمْ يَكُونَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

অর্থ : হযরত ইমরান বিন সুলায়মান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হাসান ও হোসাইন জান্নাতবাসীগণের নামসমূহের দু'টি নাম; যে দু'টি জাহেলী যুগে কখনও কারো নাম হিসেবে রাখা হয়নি।

সূত্র : আস সাওয়ায়েকুল মুহরিকাহ: ১৯২, উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ ২:২৫

### হাদীস- ০৩

### হাসান ও হোসাইন (রা.) নবীজির (দ.) সন্তান

٣ـ عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَتَاهَا يَوْمًا فَقَالَ أَيْنَ إِبْنَايَ فَقَالَتْ ذَهَبَ بِهِمَا عَلِيٌّ فَتَوَجَّهَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَهُمَا يَلْعَبَانِ فِي مَشْرُبَةٍ وَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَضْلٌ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَلَا تُقَلِّبْ إِبْنَيَّ قَبْلَ الْحَرِّ

অর্থ : হযরত ফাতেমা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদিন হুযুর নবী করিম (দ.) আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন:'আমার সন্তানরা কোথায়?' আমি বললাম- 'আলী (রা.) তাদেরকে সাথে নিয়ে গেছেন।' নবী করিম (দ.) তাদের তালাশে বের হলেন এবং পানি পান করার একটি স্থানে তাদেরকে খেলায় রত পেলেন; আর তাদের সামনে কিছু অবশিষ্ট খেজুর দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি (দ.) বললেন- 'আলী! খেয়াল রেখো! আমার সন্তানদেরকে গরম শুরু হওয়ার আগেই ফিরিয়ে নিয়ে এসো।'

সূত্র : আয যুররিয়াতুত ত্বাহেরাহ: হাদীস নং- ১৯৩; মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৭৭৪

### হাদীস- ০৪

### হাসনাইনে করীমাইন (রা.) আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত

٤ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ فَاطِمَةَ وَ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا ثُمَّ أَدْخَلَهُمْ تَحْتَ ثَوْبِهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي

অর্থ : হযরত উম্মে সালমা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (দ.) হযরত ফাতেমা (রা.), হাসান (রা.) ও হোসাইন (রা.)কে একত্রিত করে তাদেরকে স্বীয় চাদরের ভেতরে আবদ্ধ করে নিয়ে বললেন: 'হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বায়ত।'

সূত্র : আল মু'জামুল কবীর: হাদীস নং- ২৬৬৩, মুসতাদরাক : হাদীস নং- ৪৭০৫

### হাদীস- ০৫

### হুযুর নবী করিম (দ.)ই হাসনাইনে করীমাইন (রা.)'র নসব, অভিভাবক ও পিতা

٥ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا خَلَا سَبَبِي وَ نَسَبِي كُلُّ وَلَدِ أَبٍ فَإِنَّ عُصْبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا وَلَدِ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَ عُصْبَتُهُمْ

অর্থ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি হুযুর নবী করিম (দ.) কে বলতে শুনেছি: কিয়ামত দিবসে আমার হাসব-নসব (বংশধারা-ঐতিহ্য) ব্যতিত সকল বংশীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। প্রত্যেক সন্তান তার পিতার দিকে সম্বন্ধিত হয়; কিন্তু ফাতেমার সন্তানরা ছাড়া। তাদের পিতাও আমি এবং তাদের বংশধারা (নসব)ও আমি।

সূত্র : মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : হাদীস নং- ১০৩৫৪, মু'জামুল কবীর : হাদীস নং- ২৬৩৩





### হাদীস- ০৬

### হাসান ও হোসাইন (রা.) মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম বংশের অধিকারী

٦ـ عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ جَدًّا وَ جَدَّةً أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ عَمًّا وَ عَمَّةً أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ خَالًا وَ خَالَةً أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ أَبًا وَ أُمًّا هُمَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ جَدُّهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَ جَدَّتُهُمَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَ أُمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّٰهِ وَ أَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ عَمُّهُمَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ عَمَّتُهُمَا أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ وَ خَالُهُمَا الْقَاسِمُ بْنُ رَسُولِ اللّٰهِ وَ خَالَاتُهُمَا زَيْنَبُ وَ رُقَيَّةُ وَ أُمُّ كُلْثُومٍ بَنَاتُ رَسُولِ اللّٰهِ جَدُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَ عَمَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَ خَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হুযুর করিম (দ.) ইরশাদ করেন- হে লোকেরা! আমি কি তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অবগত করব না, যারা (নিজেদের) নানা-নানীর দিক দিয়ে সকল চাইতে উত্তম? আমি কি তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে বলব না, যারা (নিজেদের) চাচা ও ফুফুর দিক থেকে সকল মানুষের মাঝে উত্তম? আমি কি তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে জানাব না, যারা (নিজেদের) মামা ও খালার দিক থেকে সব মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম? আমি কি তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে সংবাদ দেব না, যারা (স্বীয়) পিতা-মাতার দিক দিয়ে সব মানুষের চাইতে উত্তম? তারা হলো- হাসান ও হোসাইন। তাদের নানা হলেন- আল্লাহর রাসূল। তাদের নানী- খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ। তাদের মাতা- আল্লাহর রাসূলের কন্যা ফাতেমা। তাদের পিতা- আলী ইবনে আবু তালিব। তাদের চাচা- জাফর ইবনে আবু তালিব। তাদের ফুফু- উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব। তাদের মামা- রাসূলুল্লাহ (দ.)'র পুত্র কাসেম এবং খালা রাসূলুল্লাহ (দ.)'র কন্যাগণ যয়নব, রোকেয়া ও উম্মে কুলসুম। তাদের নানা, পিতা, মাতা, চাচা, ফুফু, মামা ও খালা (সকলেই) জান্নাতে থাকবে এবং এরা দু'জন (হাসান ও হোসাইন)ও জান্নাতে থাকবে।

সূত্র : মু'জামুল কবীর: হাদীস নং- ২৬৮২, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৯:১৮৪

### হাদীস- ০৭

### হাসান ও হোসাইন (রা.) রাসূলুল্লাহর (দ.)'র দুনিয়ার বাগানের ফুল

٧ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ إِبْنَ عُمَرَ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ إِبْنُ عُمَرَ أُنْظُرُوا إِلَى هٰذَا يَسْأَلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَ قَدْ قَتَلُوا إِبْنَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا

অর্থ : হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু নুআম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একজন ইরাকী লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)'র নিকট জিজ্ঞাসা করলেন- 'কাপড়ের ওপর মশার রক্ত লাগলে তার হুকুম কি?' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন- এর দিকে দেখ! মশার রক্তের মাসআলা জিজ্ঞাসা করছে অথচ এরাই নবী করিম (দ.) সন্তান (হোসাইন)কে শহীদ করেছে। আর আমি নবী করিম (দ.)কে বলতে শুনেছি- "হাসান ও হোসাইন আমার দুনিয়ার বাগানের দু'টি ফুল।"

সূত্র : তিরমিযী : হাদীস নং- ৩৭৭০, বুখারী : হাদীস নং-৫৬৪৮, নাসায়ী : হাদীস নং- ৮৫৩০

## হাদীস- ০৮

### হাসান ও হোসাইন (রা.)'র কানে নবী করিম (দ.) আযান দিয়েছেন

٨۔عَن اَبِی رَافِعٍؓ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ اَذَّنَ فِی اُذنِ الحَسَنِ وَ الحُسَینِؓ حِینَ وُلِدا

অর্থ : হযরত আবু রাফে (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন হাসান ও হোসাইন (রা.) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন হুযুর নবী করিম (দ.) স্বয়ং তাদের উভয়ের কানে আযান দিয়েছেন।

সূত্র : আল মু'জামুল কবীর : হাদীস নং- ৯২৬ মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৪:৬০

## হাদীস- ০৯

### নবী করিম (দ.) হাসান ও হোসাইন (রা.)'র আকীকা করেছেন

٩۔عَن اِبنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللّٰہِ ﷺ عَنِ الحَسَنِ وَ الحُسَینِ بِکَبشَینِ کَبشَینِ

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হুযুর আকরম (দ.) হাসান ও হোসাইন এর পক্ষ হতে আকীকার মধ্যে প্রত্যেকের জন্য দু'টি করে দুম্বা যবেহ করেছেন।

সূত্র : নাসায়ী : হাদীস নং- ৪২১৯, শরহে মুয়াত্তা ৩:১৩০

## হাদীস- ১০

### হাসনাইনে করীমাইন (রা.) রাসূলুল্লাহ (দ.)'র সাদৃশ্য ছিলেন

١٠۔عَن عَلِیٍّؓ قَالَ الحَسَنُ اَشبَہُ بِرَسُولِ اللّٰہِ ﷺ مَا بَینَ الصَّدرِ اِلَی الرَّاسِ وَ الحُسَینُ اَشبَہُ بِالنَّبِیِّ ﷺ مَا کَانَ اَسفَلَ مِن ذٰلِکَ

অর্থ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হাসান রাসূলুল্লাহ (দ.)'র বক্ষ হতে মাথা মুবারক পর্যন্ত অংশের সাথে সাদৃশ্য। আর হোসাইন রাসূলুল্লাহ (দ.)'র শরীর মুবারকের অবশিষ্ট নিচের অংশের সাথে সাদৃশ্য।

সূত্র : তিরমিযী : হাদীস নং- ৫৭৭৯, মুসনাদে আহমদ- ১:৯৯

## হাদীস- ১১

### হাসনাইন করীমাইন (রা.) নবীজি (দ.)'র বৈশিষ্ট্যসমূহের ওয়ারিছ

١١۔عَن فَاطِمَۃَ بِنتِ رَسُولِ اللّٰہِ ﷺ اَنَّہَا اَتَت بِالحَسَنِ وَ الحُسَینِ اَبَاہَا رَسُولَ اللّٰہِ ﷺ فِی شِکوَۃِ الَّتِی مَاتَ فِیہَا فَقَالَت تُورِّثُہُمَا یَا رَسُولَ اللّٰہِ شَیئًا فَقَالَ اَمَّا الحَسَنُ فَلَہُ ہَیبَتِی وَ سُؤدَدِی وَ اَمَّا الحُسَینُ فَلَہُ جُرَاتِی وَ جُودِی

অর্থ : হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় পিতা হুযুর রাসূলে করীম (দ.) এর ইন্তিকালপূর্ব অসুস্থাবস্থায় হাসান ও হোসাইনকে তাঁর (দ.) কাছে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি নিবেদন করলেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ.)! এদের দু'জনকে আপনার উত্তরাধিকার হতে কিছু দান করুন।' তিনি (দ.) বললেন- হাসান আমার 'ভীতিসঞ্চারক' ও 'নেতৃত্ব' এ দু'টির ওয়ারিশ; এবং হোসাইন আমার 'ধৈর্য্য' ও 'দানশীলতা' এ দু'টির ওয়ারিশ।

সূত্র : আল মু'জামুল কবীর- ২২:৪২৩; আল আহাদ ওয়াল মাসানী-১:২৯৯





## হাদীস- ১২

### হাসান ও হোসাইন (রা.) জান্নাতের যুবকদের সর্দার

١٢۔عَن حُذَیفَۃَؓ قَالَ سَالَتنِی اُمِّی مَتَی عَہدُکِ بِالنَّبِیِّ ﷺ فَقُلتُ مَا لِی بِہٖ عَہدٌ مُنذُ کَذَا وَ کَذَا فَنَالَت مِنِّی فَقُلتُ لَہَا دَعِینِی آتِی النَّبِیَّ ﷺ فَاُصَلِّی مَعَہُ المَغرِبَ وَ اَسالُہُ اَن یَستَغفِرَ لِی وَ لَکِ فَاَتَیتُ النَّبِیَّ ﷺ فَصَلَّیتُ مَعَہُ المَغرِبَ فَصَلَّی حَتّٰی صَلَّی العِشَاءَ ثُمَّ انفَتَلَ فَتَبِعتُہُ فَسَمِعَ صَوتِی فَقَالَ مَن ہٰذَا حُذَیفَۃُ قُلتُ نَعَم قَالَ مَا حَاجَتُکَ غَفَرَ اللّٰہُ لَکَ وَ لِاُمِّکَ قَالَ اِنَّ ہٰذَا مَلَکٌ لَم یَنزِلِ الاَرضَ قَطُّ قَبلَ ہٰذِہِ اللَّیلَۃِ اِستَاذَنَ رَبَّہُ اَن یُسَلِّمَ عَلَیَّ وَ یُبَشِّرَنِی بِاَنَّ فَاطِمَۃَ سَیِّدَۃُ نِسَاءِ اَہلِ الجَنَّۃِ وَ اَنَّ الحَسَنَ وَ الحُسَینَ سَیِّدَا شَبَابِ اَہلِ الجَنَّۃِ

অর্থ : হযরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমার মাতা আমার কাছে হুযুর নবী করিম (দ.) এর খেদমতে আমার হাজির হওয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলেন। আমি বললাম, 'এ ক'দিন হতে আমি তো হুযুর নবী করিম (দ.) এর খেদমতে হাজির হতে পারিনি'। এতে তিনি (মা) অসন্তুষ্ট হলেন। আমি বললাম যে, 'আমাকে অনুমতি দিন, আমি এক্ষুনি রাসূলে পাকের (দ.) দরবারে হাজির হব; তাঁর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করব এবং তাঁর সমীপে আরয করব যে, আমার ও আমার মায়ের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন।' অতঃপর আমি নবী করিম (দ.)'র খেদমতে হাজির হলাম এবং তাঁর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। অতঃপর হুযুর (দ.) নফল আদায় করতে করতে শেষপর্যন্ত এশা'র নামাযও আদায় করলেন। তারপর রাসূল (দ.) হুজরা শরীফের দিকে রওয়ানা করলে আমি তাঁর পিছনে চলতে লাগলাম। তিনি (দ.) আমার আওয়াজ শুনে বললেন: কে? হুযায়ফা! আমি আরয করলাম- জ্বী, হ্যাঁ। হুযুর নবী করিম (দ.) জিজ্ঞাসা করলেন- 'তোমার আর কি প্রয়োজন আছে? আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ও তোমার মাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।' অতঃপর তিনি (দ.) বললেন- এটি এক ফেরেশতা, যে ইতিপূর্বে কখনো দুনিয়ায় অবতরণ করেনি; সে স্বীয় প্রভুর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছে যেন সে আমার ওপর সালাম পেশ করে এবং আমাকে এ সুসংবাদ দেয় যে, ফাতেমা জান্নাতী রমণীকুলের সর্দার এবং হাসান ও হোসাইন জান্নাতী যুবকদের সর্দার।

সূত্র : তিরমিযী- ৫:৬৬০, মুসনাদে আহমদ- ৫:৩৯১, মুসতাদরাক- ৩:৪৩৯

## হাদীস- ১৩

### আল্লাহ তায়ালা হাসনাইন করীমাইন (রা.)কে পূতঃ পবিত্র চরিত্র দান করেছেন

١٣۔عَن عُمَرَ بنِ اَبِی سَلَمَۃَ رَبِیبِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَت ہٰذِہِ الاٰیَۃُ عَلَی النَّبِیِّ ﷺ ﴿اِنَّمَا یُرِیدُ اللّٰہُ لِیُذہِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَہلَ البَیتِ وَ یُطَہِّرَکُم تَطہِیرًا﴾ فِی بَیتِ اُمِّ سَلَمَۃَ فَدَعَا فَاطِمَۃَ وَ حَسَنًا وَحُسَینًا فَجَلَّلَہُم بِکِسَاءٍ وَ عَلِیٌّ خَلفَ ظَہرِہٖ فَجَلَّلَہ بِکِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ اللّٰہُمَّ ہٰؤُلَاءِ اَہلُ بَیتِی فَاَذہِب عَنہُمُ الرِّجسَ وَ طَہِّرہُم تَطہِیرًا

অর্থ : হুযুর নবী করিম (দ.) এর পালিত ওমর ইবনে আবু সালমা (রা.) বর্ণনা করেন- যখন হযরত উম্মে সালামা (রা.)'র ঘরে রাসূলুল্লাহ (দ.)'র ওপর এ আয়াত-

﴿اِنَّمَا یُرِیدُ اللّٰہُ لِیُذہِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَہلَ البَیتِ وَ یُطَہِّرَکُم تَطہِیرًا﴾

(হে আহলে বায়ত! আল্লাহ তো এটাই চান যে, তোমাদের থেকে সকল প্রকারের কলুষতা দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পূতঃ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।) অবতীর্ণ হল, তখন তিনি (দ.) সৈয়্যদা

ফাতেমা (রা.) ও হাসনাইন করীমাইন (রা.)কে ডাকলেন এবং তাদেরকে একটি চাদরের মধ্যে আবৃত করে নিলেন। হযরত আলী (রা.) তাঁর পিছনে ছিলেন। তিনি (দ.) তাকেও চাদরে আবৃত করে নিলেন। অতঃপর বললেন: 'হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বায়ত; সুতরাং এদের থেকে সকল প্রকারের কলুষতা দূর কর এবং এদেরকে পূতঃ পবিত্র করো'।

সূত্র : তিরমিযী-৫:৩৫১; আমেউল বয়ান ২২:৮

### হাদীস- ১৪
### নবী (দ.)কে ভালবাসলে হাসনাইন করীমাইনকে ভালবাসতে হবে

١٤ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اَحَبَّنِىْ فَلْيُحِبَّ هٰذَيْنِ

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন- হুযুর নবী করিম (দ.) ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে তার ওপর আবশ্যক যে, সে এ দু'জনকেও ভালবাসবে।

সূত্র : আস সুনানুল কুবরা- ৫:৫০; ফাযায়েলুস সাহাবী লিন-নাসাঈ- ১:২০

### হাদীস- ১৫
### হাসান ও হোসাইন (রা.)কে ভালবাসা মূলত নবী করিম (দ.)কেই ভালবাসা

١٥ـ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ شَهِدْتُ حُسَيْنًا حِيْنَ مَاتَ الْحَسَنُ وَهُوَ يَدْفَعُ فِىْ قَفَا سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ وَ هُوَ يَقُوْلُ تَقَدَّمْ فَلَوْلَا السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ وَ سَعِيْدٌ اَمِيْرٌ عَلَى الْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَامَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَتَنْفَسُوْنَ عَلَى ابْنِ نَبِيِّكُمْ تُرْبَةً يَدْفِنُوْنَهُ فِيْهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ مَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَبَّنِىْ

অর্থ : হযরত আবু হাযেম বর্ণনা করেন: আমি হাসান (রা.) এর শাহাদাতের সময় হোসাইন (রা.)'র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি (হোসাইন) হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.)কে গর্দানে হাত দিয়ে ধরে সামনের দিকে অগ্রসর করে দিয়ে বললেন- '(জানাযার নামায পড়ানোর জন্য) সামনে অগ্রসর হোন; যদি সুন্নাতে মুস্তফা (দ.) না হত, তাহলে আমি আপনাকে সামনে পাঠাতাম না।' আর হযরত সাঈদ (রা.) সেসময় মদীনার আমীর ছিলেন। অতঃপর যখন সবাই জানাযার নামায আদায় করলেন তখন হযরত আবু হোরায়রা (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন: 'তোমরা কেমন হৃদয় নিয়ে নবীজি (দ.)'র সাহেবজাদাকে মাটিতে দাফন করে তার ওপর মাটি চাপা দেবে?" সেইসাথে তিনি (গভীর ভারাক্রান্ত হয়ে) বললেন: আমি নবী করিম (দ.)কে বলতে শুনেছি- 'যে ব্যক্তি এদেরকে ভালবাসবে, সে মূলত আমাকেই ভালবাসল।

সূত্র : মুসান্নেফে আবদুর রাজ্জাক- ৩:৭১; মুসনাদে আহমদ- ২:৫৩১; মুসতাদরাক-৩:১৮৭

### হাদীস- ১৬
### হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র ভালবাসার মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া যায়

١٦ـ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَحَبَّهُمَا اَحَبَّنِىْ وَ مَنْ اَحَبَّنِىْ اَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ اَحَبَّهُ اللهُ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

অর্থ : হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করিম (দ.)কে বলতে শুনেছি: 'যে ব্যক্তি হাসান ও হোসাইনকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল তাকে আল্লাহ ভালবাসবেন। আর যাকে আল্লাহ ভালবাসল তিনি (আল্লাহ) তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

সূত্র : মুসতাদরাক-৩:১৮১





### হাদীস- ১৭
### হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র ভালবাসা কিয়ামত দিবসে নবীজি (দ.)'র সঙ্গলাভের মাধ্যম

١٧ـ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَ حُسَيْنٍ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّنِىْ وَ اَحَبَّ هٰذَيْنِ وَ اَبَاهُمَا وَ اُمَّهُمَا كَانَ مَعِىْ فِىْ دَرَجَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ : হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন- হুযুর নবীয়ে আকরম (দ.) হাসান ও হোসাইন (রা.) এর হাত ধরে বললেন : যে ব্যক্তি আমাকে এবং এ দু'জনকে ভালবাসল; এবং এদের পিতাকে ও এদের মাতাকে ভালবাসল, সে কিয়ামত দিবসে আমার সাথে আমার একই ঠিকানায় থাকবে।

সূত্র : তিরমিযি : হাদীস নং-৩৭৩৩, মুসনাদে আহমদ : হাদীস নং-৫৭৬

### হাদীস- ১৮
### নবীজি (দ.) হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র জন্য আল্লাহর ভালবাসা প্রার্থনা করেছেন

١٨ـ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَبْصَرَ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا

অর্থ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক (দ.) হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র দিকে তাকিয়ে বললেন: হে আল্লাহ! আমি এদেরকে ভালবাসি, তুমিও তাদেরকে ভালবাস।

সূত্র : তিরমিযী : হাদীস নং- ৩৭৮২; নাইলুল আউতার- ৬:১৪০

### হাদীস- ১৯
### হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র প্রতি বিদ্বেষপোষণ মূলত নবীজি (দ.)'র প্রতি বিদ্বেষপোষণ

١٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ

অর্থ : হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি হাসান ও হোসাইনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল।

সূত্র : ইবনে মাজাহ : হাদীস নং- ১৪৩; নাসাঈ : হাদীস নং- ৮১৬৮

### হাদীস- ২০
### হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র প্রতি বিদ্বেষ পোষণ আল্লাহর গযবের কারণ

٢٠ـ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ مَنْ اَبْغَضَهُمَا اَوْ بَغَى عَلَيْهِمَا اَبْغَضْتُهُ وَ مَنْ اَبْغَضْتُهُ اَبْغَضَهُ اللهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُ اللهُ اَدْخَلَهُ عَذَابَ جَهَنَّمَ وَ لَهُ عَذَابٌ مُقِيْمٌ

অর্থ : হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেন যে, হুযুর নবীয়ে আকরম (দ.) হাসান (রা.) ও হোসাইন (রা.) সম্পর্কে বলেছেন : যে এদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল অথবা তাদের সাথে শত্রুতা করল, সে আমার নিকট বিদ্বেষের পাত্র হল। আর যে আমার নিকট বিদ্বেষের উপযুক্ত হল, সে আল্লাহর গযবের শিকার হল। আর যে আল্লাহর গযবের শিকার হল তাকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আযাবে প্রবেশ করাবেন, (যেখানে) তার জন্য চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে।

সূত্র : মু'জামুল কবী : হাদীস নং- ২৬৫৫; মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৯:১৮০

### হাদীস- ২১

### হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র প্রতি বন্ধুত্ব ও শত্রুতা পোষণকারীর জন্য নবীজি (দ.)'র দোয়া

٢١۔عن أم سلمة قالت جاءت فاطمة بنت النبي ﷺ إلى رسول الله ﷺ متوركة الحسن و الحسين في يدها برمة للحسن فيها سخين حتى أتت بها النبي ﷺ فلما وضعتها قدامه قال لها أين أبو الحسن قالت في البيت فدعاه فجلس النبي ﷺ و علي و فاطمة و الحسن و الحسين يأكلون قالت أم سلمة وما سامني النبي ﷺ و ما أكل طعاما قط إلا و أنا عنده إلا سامنيه قبل ذلك اليوم تعني سامني دعاني إليه فلما فرغ التف عليهم بثوبه ثم قال اللهم عاد من عاداهم و وال من والاهم

অর্থ : উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী দুলারী হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা (রা.) হাসনাইন করীমাইন (রা.)কে নিয়ে হুযুর নবী করিম (দ.) এর নিকট আসলেন এবং তাঁর হাতে পাথরের একটি হাঁড়ি ছিল যাতে হাসানের জন্য রান্না করা গরম তরকারী ছিল। সৈয়্যদা ফাতেমা (রা.) তা এনে নবীজি (দ.)'র সামনে রাখলে তিনি (দ.) জিজ্ঞাসা করলেন- 'হাসানের পিতা (আলী) কোথায়?' ফাতেমা উত্তর দিলেন- ঘরে আছে। তিনি (দ.) তাকে ডাকলেন। অতঃপর নবীজি (দ.), আলী (রা.), ফাতেমা (রা.) ও হাসনাইন (রা.) একত্রে বসে খানা খেতে লাগলেন। উম্মে সালমা (রা.) বলেন- নবী করিম (দ.) আমাকে ডাকলেন না। ইতিপূর্বে এমন কখনও হয়নি যে, হুযুর (দ.) আমার উপস্থিতিতে খানা খেয়েছেন অথচ আমাকে ডাকেননি। অতঃপর যখন তিনি (দ.) খানা থেকে অবসর হলেন, তখন তাদের সবাইকে স্বীয় চাদরে আবৃত করে বললেন : হে আল্লাহ! যে এদের সাথে শত্রুতা রাখে, তুমি তাদের সাথে শত্রুতা রাখ। আর যে এদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে তুমিও তার সাথে বন্ধুত্ব রাখ।

সূত্র : মুসনদে আবু ইয়ালা : হাদীস নং- ৬৯১৫; মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৯:১৬৬

### হাদীস- ২২

### হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের প্রতি নবীজি (দ.)'র যুদ্ধ ঘোষণা

٢٢۔عن زيد بن أرقم أن رسول الله ﷺ قال لعلي و فاطمة و الحسن و الحسين أنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم

অর্থ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকম (রা.) হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে আকরম (দ.) হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতেমা (রা.), হযরত হাসান (রা.) ও হোসাইন (রা.) কে লক্ষ্য করে বলেছেন- যার সাথে তোমাদের যুদ্ধ হবে, তার সাথে আমারও যুদ্ধ হবে। আর যার সাথে তোমরা চুক্তি করবে, তার সাথে আমারও চুক্তি হবে।

সূত্র : তিরমিযী : হাদীস নং- ৩৮৭০; ইবনে মাজাহ : হাদীস নং- ১৪৫

### হাদীস- ২৩

### হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র জন্য নবীজি (দ.)'র মাতা-পিতা উৎসর্গিত

٢٣۔عن سلمان قال كنا حول النبي ﷺ فجاءت أم أيمن فقالت يا رسول الله ﷺ لقد ضل الحسن و الحسين قال و ذلك راد النهار يقول ارتفاع النهار فقال رسول الله ﷺ قوموا فاطلبوا ابني قال و أخذ كل رجل تجاه وجهه و أخذت نحو النبي ﷺ فلم يزل حتى أتى سفح جبل و إذا الحسن و الحسين ملتزق كل واحد منهما صاحبه و إذا شجاع قائم على ذنبه يخرج من فيه شبه النار فأسرع إليه رسول الله ﷺ فالتفت مخاطبا لرسول الله ﷺ ثم انساب فدخل بعض الأجحرة ثم أتاهما فأفرق بينهما و مسح وجههما و قال بأبي و أمي أنتما ما أكرمكما على الله

অর্থ : হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা হুযুর নবীয়ে আকরম (দ.) এর নিকট বসা ছিলাম। ইত্যবসরে উম্মে আয়মন তাঁর (দ.) কাছে এসে আরয করল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাসান ও হোসাইন হারিয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন- তখন দিন ভালভাবে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি (দ.) বললেন- চলো, আমার সন্তানদের খোঁজ নিই। বর্ণনাকারী বলেন- সবাই এক এক রাস্তায় তাঁদের সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন। আমি হুযুর (দ.) এর সাথে চলতে লাগলাম। তিনি (দ.) একাধারে চলতে চলতে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেলেন, (দেখলেন) হাসান ও হোসাইন (রা.) একে অপরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি অজগর তার নিঃশ্বাস নিয়ে পাশে স্থির হয়ে আছে এবং সেটির মুখ থেকে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। তিনি (দ.) সেদিকে দ্রুত অগ্রসর হলেন, তখন সে অজগরটি নবী করিম (দ.) এর প্রতি দৃষ্টি ফেরাল, তারপর জড়সড় হয়ে পালিয়ে দ্রুত পাথরের মধ্যে ঢুকে গেল। অতঃপর তিনি (দ.) হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র নিকট তাশরীফ নিলেন, তাঁদের উভয়কে পৃথক করলেন এবং তাঁদের চেহারা মুছে দিয়ে বললেন: 'আমার পিতামাতা তোমাদের ওপর উৎসর্গ হোক; তোমরা আল্লাহর নিকট কতই না সম্মানিত।'

সূত্র : মু'জামুল কবীর : হাদীস নং- ২৬৭৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৯:১৮২

### হাদীস- ২৪

### হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র ক্রন্দনে নবীজি (দ.)'র অস্থিরতা

٢٤۔عن يزيد بن أبي زياد قال خرج النبي ﷺ من بيت عائشة فمر على فاطمة فسمع حسينا يبكي فقال ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني

অর্থ : হযরত ইয়াযিদ ইবেন আবু যিয়াদ হতে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে আকরম (দ.) হযরত আয়েশা (রা.)'র ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ আনলেন এবং হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা (রা.)'র ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হোসাইন (রা.)'র কান্নার আওয়াজ শুনলেন। তখন তিনি (দ.) বললেন : "তোমার কি জানা নাই যে, তাঁর কান্না আমাকে কষ্ট দেয়?"

সূত্র : মু'জামুল কবীর : হাদীস নং- ২৮৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৯:২০১

### হাদীস- ২৫

### হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র জন্য নবীজি (দ.)'র মিম্বর হতে অবতরণ

٢٥۔عن أبي بريدة ﷺ يقول كان رسول الله ﷺ يخطبنا إذ جاء الحسن و الحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان و يعثران فنزل رسول الله ﷺ من المنبر فحملهما و وضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ﴿إنما أموالكم و أولادكم فتنة﴾ فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان و يعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي و رفعتهما

অর্থ : হযরত আবু বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হুযুর নবী করিম (দ.) আমাদেরকে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় হাসনাইন করীমাইন (রা.) তাশরীফ আনছিলেন। তাঁরা লাল রঙের জামা পরিহিত ছিলেন এবং তাঁরা (অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে) টলমল করে হাঁটছিলেন। হুযুর নবীয়ে আকরম (দ.) (তাঁদেরকে দেখে) মিম্বর হতে নিচে তাশরীফ আনলেন, উভয় (শাহযাদা)কে উঠালেন এবং নিজের সামনে বসালেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: আল্লাহ তায়ালার বাণী সত্য- "নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তোমাদের জন্য পরীক্ষা"। আমি এ বাচ্চাদেরকে টলমল করে হাঁটতে দেখে আমার ধৈর্য্য হয়নি; শেষপর্যন্ত আমার কথা সম্পন্ন না করে অর্ধেকে কেটে দিয়ে তাদেরকে উঠিয়ে নিয়েছি।

সূত্র : তিরমিযী : হাদীস নং- ৩৭৭৪; নাসাঈ : হাদীস নং- ১৪৮৫

## হাদীস- ২৬

### হাসনাইন করীমাইন (রা.) নবীজি (দ.)'র জিহ্বা চুষতেন

٢٦_عَن أَبِي هُرَيْرَةَؓ فَقَالَ أَشهَدُ لَخَرجنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِبَعضِ الطَّرِيقِ سَمِعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صَوتَ الحَسَنِ وَالحُسَينِ وَهُمَا يَبكِيَانِ وَهُمَا مَعَ أُمِّهِمَا فَاسرَعَ السَّيرَ حَتّٰى آتَاهُمَا فَسَمِعتُهُ يَقُولُ لَهَا مَا شَأنُ ابنَيَّ فَقَالَت العَطَشُ قَالَ فَاخلَفَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى شَنَّةٍ يَبتَغِي فِيهَا مَاءً وَكَانَ المَاءُ يَومَئِذٍ اغدَارًا وَ النَّاسُ يُرِيدُونَ المَاءَ فَنَادَى هَل أَحَدٌ مِنكُم مَعَهُ مَاءٌ فَلَم يَبقَ أَحَدٌ إِلَّا أَخلَفَ بِيَدِهِ إِلَى كَلَابِهِ يَبتَغِي المَاءَ فِي شَنَّةٍ فَلَم يَجِد أَحَدٌ مِنهُم قَطرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ نَاوِلِينِي أَحَدَهُمَا فَنَاوَلَتهُ إِيَّاهُ مِن تَحتِ الخِدرِ فَاخَذَهُ فَضَمَّهُ إِلَى صَدرِهِ وَهُوَ يَطغُو مَا يَسكُتُ فَادلَعَ لَهُ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يَمُصُّهُ حَتّٰى هَدَأَ أَو سَكَنَ فَلَم أَسمَع لَهُ بُكَاءً وَ الآخَرُ يَبكِي كَمَا هُوَ مَا يَسكُتُ فَقَالَ نَاوِلِينِي الآخَرَ فَنَاوَلَتهُ إِيَّاهُ فَفَعَلَ بِهِ كَذٰلِكَ فَسَكَتَا فَمَا أَسمَعُ لَهُمَا صَوتًا

অর্থ : হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা হুযুর আকরম (দ.) এর সাথে (সফরে) বের হলাম। তখনও আমরা রাস্তায় ছিলাম, তখন তিনি হাসান ও হোসাইন (রা.) উভয়ের কান্নার আওয়াজ শুনলেন এবং তাঁরা উভয়ে তখন তাদের মাতা [হযরত সৈয়্যাদা ফাতেমা (রা.)]'র নিকটই ছিলেন। অতঃপর তিনি (দ.) খুব দ্রুতবেগে তাদের কাছে পৌঁছলেন। [আবু হোরায়রা (রা.) বলেন,] আমি তাঁকে (দ.) হযরত সৈয়্যাদা ফাতেমা (রা.)কে এরূপ বলতে শুনেছি : "আমার সন্তানদের কী হয়েছে?" সৈয়্যাদা ফাতেমা (রা.) বললেন: 'তাদের খুব বেশী পিপাসা পেয়েছে'। হুযুর (দ.) পানির জন্য মশকের দিকে অগ্রসর হলেন। সেকালে পানির খুবই স্বল্পতা ছিল এবং পানি মানুষের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি (দ.) লোকদেরকে ডাক দিয়ে বললেন: কারো কাছে পানি আছে কি? সবাই তাদের মশকে পানি তালাশ করল; কিন্তু তাদের এক ফোঁটা পানিও মিলল না। তিনি (দ.) হযরত ফাতেমা (রা.)কে বললেন: একটি বাচ্চা আমাকে দাও। তিনি (রা.) তাদের একজনকে পর্দার নীচ দিয়ে এগিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি (দ.) তাঁকে নিয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন; কিন্তু প্রচন্ড পিপাসার কারণে সে তখনও একাধারে কান্না করছিল এবং কান্না কিছুতেই থামছিল না। অতঃপর তিনি (দ.) তার মুখে নিজের জিহ্বা প্রবেশ করিয়ে দিলেন; সে তা চুষতে লাগল। একপর্যায়ে পিপাসা নিবারণের কারণে শান্ত হয়ে গেল। আমি দ্বিতীয়বার তার কান্নার আওয়াজ শুনলাম না। দ্বিতীয়জন তখনও এভাবে (একাধারে কান্না করছিল)। অতঃপর হুযুর (দ.) বললেন: দ্বিতীয়জনকেও আমাকে দাও। সৈয়্যাদা ফাতেমা (রা.) অপরজনকেও হুযুর (দ.) এর হাতে দিয়ে দিলেন। হুযুর (দ.) তাকেও একইভাবে শান্ত করলেন। (অর্থাৎ জিহবা মুবারক তার মুখে পুরে দিলেন)। ফলে সেও এভাবে চুপ হয়ে গেল যে, আমি দ্বিতীয়বার তার কান্নার আওয়াজ শুনিনি।

সূত্র : মু'জামুল কবীর : হাদীস নং- ২৬৫৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৯ : ১৮১

## হাদীস- ২৭

### হাসনাইন করীমাইন (রা.) হুযুর (দ.)'র পেট মুবারকের ওপর খেলা করতেন

٢٧_عَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍؓ قَالَ دَخَلتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَ الحَسَنُ وَ الحُسَينُ يَلعَبَانِ عَلَى بَطنِهِ فَقُلتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَتُحِبُّهُمَا فَقَالَ وَمَا لِي لَا أُحِبُّهُمَا وَهُمَا رَيحَانَتَايَ

অর্থ : হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি হুযুর নবীয়ে আকরম (দ.) এর দরবারে হাজির হলাম (আমি দেখলাম যে,) হাসান ও হোসাইন (রা.) তাঁর (দ.) পেট মুবারকের ওপর





খেলছিল। আমি তখন আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তাদেরকে ভালবাসেন? তখন নবী করিম (দ.) ইরশাদ করলেন- 'আমি তাদেরকে কেন ভালবাসব না; অথচ এরা উভয়েই আমার ফুল'।

সূত্র : মুসনাদে বাযযার : হাদীস নং- ১০৭৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৯:১৮১

## হাদীস- ২৮

### হাসনাইন করীমাইন (রা.) নামাযরত অবস্থায় হুযুর (দ.)'র পিঠ মুবারকে আরোহন করতেন

٢٨_عَن أَبِي هُرَيرَةَؓ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ العِشَاءَ فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الحَسَنُ وَ الحُسَينُ عَلَى ظَهرِهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِن خَلفِهِ أَخذًا رَفِيقًا وَ يَضَعُهُمَا عَلَى الأَرضِ فَإِذَا عَادَ عَادَا حَتّٰى قَضَى صَلَاتَهُ أَقعَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيهِ

অর্থ : হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হুযুর নবী করিম (দ.) এর সাথে এশা'র নামায আদায় করছিলাম। তিনি (দ.) যখন সিজদায় গেলেন তখন হাসান ও হোসাইন (রা.) উভয়ে তাঁর (দ.) পিঠ মুবারকের ওপর আরোহন করলেন। যখন তিনি (দ.) সিজদা হতে মাথা উঠালেন তখন তাদের দু'জনকে পিছন থেকে খুবই নম্রতার সাথে ধরে যমীনে বসিয়ে দিলেন। যখন তিনি (দ.) দ্বিতীয়বার সিজদায় গেলেন, তখন শাহ্যাদাদ্বয় পুনরায় একইরকম করলেন। (এ ধারাবাহিকতা চলছিল) শেষপর্যন্ত তিনি (দ.) নামায সম্পন্ন করলেন। তারপর তাদের উভয়কে স্বীয় উরু মুবারকের ওপর বসালেন।

সূত্র : মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং- ১০৬৬৯; মু'জামুল কবীর : হাদীস নং- ২৬৫৯

## হাদীস- ২৯

### নবীজি (দ.)'র উক্তি : এরা দু'জন কতই না উত্তম আরোহী!

٢٩_عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِؓ قَالَ رَأَيتُ الحَسَنَ وَ الحُسَينَؓ عَلَى عَاتِقَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلتُ نِعمَ الفَرَسُ تَحتَكُم قَالَ وَ نِعمَ الفَارِسَانِ هُمَا

অর্থ : হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন- আমি হাসান ও হোসাইন (রা.) উভয়কে হুযুর নবীয়ে আকরম (দ.) কাঁধ মুবারকের ওপর (আরোহী) দেখে বললাম- (হে শাহাযাদা!) আপনাদের নীচে কতই না উত্তম সওয়ারী (বাহন)। তিনি (দ.) উত্তরে বললেন- এও একটু দেখো! আরোহীও কতই উত্তম।

সূত্র : মুসনাদে বাযযার- ১:৪১৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৯:১৮১

## হাদীস- ৩০

### হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র জন্য নবীজি (দ.)'র নামাযের সিজদা দীর্ঘায়িতকরণ

٣٠_عَن عَبدِ اللّٰهِ بنِ شَدَّادٍ عَن أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي إِحدَى صَلَوَاتِ العِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَو حُسَينًا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَينَ ظَهرَانَي صَلَاتِهِ سَجدَةً أَطَالَهَا قَالَ أَبِي فَرَفَعتُ رَأسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهرِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكَ سَجَدتَ بَينَ ظَهرَانَي صَلَاتِكَ سَجدَةً أَطَلتَهَا حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَد حَدَثَ أَمرٌ أَو أَنَّهُ يُوحَى إِلَيكَ قَالَ ذٰلِكَ لَم يَكُن وَ لٰكِن ابنِي ارتَحَلَنِي فَكَرِهتُ أَن أُعَجِّلَهُ حَتّٰى يَقضِيَ حَاجَتَهُ

অর্থ : আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ স্বীয় পিতা শাদ্দাদ বিন হাদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হুযুর আকরম (দ.) এশা'র নামায আদায়ের জন্য আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন এবং তিনি (দ.) হাসান অথবা হোসাইন (রা.) (হতে কোন এক শাহ্যাদা) কে কাঁধের ওপর করে এনেছিলেন। হুযুর (দ.) তাশরীফ এনে তাকে

যমীনে বসিয়ে দিলেন, অতঃপর নামাযের জন্য তাকবীর বললেন এবং নামায পড়া শুরু করে দিলেন। নামাযের মধ্যে হুযুর (দ.) সিজদা দীর্ঘায়িত করলেন। শাদ্দাদ (রা.) বলেন- আমি মাথা তুলে দেখলাম, সিজদা অবস্থায় তাঁর (দ.) পিঠ মুবারকের ওপর শাহযাদা আরোহণ করে আছেন। আমি পুনরায় সিজদায় চলে গেলাম। যখন হুযুর (দ.) নামায সম্পন্ন করলেন তখন লোকেরা আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নামাযের মধ্যে সিজদা এত দীর্ঘ করেছেন; এমনকি আমরা মনে করেছি যে, আল্লাহর কোন নির্দেশ হয়ত বাস্তবায়ন হয়ে গিয়েছে, কিংবা আপনার ওপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। তিনি (দ.) ইরশাদ করলেন: এমন কিছু নয়; তবে কারণ হল এই, আমার ওপরে আমার সন্তান আরোহন করেছিল। এজন্য (সিজদা হতে উঠার ক্ষেত্রে) তাড়াতাড়ি করাটা আমার পছন্দ হয়নি, যতক্ষণ তার মনের চাহিদা পূর্ণ হয়নি।

সূত্র : নাসাই : হাদীস নং- ১১৪১; মুসনাদে আহমদ- ৩:৪৯৩

## হাদীস- ৩১

### শাহযাদাদ্বয়কে হুযুর (দ.) স্বীয় শরীরের সাথে জড়িয়ে নিতেন

٣١ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ طَرَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ قَالَ فَكَشَفَهُ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ فَقَالَ هَذَانِ ابْنَايَ

অর্থ : হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি একরাতে কোন একটি কাজে হুযুর (দ.) এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি (দ.) বাইরে তাশরীফ আনলেন এবং তিনি কোন কিছু স্বীয় শরীর মুবারকের সাথে লাগিয়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন। এটা আমি তখনই জানতে পারলাম, যখন আমার কাজ হতে অবসর হলাম, আমি আরয করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার শরীর মুবারকের সাথে কি জিনিস জড়িয়ে রেখেছেন? তিনি (দ.) কাপড় সরালেন, দেখা গেল হাসান ও হোসাইন (রা.) উভয়ে তাঁর (দ.) উরু পর্যন্ত লেগে আছে। তিনি (দ.) বললেন- এরা দু'জন আমার সন্তান।

সূত্র : তিরমিযী : হাদীস নং- ৩৭৬৯; নাসাই : হাদীস নং- ৮৫২৪

## হাদীস- ৩২

### নবীজি (দ.)'র সাথে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী- হাসনাইন করীমাইন (রা.)

٣٢ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَسَدَ النَّاسِ إِيَّايَ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَنَا وَأَنْتَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ

অর্থ : হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হুযুর করিম (দ.) এর কাছে অভিযোগ পেশ করলাম যে, লোকেরা আমার সাথে অত্যাধিক হিংসা-বিদ্বেষ করে। তখন তিনি (দ.) বললেন- তুমি কি একথার ওপর সন্তুষ্ট নও যে, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থজন তুমি। (সেই চারজন হল) আমি, তুমি, হাসান ও হোসাইন।

সূত্র : মুসনাদে আহমদ- ২:৬২৪; মু'জামুল কবীর : হাদীস নং- ৯৫০

## হাদীস- ৩৩

### হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র উপস্থিতিতে জান্নাতের সৌন্দর্য্য বর্ধন

٣٣ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ شَنْفَا الْعَرْشِ وَلَيْسَا بِمُعَلَّقَيْنِ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَقَرَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ قَالَتِ الْجَنَّةُ يَا رَبِّ وَعَدْتَنِي أَنْ تُزَيِّنَنِي بِرُكْنَيْنِ مِنْ أَرْكَانِكَ قَالَ أَوَلَمْ أُزَيِّنْكِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ





অর্থ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত, হুযুর আকরম (দ.) ইরশাদ করেছেন- 'হাসান ও হোসাইন আরশের দু'টি স্তম্ভ। তবে তারা ঝুলন্ত স্তম্ভ নয়। তিনি বললেন- যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে অবস্থান করবে তখন জান্নাত নিবেদন করবে : 'হে পরওয়ারদেগার! আপনি আমাকে আপনার স্তম্ভসমূহ হতে দু'টি স্তম্ভ দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।' আল্লাহ বলবেন : আমি কি হাসান ও হোসাইন এর উপস্থিতির মাধ্যমে তোমাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিইনি? (এরাই তো আমার দু'টি স্তম্ভ)।

সূত্র : মু'জামুল আউসাত : হাদীস নং- ৩৩৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৯:১৮৪

## হাদীস- ৩৪

٣٤ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَتِ الْجَنَّةُ عَلَى النَّارِ فَقَالَتْ أَنَا خَيْرٌ مِنْكِ فَقَالَتِ النَّارُ بَلْ أَنَا خَيْرٌ مِنْكِ فَقَالَتْ لَهَا الْجَنَّةُ اسْتَفْهَامًا وَمِمَّهْ قَالَتْ فِيَّ الْجَبَابِرَةُ وَنَمْرُودُ وَفِرْعَوْنُ فَأُسْكِتَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا لَا تَخْضَعِينَ لَأُزَيِّنَنَّ رُكْنَيْكِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَمَاسَتْ كَمَا تَمِيسُ الْعَرُوسُ فِي خِدْرِهَا

অর্থ : হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, হুযুর নবী করিম (দ.) ইরশাদ করেন- একবার জান্নাত দোযখের ওপর গর্ব করে বলল: 'আমি তোমার চেয়ে উত্তম'। দোযখ বলল- আমি তোমার চেয়ে উত্তম। জান্নাত দোযখের কাছে জিজ্ঞাসা করল- কীভাবে? দোযখ বলল- 'এজন্য যে, আমার মধ্যে রয়েছে দুনিয়ার বড় বড় প্রতাপশালী যালিম শাসকরা, ফেরাউন ও নমরূদ।' এতে জান্নাত নিশ্চুপ হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন- 'তুমি অক্ষম ও নিরুত্তর হয়ো না; আমি তোমার দু'টি স্তম্ভ হাসান ও হোসাইন এর মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেব।' অতঃপর জান্নাত আনন্দ ও খুশীতে এভাবে লজ্জিত হল, যেভাবে নববধূ লজ্জাবোধ করে।

সূত্র : মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৯:১৮৪; মু'জামুল আউসাত : হাদীস নং- ৭১২০

## হাদীস- ৩৫

### কিয়ামত দিবসে হাসনাইন করীমাইন (রা.) আরশের নিচে থাকবেন

٣٥ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ فِي قُبَّةٍ بَيْضَاءَ سَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ

অর্থ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযুর নবী করিম (দ.) ইরশাদ করেন- নিশ্চয় ফাতেমা, আলী, হাসান ও হোসাইন জান্নাতে সাদা গুম্বুজে অবস্থান করবেন, যার ছাদ হবে আল্লাহ তায়ালার আরশে আজীম।

সূত্র : কানযুল উম্মাল : হাদীস নং- ৩৪১৬৭; তারীখে দামেস্ক আল কবীর- ১৪:৬১

## হাদীস- ৩৬

### হাসনাইন করীমাইন (রা.) কিয়ামত দিবসে নবীজি (দ.)'র সাথে থাকবেন

٣٦ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى الْمَنَامَةِ فَاسْتَسْقَى الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى شَاةٍ لَنَا بَكِيٍّ فَحَلَبَهَا فَدَرَّتْ فَجَاءَهُ الْحَسَنُ فَنَحَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَيْكَ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ اسْتَسْقَى قَبْلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي وَإِيَّاكِ وَهَذَيْنِ وَهَذَا الرَّاقِدَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ : হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন- আমি আমার বিছানায় শোয়া ছিলাম। এমতাবস্থায় হুযুর নবী করিম (দ.) আমাদের ঘরে তাশরীফ আনলেন। হাসান অথবা হোসাইন (দু'জনের কোন একজন) পানি চাইল। তিনি (দ.) আমাদের বকরীর কাছে আসলেন, যেটি খুব কম দুধওয়ালী ছিল। অতঃপর তিনি (দ.) সেটির দুধ বের করলেন। দেখা গেল, সেটি অনেক বেশি দুধ দিয়েছে। অতঃপর হাসান (রা.) তাঁর (দ.) নিকটে আসলে তিনি (দ.) তার দিকে নিবিষ্ট হলেন। সৈয়াদা ফাতেমা (রা.) বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ.)! মনে হচ্ছে, তাদের দু'জনে মধ্যে এ-ই আপনার নিকট বেশি প্রিয়? তিনি (দ.) বললেন- না, বরং সে প্রথমেই পানি চেয়েছিল। অতঃপর তিনি (দ.) বললেন- আমি, তুমি, এরা দু'জন এবং এ শয়নকারী [হযরত আলী (রা.); কেননা তিনি তখনো শোয়া থেকে উঠছিলেন মাত্র] কিয়ামত দিবসে একই স্থানে থাকব।

সূত্র : মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং- ৭৯২; মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৯:১৭০

### হাদীস- ৩৭

### হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র জন্য হুযুর (দ.) এর বিশেষ আশ্রয় প্রার্থনা

٣٧ـ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَ الحُسَيْنَ وَ يَقُولُ إِنَّ اَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ و إِسْحَاقَ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَمِن كُلِّ عَينٍ لَامَّةٍ

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হুযুর করিম (দ.) হাসান ও হোসাইন (রা.) এর প্রতি (বিশেষভাবে) 'আউযুবিল্লাহ' পড়ে দম করতেন এবং বলতেন- তোমাদের প্রপিতামহ [ইব্রাহীম (আ.)] তাঁর দু'পুত্র ইসমাঈল (আ.) ও ইসহাক (আ.) এর প্রতি তাউযের এ শব্দগুলি পড়ে দম করতেন- 'আমি আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ শব্দসমূহ দ্বারা সকল শয়তান, মসিবত ও কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা চাই।'

সূত্র : বুখারী : হাদীস নং- ৩১৯১; ইবনে মাজাহ: হাদীস নং- ৩৫২৫

### হাদীস- ৩৮

### হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র জন্য আকাশের বিজলী দ্বারা রাস্তা আলোকিতকরণ

٣٨ـ عَن اَبِي هُرَيرَةَؓ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ العِشَاءَ فَاِذَا سَجَدَ وَثَبَ الحَسَنُ وَ الحُسَينُ عَلَى ظَهرِهِ فَاِذَا رَفَعَ رَاسَهُ اَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِن خَلفِهِ اَخذًا رَفِيقًا وَ يَضَعُهُمَا عَلَى الاَرضِ فَاِذَا عَادَ عَادَا حَتّى قَضَى صَلَاتَهُ اَقعَدَهُمَا عَلَى فَخذَيهِ قَالَ فَقُمتُ اِلَيهِ فَقُلتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَرِدهُمَا فَبَرَقَتْ بَرقَةٌ فَقَالَ لَهُمَا الحَقَا بِاُمِّكُمَا قَالَ فَمَكُثَ ضَوئُهَا حَتّى دَخَلَا

অর্থ : হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হুযুর নবী করিম (দ.) এর সাথে আমরা এশার নামায পড়ছিলাম। যখন তিনি সিজদায় গেলেন তখন হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.) তাঁর (দ.) পিঠে আরোহণ করলেন। অতঃপর যখন তিনি সিজদা হতে মাথা উঠালেন তখন দু'জনকে তাঁর পিছনে বড় নম্রতার সাথে যমীনে বসিয়ে দিলেন। আবার যখন তিনি দ্বিতীয়বার সিজদায় গেলেন তখন হাসান ও হোসাইন (রা.) পুনরায় তাঁর পিঠে চড়লেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (দ.) নামায পরিপূর্ণ করে তাদেরকে তাঁর উরুর ওপর বসালেন। আমি দাঁড়িয়ে আরয করলাম- 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি এদেরকে রেখে আসি'। এসময় হঠাৎ আকাশে বিজলী চমকাল এবং তিনি হাসনাইন করীমাইনকে বললেন- তোমাদের মায়ের নিকট চলে যাও। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন- তারা ঘরে প্রবেশ করা পর্যন্ত বিজলীর আলো স্থির ছিল।

সূত্র : মুসনাদে আহমদ : হাদীস নং- ১০৬৬৯; মু'জামুল কবীর : হাদীস নং- ২৬৫৯





### হাদীস- ৩৯

### হুযুর (দ.) ও জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক হাসনাইন করীমাইন (রা.)কে উৎসাহ প্রদান

٣٩ـ عَن اَبِي هُرَيرَةَؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ الحَسَنُ وَ الحُسَينُؓ يَصطَرِعَانِ بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ هِي حَسَنُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُؓ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِمَ تَقُولُ هِي حَسَنُ اِنَّ جِبرَيلَ يَقُولُ هِي حُسَينُ

অর্থ : হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হুযুর নবী করিম (দ.) থেকে বর্ণনা করেন, হাসান ও হোসাইন (রা.) রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সামনে তারা কুস্তি ধরলেন এবং রাসূলুল্লাহ (দ.) বলছেন- 'হাসান। তাড়াতাড়ি কর'। হযরত ফাতেমা (রা.) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল। আপনি কেবল হাসানকে তাড়াতাড়ি করতে বলছেন কেন? রাসূলুল্লাহ (দ.) উত্তরে বললেন- কেননা, জিবরাঈল (আ.) হোসাইনকে তাড়াতাড়ি করতে বলছেন।

সূত্র : আল ইসাবাহ: হাদীস নং- ১৭২৬; আল কামেল : হাদীস নং- ১১৯১

### হাদীস- ৪০

### হুযুর (দ.) হাসনাইন করীমাইন (রা.) কে চুমু দিতেন

٤٠ـ عَن اَبِي السَّعدِلِ عَطِيَّةَ الطَّفَاوِي عَن اَبِيهِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتهُ قَالَت بَينَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيتِي يَومًا اِذ قَالَ الخَادِمُ اِنَّ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ بِالسُّدَّةِ قَالَت فَقَالَ لِي قُومِي فَتَنَحَّي لِي عَن اَهلِ بَيتِي قَالَت فَقُمتُ فَتَنَحَّيتُ فِي البَيتِ قَرِيبًا فَدَخَلَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَمَعَهُمَا الحَسَنُ وَ الحُسَينُ وَ هُمَا صَبِيَانِ صَغِيرَانِ فَاَخَذَ الصَّبِيَينِ فَوَضَعَهُمَا فِي حِجرِهِ فَقَبَّلَهُمَا

অর্থ : হযরত আবু মা'দাল আতিয়্যাহ তাফাভী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন- তাকে হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদা যখন হুযুর নবী করিম (দ.) আমার ঘরে উপবিষ্ট ছিলেন তখন খাদেম আরয করল- দরজায় হযরত আলী (রা.) ও ফাতেমা (রা.) এসেছেন। উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন- তিনি (দ.) বললেন- তোমরা সরে যাও এবং আমাকে আমার আহলে বায়তের সাথে সাক্ষাত করতে দাও। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন- আমি পাশের ঘরে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অতঃপর আলী (রা.), ফাতেমা (রা.) ও হাসনাইন করীমাইন (রা.) প্রবেশ করলেন। সেসময়ে এরা অল্পবয়সী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (দ.) ছেলেদ্বয়কে কোলের ওপর বসালেন এবং তাদেরকে চুমু দিতে লাগলেন।

সূত্র : মুসনাদে আহমদ- ২৬৫৮২; মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৯:১২২

মাওলানা মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন
শিক্ষক, হালেদ জহুর সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়
জামালখান লেইন, চট্টগ্রাম।

## তাজেদারে কারবালা

# হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদাত

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রেজভী*

"মুশকিলে হল কর শাহে মুশকিল কোশা কী ওয়াস্তে,
কর বালায়ে রদ শহীদে কারবালা কী ওয়াস্তে।"

পৃথিবীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম ইমাম হোসাইন। আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে অনন্য অসাধারণ দৃষ্টান্ত ইমাম হোসাইন। যুগে যুগে দ্বীনের ঝান্ডা সমুন্নত রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে বাতিল অপশক্তির ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে ঈমানী চেতনার উৎস ইমাম হোসাইন। মানব জীবনের সর্বস্তরে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি পবিত্র সত্তার নাম ইমাম হোসাইন।

**ধরাধামে শুভাগমন :**

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.)'র প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র মওলা আলী শেরে খোদা (রা.)'র আদরের দুলাল, মা ফাতেমাতুজ্জোহরা (রা.)'র নয়নমনি কলিজার টুকরা, বেহেস্তের যুবকদের সর্দার হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ৪ হিজরীর ৫ শাবান মঙ্গলবার মদীনা মুনাওয়ারা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রা.)'র স্ত্রী হযরত উম্মুল ফযল বিনতে হারেছ (রা.) তাঁকে দুগ্ধ পান করান। হুযুর পুরনূর (দ.) কোন মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য স্বীয় মুখে চিবিয়ে নরম করে এ নূরানী শিশু সন্তানের মুখে তুলে দেন। হুযুর (দ.) এ নবজাতকের ডানকানে আযান এবং বামকানে তাকবীর দিলেন। তাঁর মুখে নবীজির লালা মুবারক প্রবেশ করালেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। সপ্তম দিনে নাম রাখলেন "হোসাইন" এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি বকরী দ্বারা আকীকা করলেন। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রা.)কে বলেছিলেন, 'হোসাইনের মাথা মুড়িয়ে দাও এবং তার চুলের সমপরিমাণ ওযনের রৌপ্য সদকা করে দাও।[১]

**নাম মুবারক ও উপনাম :**

নাম- হোসাইন, উপনাম- আবু আবদুল্লাহ, উপাধি- সৈয়্যদুশ শোহাদা, সিবতে রাসূল (রাসূলের দৌহিত্র)।

**নামকরণে জিবরাঈল (আ.)'র শুভাগমন :**

প্রিয়নবী (দ.)'র নিকট যখন এ নবজাতকের জন্মের শুভ সংবাদ পৌছল। তিনি শাহজাদী সৈয়্যদা ফাতেমাতুজ জোহরা খাতুনে জান্নাত এর ঘরে তাশরীফ নিলেন। হযরত আলী (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন- কি নাম রেখেছো? তিনি আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যাপারে আমার কি সুযোগ যে, আমি হুযুরের অগ্রগামী হব?

হুযুর আকদাস (দ.) এরশাদ করেন- হে আলী! তাঁর নামকরণের ব্যাপারে আমি ওহীর অপেক্ষায় আছি। ইতিমধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.) হুযুরের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন- 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত হারূন (আ.) এর তিন পুত্রের নাম ইবরানী ভাষায় যথাক্রমে শিব্বির, শাব্বির ও মুশাব্বির ছিল। যার আরবী অনুবাদ- হাসান, হোসাইন ও মুহসিন।

বড় শাহজাদার নাম যেহেতু হাসান, সুতরাং এঁর নাম হোসাইন রাখুন। অতঃপর হুযুর (দ.) তাঁর নাম হোসাইন রাখলেন।[২]

হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.) এর নামকরণ প্রসঙ্গে একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে। এরশাদ হয়েছে-

عن علیؓ قال لما ولد حسن سماه حمزة فلما ولد حسین سماه باسم عمه جعفرا قال فدعانی رسول الله ﷺ و قال انی امرت ان اغیر اسم هذین فقلت الله و رسوله اعلم فسماهما حسنا و حسینا ۔ رواه احمد و ابو یعلی و الحاکم و قال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد

অর্থ : হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, যখন হাসান জন্মগ্রহণ করেন তিনি তাঁর নাম রাখলেন- হামযা এবং যখন হযরত হোসাইন জন্মগ্রহণ করেন তাঁর নাম স্বীয় চাচার নামানুসারে জাফর রাখলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, হুযুর (দ.) আমাকে ডেকে বললেন- এ দু'জনের নাম পরিবর্তন করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। (হযরত আলী বলেন) আমি বললাম- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। অতঃপর হুযুর করীম (দ.) এদের নাম রাখেন- হাসান ও হোসাইন। এ হাদীসটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আবু ইয়ালা ও হাকেম বর্ণনা করেন এবং ইমাম হাকেম বলেন- 'এ হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।'[৩]

**তাঁর আঙ্গিক ও গঠনগত সৌন্দর্য :**

তিনি বক্ষ হতে পা মুবারক পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় হুযুর করিম (দ.) এর সাদৃশ্য ছিলেন। তাঁর আঙ্গিক ও অবয়ব ছিল নূরে এলাহী ও জামালে মুস্তফা (দ.)'র আধার। তাঁর নূরানী চেহারা মুবারকের উজ্জ্বলতার তুলনায় চন্দ্র-সূর্যের উজ্জ্বলতা ছিল নেহায়েতই নগণ্য। অন্ধকার রজনীতে চেহারা মুবারক থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতো।[৪]

**শিক্ষা-দীক্ষা :**

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) দরবারে রেসালতের নূরানী পাঠশালার অনন্য অসাধারণ প্রতিভাধর শিক্ষার্থী ছিলেন। নবীজি (দ.)'র সার্বিক তত্ত্বাবধানে জ্ঞান প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তি ও পূর্ণতা অর্জন করেন। নবীজি তাঁকে সর্বাধিক আদর স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনম্র, খোদাভীরু, দয়া ও করুণা প্রদর্শনে প্রিয় রাসূলের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। দুরন্ত দুর্বার প্রচন্ড সাহসী, অকুতোভয়, তেজস্বী ও অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন নির্ভিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। স্বয়ং রাসূলে খোদা (দ.)ও জানতেন যে, এমন এক যুগ আসবে যে, এই প্রিয় দৌহিত্রই আমার উম্মতকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করবে। আমার প্রচারিত দ্বীনের ঝান্ডা সমুন্নত করবে। নিজের পরিবার-পরিজনসহ জীবনের বিনিময়ে ইসলামের মর্যাদা ও আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখবে। সকল প্রকার অশুভ বাতিল অপশক্তির মুকাবিলায় মুনাফিক চক্রকে পদদলিত করে ভয়াবহ দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ঈমান ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী ও দ্বীনের কান্ডারী হিসেবে ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করবে।

**উত্তম চরিত্র :**

তাজেদারে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ছিলেন উত্তম চরিত্রের এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, হৃদ্যতা তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণ। অসহায়, অনাথ, দুর্বল, নিঃস্ব, গরীব, ফকীর ও মিসকিনদের প্রতি তিনি ছিলেন উদার সহনশীল, দানশীল ও আশ্রয়দাতা। নম্র স্বভাব ও উত্তম সহজ সরল আদর্শ চরিত্র ছিল তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবনের অসংখ্য ঘটনাবলী এর উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে।

**এক্ষেত্রে একটি ঘটনার উল্লেখ প্রযোজ্য :**

একদিন তিনি কতিপয় মেহমানের সাথে খাবার গ্রহণ করছিলেন। ক্রীতদাস প্রচন্ড গরম ঝোলের পাত্র দস্তরখানায় পরিবেশনের সময় ভীত কম্পিত হয়ে ঝোলের পাত্র হাত থেকে নীচে পড়ে গেল। ঝোল ছিটকে তাঁর চেহারা মুবারকে গিয়ে পড়ল।





তিনি পরবেশনকারীর দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্রই লোকটি নিতান্ত আদব ও বিনয়ের সাথে আরজ করল- و الکاظمین الغیظ (রাগ সংবরণকারী)। তিনি বললেন- کظمت غیظی (আমি রাগ সংবরণ করলাম)। ক্রীতদাস লোকটি আবার বলল- و العافین عن الناس (মানুষকে ক্ষমাকারী)। তিনি জবাব দিলেন- قد عفوت عنك (আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম)। লোকটি পুনরায় বলল- و الله یحب المحسنین (কল্যাণকামীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন)। তিনি উত্তর দিলেন- انت حر لوجه الله (আমি তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আযাদ করে দিলাম)।

**হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র মর্যাদার বর্ণনা :**

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র মর্যাদার বর্ণনায় অসংখ্য হাদীস শরীফ বর্ণিত আছে। সম্মানিত পাঠক সমাজ। প্রথমে সেসব হাদীস উল্লেখ করা হল যেগুলো শুধুমাত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র সুমহান মর্যাদা ও প্রশংসায় বর্ণিত হয়েছে। পরে উভয় শাহজাদা হাসনাইনে করীমাইন (রা.)'র ফযীলতের বর্ণনা সম্বলিত হাদীসসমূহ হতে পেশ করা হবে।

১. তিরমিযী শরীফের হাদীস হযরত ইয়ালা বিন মুররাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর নবী করীম (দ.) ইরশাদ করেন- حسین منی و انا من حسین

অর্থ : হোসাইন আমার থেকে আমি হোসাইন থেকে।

অর্থাৎ, হোসাইন (রা.)'র সাথে হুযুরের এবং হুযুরের সাথে হোসাইনের নিবিড় ঘনিষ্টতা যেন উভয়ে অভিন্ন সত্ত্বা।

হোসাইনের স্মরণ করা হুযুর (দ.)কে স্মরণ করা, হোসাইনকে ভালবাসা হুযুরকে ভালবাসা, হোসাইনের প্রতি বিদ্বেষ রাখা হুযুরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, হোসাইনের সাথে যুদ্ধ করা মানে হুযুরের সাথে যুদ্ধ করার শামিল। (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

সরকারে দো'আলম (দ.) এরশাদ করেন- احب الله من احب حسینا

অর্থ : যে হোসাইনকে ভালবাসে সে আল্লাহকে ভালবাসল।[৫]

২. হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর পুরনূর (দ.) এরশাদ করেন- বেহেস্তের যুবকদের সর্দারকে যে দেখতে চায় সে যেন হোসাইন বিন আলীকে দেখে।[৬]

৩. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরম (দ.) এরশাদ করেন-

اللهم انی احبه فاحبه و احب من یحبه

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তাকে (হোসাইনকে) ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস এবং যে তাঁকে ভালবাসে তুমি তাকেও ভালবাস।[৭]

৪. হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বায়তুল্লাহ শরীফের ছায়াতলে দন্ডায়মান ছিলেন। তিনি হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)কে এদিকে তাশরীফ আনতে দেখে বলে উঠলেন-

هذا احب اهل الارض الی اهل السماء الیوم

আজকে আসমানবাসীদের নিকট যমীনবাসীদের থেকে ইনিই সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি।[৮]

৫. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলে করীম (দ.)কে দেখেছি তিনি হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র মুখের লালা মুবারককে এভাবে চুষতেন যেভাবে মানুষ খেজুর চোষে। এরশাদ হয়েছে-

یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرة

৬. হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) পদব্রজে ২৫ বার হজব্রত পালন করেছেন। তিনি বড় পর্যাদামন্ডিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নামায, রোজা, হজ্ব, সদকা, জনকল্যাণ ও সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডে তিনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন।[১০]

৭. হযরত আল্লামা জামী (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন সরকারে দো'আলম (দ.) হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)কে নিজের ডানদিকে এবং সাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম (রা.)কে নিজের বামদিকে বসালেন। এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হলেন। আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা এ দু'জনকে একত্রে আপনার নিকট রাখবেন না। দু'জনের একজনকে ওফাত দান করবেন। দু'জনের যে কোন একজনকে আপনি নির্বাচন করুন। হুযুর (দ.) এরশাদ করেন, যদি হোসাইনের ওফাত হয় তবে তাঁর বিরহে ফাতেমা ও আলী ভীষণ কষ্ট পাবে, আমিও কষ্ট পাব। আর যদি ইবরাহীমের ওফাত হয় তবে আমি অধিক কষ্ট পাব। আমার কষ্ট আমি সহ্য করতে পারব। এ ঘটনার তিনদিন পর হযরত ইবরাহীম (রা.) ওফাতবরণ করেন। যখনই হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) প্রিয়নবী (দ.)'র খেদমতে আসতেন হুযুর (দ.) মারহাবা বলতেন, কপালে চুম্বন করতেন এবং উপস্থিত লোকজনকে বলতেন, আমি হোসাইনের ওপর আমার পুত্র ইবরাহীমকে কুরবান করেছি।[১১]

**হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ও হযরত ইমাম হাসান (রা.) এর ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসসমূহ :**

**১. জান্নাতে শাহেবজাদাদ্বয়ের স্থান :**

عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله ﷺ الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة ۔ رواه الترمذی و ابن ماجه عن ابن عمر

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর নবী করিম (দ.) এরশাদ করেন- হাসান এবং হোসাইন বেহেস্তবাসী যুবকদের সর্দার। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন। ইবনে মাযাহ হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।[১২]

**২. বেহেস্তী দু'টি ফুল :**

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (দ.) এরশাদ করেন-

ان الحسن و الحسین هما ریحانتی من الدنیا

অর্থ : নিঃসন্দেহে হাসান ও হোসাইন (রা.) দুনিয়াতে আমার বেহেস্তী দু'টি ফুল।[১৩]

**৩. দরবারে রেসালতে শাহেবজাদাদ্বয়ের মর্যাদা :**

عن البراء قال ان النبی ﷺ ابصر حسنا و حسینا فقال اللهم انی احبهما فاحبهما

অর্থ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর নবী করীম (দ.) হযরত হাসান ও হোসাইনের দিকে লক্ষ্য করে বললেন- হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে ভালবাসি, তুমিও তাদেরকে ভালবাস।

এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন এবং বলেন- হাদীসটি হাসান ও সহীহ।[১৪]

**৪. হাসনাইনে করীমাইনের প্রতি বিদ্বেষের পরিণতি :**

عن ابی هریرة قال خرج علینا رسول الله ﷺ مرة و معه حسن و حسین هذا علی عاتقه و هذا علی عاتقه و یلثم هذا مرة حتی انتهی الینا فقال له رجل یا رسول الله انك تحبهما فقال من احبهما فقد احبنی و من ابغضهما فقد ابغضنی ۔ رواه احمد و الحاکم

অর্থ : হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- হুযুর করীম (দ.) আমাদের মাঝে বের হলেন। তাঁর সাথে এক কাঁধে ইমাম হাসান এবং অন্য কাঁধে ইমাম হোসাইন। তিনি উভয়কে পর্যায়ক্রমে





চুমু দিচ্ছিলেন। এভাবে আমাদের নিকট এসে থামলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তাদেরকে মুহাব্বত করেন? হুযুর করীম (দ.) এরশাদ করেন- 'যে ব্যক্তি হাসান ও হোসাইন উভয়কে মুহাব্বত করল, সে আমাকেই মুহাব্বত করল। যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল সে আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করল'। এ হাদীসটি ইমাম আহমদ ও ইমাম হাকেম বর্ণনা করেছেন।[১৫]

৫. হাসনাইন করীমাইনের প্রতি মুহাব্বতের পরিণাম জান্নাত; শত্রুতার পরিণাম জাহান্নাম :

عن سلمان قال سمعت رسول الله ﷺ یقول الحسن و الحسین ابنای من احبهما احبنی و من احبنی احبه الله و من احب الله ادخله الجنة ومن ابغضهما ابغضنی و من ابغضنی ابغضه الله و من ابغضه الله ادخله النار

অর্থ : হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নবী করিম (দ.) কে বলতে শুনেছি, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন আমার পুত্র। যে ব্যক্তি হাসান ও হোসাইন (রা.)কে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল। যে আমাকে ভালবাসল আল্লাহ তাকে ভালবাসবেন। আল্লাহ যাকে ভালবাসবেন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যে ব্যক্তি হাসান ও হোসাইন (রা.)'র প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল তার ওপর আল্লাহর গযব বর্ষিত হবে। যার ওপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। ইমাম হাকেম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- হাদীসটি সহীহ।[১৬]

**ইমাম হোসাইনের (রা.) শাহাদাতের ভবিষ্যত বাণী :**

ইমাম বায়হাকী 'দালায়েলুন নবুওয়াত' গ্রন্থে হযরত উম্মুল ফযল বিনতে হারিছ (হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব এর স্ত্রী) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলে করীম (দ.)'র নিকট বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আজ রাতে একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম। হুযুর জিজ্ঞেস করলেন- কি স্বপ্ন? আরয করলেন- স্বপ্ন অত্যন্ত ভয়ংকর। হুযুর পুরনূর (দ.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন- তা কি স্বপ্ন? তিনি বললেন- আমি দেখেছি আপনার শরীর মুবারকের এক টুকরো মাংস কর্তিত হয়ে আমার কোলে এসে পড়ল। হুযুর (দ.) এরশাদ করেন- আপনি তো ভাল স্বপ্ন দেখেছেন। এর ব্যাখ্যায় হুযুর (দ.) শুভসংবাদ দিলেন যে, ফাতেমার পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হবে এবং তা প্রথমে আপনার কোলে যাবে। অতএব, যখন ফাতেমার গর্ভ হতে হযরত ইমাম হোসাইনের জন্ম হলো তা আমার কোলে দেয়া হলো। রাসূলে করীম (দ.) এর ফরমান বাস্তবায়িত হল। এরপর আমি একদিন রাসূলে করীম (দ.)'র দরবারে উপস্থিত হলাম। ইমাম হোসাইনকে আমার কোল থেকে হুযুর আকদাস (দ.)এর কোলে দিলাম। হঠাৎ দেখলাম হুযুর করীম (দ.) এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক। আপনার কি হল? এরশাদ করলেন- আমাকে জিবরাঈল (আ.) সবেমাত্র সংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মত এই সন্তানকে শহীদ করবে। আরয করলাম, এই সন্তনকে? বললেন- হ্যাঁ এবং জিবরাঈল আমীন শাহাদাতের স্থানের লাল মাটি এনে আমাকে দেখালেন।[১৭]

**ইমামের শাহাদাত ও আমাদের শিক্ষা :**

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ও আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর শাহাদাতের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে সত্য ও মিথ্যার মানদন্ড নিরূপণ হলো। চিরকাল সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও প্রিয়নবী মুস্তাফা (দ.)'র পবিত্র দ্বীনের হেফাজত ও সংরক্ষণে ইমাম হোসাইনের (রা.) ভূমিকা ও আত্মত্যাগের ইতিহাস অক্ষয় হয়ে থাকবে। পক্ষান্তরে, অভিশপ্ত কলঙ্কিত অন্যায় যুলুম নির্যাতনের মহানায়ক হিসাবে কুখ্যাত ইয়াযিদ চিরদিন মুসলিম সমাজে ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকবে। মহাপ্রলয় অবধি ইমাম হোসাইন (রা.)'র চর্চা জারি থাকবে। হোসাইনী আদর্শের পতাকা কিয়ামত পর্যন্ত সমুন্নত থাকবে। ইয়াযিদ ও ইয়াযিদিয়াতের প্রতি মুসলিম মিল্লাতের ক্ষোভ, ঘৃণা ও নিন্দাবাদ অব্যাহত থাকবে। ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে কারবালার

প্রান্তরে আজো আলী আকবর ও আলী আসগর (রা.)'র রক্তমাখা মরুপ্রান্তর আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে- 'ওহে হোসাইনের প্রেমিকরা! কথা ও কাজের সমন্বয়ে হোসাইনী আদর্শকে আবারো জীবন্ত কর। যুগের ইয়াযিদী শক্তিকে চিহ্নিত করো, ইয়াযিদীরা আজো সুন্নী মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করার অপচেষ্টায় সক্রিয়। সুন্নীয়তের বৃহত্তর ঐক্যের বাধা হিসেবে ইয়াযিদী তাগুতী অপশক্তিরা সকল প্রকার ষড়যন্ত্রে সদা সক্রিয়। অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা ইয়াযিদী চরিত্র। ঐক্য, শান্তি, সংহতি ও শৃঙ্খলা হোসাইনী আদর্শের অপর নাম। হোসাইনী আদর্শ দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মাহর সম্মান মর্যাদা ও ঐতিহ্যের প্রতীক। ইয়াযিদিয়াত অজ্ঞতা, মূর্খতা, বর্বরতা ও অন্ধকারের প্রতীক।'

আসুন, আমরা সম্মিলিতভাবে ইয়াযিদী অপশক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলি। আসুন, আমাদের অন্তরাত্মাকে হোসাইনের প্রেমে সিক্ত করি। আমাদের প্রিয় মাতৃভুমি সোনার বাংলাদেশকে ইয়াযিদী চক্রের অশুভ চক্রান্ত থেকে মুক্ত করি। শত সহস্র অলী-আউলিয়ার পূণ্যভুমি এ দেশের পবিত্র মাটি ও মানুষকে আহলে বায়তে রাসূলের মুহাব্বতের কেন্দ্রে পরিণত করি। সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ, অত্যাচার-পাপাচার ও যুলুম নির্যাতনকে বিতাড়িত করে হোসাইনী আদর্শে প্রজ্জ্বলিত আলোকবর্তিকায় অন্তরাত্মা আলোকিত করি। যেভাবে হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ইয়াযিদের অপকর্মের কারণে ইসলাম ভূলুণ্ঠিত হতে যাচ্ছিল আজো ইয়াযিদের উত্তরসূরী ইসলাম বিকৃতকারী বাতিল অপশক্তিসমূহের অপতৎপরতায় ইসলামের অগ্রযাত্রা সর্বগ্রাসী হুমকি ও ষড়যন্ত্রের শিকার। যাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন মু'মিনের ঈমানের পরিচায়ক, তাদের প্রতি ধৃষ্টতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা আজো অব্যাহত রয়েছে। তাই সুদৃঢ় ঈমান ও নবীপ্রেম বুকে ধারণ করে আক্বিদাভিত্তিক ঐক্যের ভিত্তিতে নবী মুস্তফা (দ.)'র নূরানী বংশধরগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়াই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

পরিশেষে, আহলে বায়তে রাসূল (দ.)'র শানে ইসলামী জগতের মহান ইমাম, হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত কাব্যের দু'টি পংক্তি উল্লেখ করা হল।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন- يا اهل بيت رسول الله حبكم+ فرض من الله فى القران انزله

كفاكم من عظيم القدر انكم + من لم يصل عليكم لا صلوة له

অর্থ : হে রাসূলুল্লাহ (দ.)'র বংশধরগণ! আপনাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করাকে ফরয স্বরূপ ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল করীমের আয়াত নাযিল করেছেন। আপনাদের সুমহান মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তি আপনাদের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে না তার নামাযই হবে না।'

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার মাহবুব বান্দাগণের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আহলে বায়তে রাসূল (দ.)'র প্রতি অকৃত্রিম মুহাব্বত প্রদর্শন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র :


১. তাশরীফুল বশর, পৃ. ২৮
২. মাসালিকুস সালেকীন, ১:১৯৫ ও খযীনাতুল আসফিয়া ১:৩৮
৩. গায়াতুল ইযাব ফী মানাক্বিবিস সাহাবা ওয়াল ক্বারাবাহ, কৃত. আল্লামা ড. ত্বাহেরুল ক্বাদেরী, পৃ. ১৮১
৪. মাসালিকুস সালেকীন, ১:১৯৫
৫. মিশকাত শরীফ পৃ. ৫৭১
৬. নুরুল আবছার পৃ. ১১৪
৭. প্রাগুক্ত পৃ. ১১৪
৮. আশ-শরফুল মুয়াব্বদ পৃ. ৬৫







৯. নুরুল আবছার, পৃ. ১১৪
১০. বরকাতে আলে রাসূল, পৃ. ১৪৫ ও খুতবাতে মুহাররম, কৃত. মুফতি জালালুদ্দিন আহমদ আমজাদী, পৃ. ৩৩২
১১. শাওয়াহেদুন নবুওয়াত পৃ. ৩০৫
১২. মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৭০ সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৭৬৮
১৩. মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৭০
১৪. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৭৮২
১৫. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং- ৯৬৭১
১৬. আল মুসতাদরাক লিল, হাকেম হাদীস নং- ৪৭৭৬
১৭. তাযকিরায়ে মাশায়েখে কাদেরিয়া রিজভিয়া, কৃত. মাওলানা আবদুল মুহতাবা রিজভী, মুবারকপুর, ইউ. পি, পৃ. ১০৬, ১০৭



মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী)

মধ্য হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।

## কারবালা ঃ ইসলামের ইতিহাসের কালো অধ্যায়-

# জয়ী হয়েছিলেন হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) আর মৃত্যু ঘটেছিল ইয়াযিদের!

হাসান আকবর*

হিজরী একষট্টি সাল। নানা ঝড়-ঝাপ্টার মাঝ দিয়ে পার হচ্ছে সময়। রাসূলে করীম (দ.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের তিরোধানের পর ইসলাম নিয়ে চলছে ঘরে বাইরে চক্রান্ত। ষড়যন্ত্র। মানবতা, শুদ্ধতা, নৈতিকতা এবং শান্তির যেই অমেয় ধারা নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল তা থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা শুরু হয় মরুর প্রান্তরে। ইসলামের জয়যাত্রা রুদ্ধ করে দিতে মরিয়া ইয়াযিদ চক্র। ইসলামকে বিকৃত করে নিজেদের মতো করে চালানোর জন্য ইয়াযিদের তান্ডব মানবতাকে ভুলন্ঠিত করছিল সর্বত্র। শুদ্ধতা এবং পবিত্রতা থেকে ক্রমে বহুদূরে চলে যাচ্ছিল ইয়াযিদ। যা বড় বেশি বাজছিল রাসূলে করীম (দ.) এর অতি আদরের নাতি হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র অন্তরে। নিরবে রক্তক্ষরণ চলছিল তাঁর হৃদয়ে। ইসলামকে রক্ষার জন্য অন্তর তাঁর সারাক্ষণই কাঁদছিল। কিন্তু প্রশাসনসহ সর্বময় ক্ষমতার মালিক বনে ইয়াযিদ নিজেকে যেখানে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে তাকে কেবল ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছিলেন না ইসলামের ঝান্ডাধারীরা। এমনতর অবস্থায় হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কারবালার প্রান্তরে উপস্থিত হন। নবী পরিবারের শিশু ও মহিলাসহ জান্নাতি মানুষের একটি দল নিয়ে তিনি এসেছিলেন। আসলে ইয়াযিদই কৌশলে হযরত ইমাম হোসাইনকে কারবালার প্রান্তরে নিয়ে এসেছিল।

একষট্টি হিজরীর দশই মুহাররম। কারবালার প্রান্তরে পরিবার পরিজন নিয়ে অবরুদ্ধ হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)। ইয়াযিদবাহিনী একে একে শহীদ করল নবী পরিবারের সদস্যদের। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র সামনেই নির্মমভাবে শহীদ করা হয় তাঁর অতি আদরের পুত্র হযরত আলী আকবর এবং হযরত আলী আসগরকে। বৃহস্পতিবার রাতে জন্ম নিয়েছিল একটি ফুটফুটে শিশু। শুক্রবার দুপুরের আগেই সেই শিশুটির জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয় ইয়াযিদ বাহিনী। এই বাচ্চাটির জন্য ফোরাত নদীতে পানি আনতে গিয়েছিলেন হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)। আর সেই সময় পানি মুখে দেয়ার আগেই কচি শিশুটির কপালে এসে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। মর্মান্তিক। এই একটি শব্দে কি ইয়াযিদের নারকীয়তা বুঝানো সম্ভব? সম্ভব নয়। চোখের সামনে একে একে শহীদ করা হয় দুধের শিশু। কলজের টুকরো সন্তান। অতি আদরের সব প্রিয়জন। আত্মীয় স্বজন।

ইয়াযিদের তান্ডব চলছিল। নিরস্ত্র একদল মানুষ একে একে বুকের রক্তে ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন কারবালার প্রান্তর। ইসলামকে অবিকৃত অবস্থায় অটুট রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে আপোষহীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নবী পরিবারের সদস্যগণকে সাথে নিয়ে কারবালার প্রান্তরে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)। ছোট বড় নারী পুরুষ মিলে বাহাত্তর জন মানুষ ইয়াযিদ বাহিনীর সুসজ্জিত বাইশ হাজার সদস্যের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। ইয়াযিদ বাহিনী একে একে শহীদ করছিলেন নবী পরিবারের জান্নাতি সদস্যদের। কারবালার যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা হয় এই ঘটনাকে; কিন্তু বাইশ হাজার সুসজ্জিত সৈনিকের সামনে শিশু ও মহিলাসহ নিরস্ত্র বাহত্তর জন মানুষের বুক পেতে দেয়াকে কোন সমরনীতির আলোকে যুদ্ধ বলা যায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রাখার অবকাশ রয়েছে। দাওয়াত দিয়ে মেহমানদারীর পরিবর্তে মাথা কেটে নেয়াকে আর যাই বলা হোক না কেন যুদ্ধ বলা যায় না। কোন মানুষের পক্ষে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়। অথচ মানুষ নামের নরপশু ইয়াযিদ সেই ঘৃন্য কাজটি করেছিল

অবলীলায়। পাষন্ড ইয়াযিদ এবং তার বাহিনী তপ্ত মরুতে তৃষ্ণায় ছটফট করছি যেই শিশু তার মুখে পানি দেয়ার পরিবর্তে বুকে তীর ছুড়ে শহীদ করেছিল। কাপুরুষ ইয়াযিদ নিরস্ত্র মানুষগুলোকে হত্যা করে বিজয়ীর আনন্দ উপভোগ করছিল। অথচ নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) শুধুমাত্র আপোষকামী বা কাপুরুষ হিসেবে যেন ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত না হন সেজন্য বুকের রক্তে কারবালার মরুকে রঞ্জিত করতে পিছ পা হন নি। তিনি বীরোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন রাখার চেষ্টাই করেছিলেন। তাঁর সেদিনের আত্মদান এবং সময়োচিত সিদ্ধান্তের ফলে ইসলাম আজো আসল রূপ নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ইসলাম। মুলতঃ তিনিই সেইদিন ইসলামকে রক্ষা করেছিলেন।

পাক ভারত উপমহাদেশের মানুষ নবী করিম (দ.)কে দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন নি। সাহাবায়ে কেরামগণকেও দেখেন নি এতদঞ্চলের মানুষ। পাক ভারত উপমহাদেশের মানুষকে ইসলাম উপহার দিয়েছিলেন মহান আধ্যাত্মিক সাধক, প্রখ্যাত অলিয়ে কামেল, হিন্দাল ওয়ালী হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র.) বা 'খাজা বাবা'। সেই মহান সাধক কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'কারবালার এই মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনাকে পর্যালোচনা করলে অকপটে বলতে হবে যে, ইমাম হোসাইন (রা.) নিজেই ইসলাম। ইমাম হোসাইন (রা.) নিজেই দ্বীনের রক্ষাকবচ।

ইসলামের ইতিহাসে রাসূলে করীম (দ.) এর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কে ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (দ.) এর তিরোধানের পর তিনি বহুমুখী সময়োচিত পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলামকে বিলুপ্তি এবং বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি ইসলামকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে জেহাদ ঘোষণা দিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যেই জেহাদ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন পরবর্তীতে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) জেহাদের কথা শুধু মুখে বলেই ক্ষান্ত হননি বরং নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে জীবন উৎসর্গ করে তার বাস্তবায়ন করেছিলেন। হিজরী একষট্টি সালের দশই মুহাররমের সেই আত্মত্যাগের জন্য হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর নিকট ইসলামের সকল অনুসারী ঋনী হয়ে থাকবে।

কারবালার মর্মান্তিক সেই ঘটনা হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোন অঘটন নয়। এটি ইসলামের অগ্রযাত্রার জন্য অতি প্রয়োজনীয় এক সোপান। যা ইসলামকে এগিয়ে যেতে অনেকাংশে সহায়তা করেছে। এই বিষয়টি পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন বলেই আল্লাহর নবী রাসূলে করীম (দ.) মহান আল্লাহর নিকট ইমাম হোসাইন (রা.)কে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করা থেকে রেহাই দেয়ার জন্য কোন প্রার্থনা করেন নি। বরং দশই মুহাররম দিবসের এই শাহাদাত দিবসে ইমাম হোসাইন (রা.) যেন ধৈর্য্য ধারণ করতে সক্ষম হন, মহান আল্লাহর নিকট সেই প্রার্থনা করেছিলেন।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর এই উৎসর্গ শুধু ব্যক্তিগত উৎসর্গই নয়, বরং এটা আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকেও উৎসর্গ ছিল। তিনি এই উৎসর্গের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এই সন্তুষ্টি রাব্বুল আলামিনকে সন্তুষ্ট করার জন্য। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)ও ইতিহাসের পাতায় একটি সম্মানজনক স্থান লাভে সক্ষম হয়েছেন, পাশাপাশি আল্লাহর নবীও নিজের প্রিয়তম নাতিকে শাহাদাতের মর্যাদা দানে ধন্য হয়ে মহান আল্লাহর নিকট ত্যাগের পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

মুসলিম বিশ্বের অন্যতম মরমী লেখক, পাকিস্তানের জাতীয় কবি মরহুম আল্লামা ইকবাল একষট্টি হিজরী সালের কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার চুলছেড়া বিশ্লেষণ করে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশ্ববাসীর জন্য স্মরণীয় উক্তিতে পরিণত হয়ে আছে। তিনি বলেন, "ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কি





বাদ"। অর্থাৎ প্রতিটি কারবালার পরই ইসলাম পুনর্জীবন লাভ করে।

একষট্টি হিজরীর কারবালাও ইসলামের পুনর্জাগরণে সেই অনন্য ভূমিকা পালন করছে। প্রতিটি হিজরী সালের শুরুতে মুহাররম মাসের বাঁকা চাঁদ আকাশে উঁকি দিতেই বিশ্ব মুসলিমের অন্তরে কারবালার স্মৃতি ভেসে উঠে। বিশ্ব বিবেক আবেগ আপ্লুত হয়ে উঠে। কোটি কোটি মানুষ চোখের জলে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)সহ কারবালার জান্নাতী শহীদানদের স্মরণ করেন। কারবালার বিয়োগান্ত সেই মর্মান্তিক ঘটনার সাথে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র নামের পাশাপাশি ইয়াযিদের নামটিও মানুষের মনে পড়ে। তবে নাম দুইটি পাশাপাশি আসলেও উভয় নামের মূল্যায়ন অভিন্ন নয়। বরং বিপরীতমুখী মূল্যায়ন। প্রথম নামটি উচ্চারিত হয় শ্রদ্ধার সাথে। সম্মানের সাথে। নম্রতার সাথে। আর অপরটি ঘৃণার সাথে। প্রথমটির প্রতি শ্রদ্ধা কেবলমাত্র নবীজির নাতি বলে নয়, ভিন্ন ধরনের আদর্শিক একটি চরিত্রের কারণে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা উপসে উঠে। কারবালার প্রান্তরে অতি অসহায় অবস্থায়ও যেই চরিত্র তিনি ধারণ করেছিলেন হাজার বছর পরেও সেই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। অপরদিকে, ইয়াযিদের প্রতি ঘৃণা শুধুমাত্র নবীর দৌহিত্র এবং গোটা নবী পরিবারের সাথে দুর্ব্যবহার, যুলুম এবং অত্যাচারের কারণেই নয়; একই সাথে ব্যক্তি জীবনে ইসলামের আদর্শ বিরোধী এবং ইসলামী ভাবাদর্শকে বিকৃত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকার কারণে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে দুইটি নাম চরিত্রেই রূপায়িত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে ইয়াযিদ নামটি ঘৃন্য নামে পরিণত হয়েছে। একষট্টি হিজরীর পর প্রায় চৌদ্দশত বছর গত হতে চলেছে। এই দীর্ঘ জীবনে ইসলাম ধর্মাবলম্বী কোন পরিবারে কোন সন্তানের নাম ইয়াযিদ রাখা হয়েছে বলে শুনা যায় নি। ভবিষ্যতেও কোনদিন ইয়াযিদের নামে কেউ সন্তানের নামকরণ করবেন বলে মনে হয় না। আর এখানেই ইয়াযিদের মূল পরাজয়।

আল্লামা ইকবালের মূল্যায়নে উঠে এসেছে এভাবে যে- "কৃতলে হোসাইন আসল মে মরগে ইয়াযিদ" অর্থাৎ মুলতঃ ইমাম হোসাইন শহীদ হওয়াটাই ইয়াযিদের মৃত্যু। ইয়াযিদ নিপাত যাওয়ার জন্য কোন শ্লোগানের প্রয়োজন নেই কিংবা ইয়াযিদের বিরুদ্ধে কোন বিষেদাগারের প্রয়োজন পড়ে না। বাহাত্তর জন নিরস্ত্র মানুষকে নির্মমভাবে খুন করে ইয়াযিদ সেইদিন জয়ের স্বাদ নিলেও কার্যত সেই কারবালার মরুতেই ইয়াযিদের পতন ঘটেছিল। আর পরিবার পরিজন নিয়ে অকাতরে বুকের তাজা রক্ত দান করে মৃত্যুবরণ করলেও সেইদিন ইমাম হোসাইনই জয়ী হয়েছিলেন। আর যার ফলশ্রুতিতে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য অসাধারণ মানুষে পরিণত হন। বিশ্বের দেশে দেশে এই নামে সন্তানের নামকরণ করে বহু মানুষই নিজেকে ধন্য মনে করেন।

কারবালার এই ঘটনার মধ্যে যে শিক্ষা নিহিত রয়েছে সেটা যদি আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই তাহলে আর কোন ইয়াযিদের উত্থান পৃথিবীর কোথাও ঘটবে না। এই সত্যিটি যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি মহান রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সেই সুমতি দান করুন। আমিন।

হাসান আকবর
চিফ রিপোর্টার, দৈনিক আজাদী।

# আহলে বায়তে রাসূল (দ.) ঃ রক্তাক্ত কারবালা

মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ*

ইসলামের ইতিহাসে অনেক শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। প্রত্যেকটি আপন আপন স্থানে গুরুত্ব বহন করে। প্রত্যেক শাহাদাতে ইসলামের স্থায়ীত্ব হুজুর নবী করিম (দ.) এর দ্বীন এবং তাঁর সুন্নাতে মুবারাকার জীবনীশক্তি সঞ্চারের মৌল উদ্দেশ্য। এ কারণে ইসলামের ইতিহাসে প্রত্যেক শাহাদাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। কিন্তু ইমাম হোসাইনের (রা.) শাহাদাত অন্যান্য শাহাদাত হতে অনেক কারণে অতুলনীয়। কেননা, তিনি ছিলেন প্রিয় নবী (দ.) পরিবারের উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি রাসূলুল্লাহ (দ.) এর কোলে লালিত-পালিত হয়েছেন। যাঁর গর্দান ছিল ইমাম হোসাইনের (রা.) বাহন। যাঁর মুখের লালা ছিল তাঁর অমৃত আহার। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ (দ.) যাঁকে আপন পুত্রের শরাফত দানে ধন্য করেছেন। এমন সৌভাগ্যবান পুরুষের পরদেশে নির্যাতিত অবস্থায় তাঁর নানাজানের কলেমা পাঠকারীদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করা অন্যান্য শাহাদাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে এতে কোন সন্দেহ নাই।

**খেলাফতে রাশেদার সময়কাল :**

রাসূলুল্লাহ (দ.) এর পরে কেমন হুকুমত চলবে তার বর্ণনা তিনি পূর্বেই বলে দিয়েছেন-

الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا

অর্থাৎ, আমার পরে খেলাফত থাকবে ত্রিশ বছর। এরপর আসবে বাদশাহী। (মিশকাত- কিতাবুল ফিতন)

রাসূলুল্লাহ (দ.) এর বাণী অনুযায়ী খেলাফতে রাশেদা তাঁর ইন্তেকালের পর ত্রিশ বছর পর্যন্ত থাকবে। তারপর শুরু হবে বাদশাহী আমল। কল্যাণ ও সফলতার যুগের পরিবর্তে যে রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি হবে তা হবে বাদশাহী। রাসূলুল্লাহ (দ.) এর ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী তাঁর পরে হযরত আবু বকর (রা.) আড়াই বছর খেলাফতে ছিলেন, অতঃপর দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) এর খেলাফতকাল ছিল ১০ বছর, এরপর তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান গনী (রা.) এর খেলাফতকাল ছিল ১২ বছর। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) এর খেলাফতকাল ছিল ৫ বছর। অতঃপর ইমাম হাসান (রা.) এর ৬ মাস খেলাফতকালসহ ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটাই খেলাফতে রাশেদা হিসেবে খ্যাত। হযরত আলী (রা.) এর খেলাফতকালে সিরিয়ায় হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) তার স্বাধীন হুকুমতের ঘোষণা দেন। হযরত আলী (রা.) কে তিনি খলীফা স্বীকার করেন নি। সকল মুসলমান এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, হযরত আলী (রা.) সত্যই মুসলমানদের খলীফা ছিলেন। আর হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার এ সিদ্ধান্তকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল ইমাম ইজতেহাদী ভুল বলেছেন।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়াব পৃথক হুকুমতের ঘোষণার পর তাঁর সাথে হযরত আলী (রা.) এর অনেক ছোট-বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার ফলে ইসলামের ইতিহাসে উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফফীনের যুদ্ধে মুসলমান পরস্পরে লড়াই করে। এভাবে একদিন হযরত আলী (রা.) শাহাদাত বরণ করেন।

**নতুন নতুন দলের আত্মপ্রকাশ :**

এ আত্মকলহের যুগে চারটি স্বতন্ত্রদল প্রতিভাত হয়। এদের মধ্যে একদল প্রকাশ্যে হযরত আলী (রা.) এর সাহায্য আর বনূ উমাইয়া ও তাদের সহযোগীদের বিরোধীতার ঘোষণা দেয়। এরা নিজেদের "শীয়ানে আলী" বলে দাবী করে। (শীয়া আরবী শব্দ, এর অর্থ- দল) স্মর্তব্য যে, সে সময়কার শীয়ানে আলী ও বর্তমান শীয়া সম্প্রদায় এক নয়। বরং হযরত আলী (রা.) ও হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার মধ্যে

রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে যারা হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ অবলম্বন করে তারা শীয়ানে আলী নামে অবহিত হয়। আর বর্তমানে শীয়া সম্প্রদায় ফিকহী ও মাযহাবী দৃষ্টিকোণে শীয়া।

দ্বিতীয় আরেক দল আত্মপ্রকাশ করে যারা হযরত আলী ও আমীরে মুয়াবিয়া উভয়ের বিরোধিতা করে, তারা ইতিহাসে খারেজী নামে পরিচিত। এদের নামাজ, রোজার অত্যাধিক পছন্দ ছিল। নফল নামাজ, তাহাজ্জুদ, যিকরে ইলাহী বেশী করত। তাদের শ্লোগান ছিল- ان الحكم الا لله আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানি না। কিন্তু এরা হযরত আলী (রা.) ও আমীরে মুয়াবিয়া উভয়কে কাফির মনে করত এবং তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব মনে করত। (মা'আযাল্লাহ)

**আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিভঙ্গি :**

এ রাজনৈতিক কলহের সময়েও অনেক সংখ্যক নিরপেক্ষ ন্যায়পরায়ণ লোক ছিল। যারা পুরো বিষয়কে সততার সাথে বিচার করে কোন পক্ষপাতের শিকার হয়নি। এরাই পরবর্তীতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামে অভিহিত হয়। এ দলে অধিকাংশ মুসলমান শরীক ছিল এবং সাহাবী ও তাবেঈদের অধিকাংশই এ মতাবলম্বী ছিলেন। এরা হযরত আলী (রা.) এর খেলাফতকে সর্বদিক থেকে সঠিক মনে করতেন এবং তাঁর খেলাফতকে খেলাফতে রাশেদার মধ্যে গণ্য করতেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার স্বতন্ত্র হুকুমত ও খেলাফত ঘোষণাকে সঠিক মনে করতেন না। কিন্তু তিনি হুজুর নবী করিম (দ.) এর সাহাবী হওয়ায় আদবের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে কোন কটুক্তি করতেন না। রাসূলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করেছেন, আমার সকল সাহাবী আদেল ন্যায়পরায়ণ। তাই এরা হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার খেলাফতের ওপর অত্যুক্তি করতেন না।

কিন্তু তারা সঠিক পথের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ হযরত আলী (রা.) এর সহযোগী ছিলেন। আর এরাই সত্যিকার অর্থে হযরত আলী (রা.) এর সাথী ও অনুসারী ছিলেন। হযরত আলী (রা.) এর ইন্তিকালের পর এরা হযরত ইমাম হাসান (রা.) কে খলীফা মেনে নেয়। তাঁর ছয় মাস খেলাফতকালে যখন তিনি মুসলমানদের দলাদলির শেষ দেখেন নি বরং দিন দিন বৃদ্ধি পেতে দেখলেন তখন তিনি মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের জন্য নিজকে খেলাফতের দায়িত্ব হতে মুক্ত করে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার হুকুমতকে মেনে নেয়ার ঘোষণা দেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের জন্য হযরত হাসান (রা.) কে অনুসরণ করে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার হুকুমত মেনে নেয়।

**খেলাফতের কেন্দ্র কূফায় :**

হযরত আলী (রা.) তাঁর খেলাফত আমলে মদীনা মুনাওয়ারা হতে সিংহাসন কূফায় স্থানান্তরিত করেন। এর কারণ হল, হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার সিংহাসন ছিল দামেস্কে। মদীনা শরীফ হতে দামেস্কের দূরত্ব বেশী। দূর সিংহাসনে বসে খিলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া দুরূহ হয়ে পড়েছিল। এছাড়া প্রত্যহ নতুন নতুন সৃষ্টি হওয়া ফেতনার মূলোৎপাটনের জন্য কূফাকে তিনি দারুল হুকুমতের জন্য উপযোগী মনে করেন। কেননা, হেজাজ, মক্কা ও মদীনা ফেতনা হতে মুক্ত ছিল। যখন হযরত আলী (রা.) দারুল হুকুমত কূফায় নিয়ে যান তখন যারা নিজেদের শীয়ানে আলী বা আলীর দল বলত তারা বিভিন্ন এলাকা হতে কূফায় এসে বসবাস শুরু করে। এভাবে কূফা শীয়ানে আলীর কেন্দ্রে পরিণত হয়।

**হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের অভিমত :**

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) অবশ্যই ইসলাম ও মুসলমানদের শুভাকাঙ্খী ছিলেন। অতীতের ন্যায় তিনিও খিলাফতের কারণে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে লড়াই যুদ্ধ বিগ্রহ রক্তপাত চাননি। তখনকার





রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে তিনি ধারণা করেছেন যে, খিলাফত বা নেতৃত্ব ছেড়ে দিলে সাধারণ লোকেরা কোন একজন নেতার ওপর ঐক্যমত পোষণ করতে পারবে না। বরং বিভিন্ন এলাকা হতে নেতৃত্বের দাবী নিয়ে অনেক নেতা মাথাচড়া দিয়ে উঠবেন। আর ইসলাম ও মুসলামানরা এক বিরাট সংকটের মধ্যে পতিত হবে। তিনি এটাও বুঝতে পারছিলেন যে, বনু হাশিমের কাছে খেলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর করা হলে বনূ উমাইয়া যারা বংশকৌলিন্যে বিশ্বাসী কখনও তা সহ্য করবে না। এভাবে মুসলমানদের মধ্যে নুতন করে যুদ্ধবিগ্রহের সূত্রপাত হবে। তাই তিনি বনূ উমাইয়াদের মধ্যে তাঁর পুত্র ইয়াযিদ যে ঐতিহাসিকদের মতে রাজনীতিতে অভিজ্ঞ ছিল তার হাতে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি শুদ্ধ করেছেন বা ভুল কিন্তু তিনি এ সিদ্ধান্ত মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ করার জন্যই করেছেন। যার প্রমাণ তার নিম্নোক্ত দোয়া যা তিনি ইয়াযিদকে দায়িত্ব দেয়ার সময় করেছেন-

اللهم ان كنت تعلم انى وليته لانه اراه اهلا لذلك فاتمم له ما وليته وان كنت وليته لانى احبه فلاتتمم له وليته

অর্থাৎ হে, আল্লাহ! তোমার ইলমে যদি এটা থাকে যে, আমি ইয়াযিদকে উপযুক্ত হওয়ার কারণে দায়িত্ব দিয়েছি তবে তুমি তাকে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দাও। আর যদি আমি তাকে মুহাব্বত করে দায়িত্ব দিয়ে থাকি তবে তুমি তাকে নেতৃত্বের সুযোগ দিও না।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার সিদ্ধান্ত ভুল হোক বা শুদ্ধ কিন্তু এর পিছনে যে তার উদ্দেশ্য ভাল ছিল একথা অস্বীকার করা যাবে না। বিজ্ঞ আলেমগণ এ কারণে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার শানে কটুক্তি, সমালোচনা ও অশালীন আলোচনাকে হারাম বলেছেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার (রা.) জন্য শুভ কামনা ও ব্যক্তিত্ব আপন জায়গায় কিন্তু কিছু লোক এটাকে অবলম্বন করে ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালায়। তারা মনে করে ইয়াযিদের নেতৃত্ব সঠিক ছিল। এমনটি তার শাসনামলে নেওয়া বিভিন্ন কুটকৌশলকে সঠিক ছিল বলে প্রপাগান্ডা চালায়। যাতে ইমাম হোসাইন (রা.) এর বিরুদ্ধে ইয়াযিদের অন্যায় আচরণকে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বলা যায়। এর জন্য কতইনা দলিল দস্তাবেজের উপস্থাপন। অথচ ইয়াযিদের সব পদক্ষেপ বিশেষতঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর প্রতি ইয়াযিদের অসদাচরণকে সঠিক বলা এবং ইমাম আলী মক্বাম ইমাম হোসাইন (রা.) কে রাষ্ট্রদ্রোহী বলা, তার অনন্য শাহাদতকে নতুন রঙে উপস্থাপন করা আহলে বায়তে রাসূল (দ.) ও স্বয়ং রাসূলে করিম (দ.) এর প্রতি বিদ্বেষ রাখারই নামান্তর বৈ কি? নিজেকে জাহান্নামী করার জন্য এরচেয়ে আর বড় নজির কি হতে পারে? সে কখনও ঈমানের দাবী করতে পারে না যার অন্তরে আহলে বায়তে রাসূল (দ.) ও তাঁর প্রতি ভালবাসা নাই। মূলতঃ ঈমান হল হুজুর নবী করিম (দ.) এর প্রতি ভালবাসা, সম্মান প্রদর্শন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালবাসা ও তা'জীমের নাম। যার কাছে মহানবী (দ.) ও তাঁর প্রিয় সাহাবী এবং আহলে বায়তে আতহারের ভালবাসা নেই মূলতঃ সে ঈমানের ন্যায় মূল্যবান দৌলত হতেই বঞ্চিত। জান্নাত তার জন্য হারাম। কেননা, জান্নাত শেষনবী হুজুর নবী করিম (দ.) ও আহলে বায়তে আতহারের কদমের ছদকা। সুতরাং যে ব্যক্তি আহলে বায়তের গোলামী, তাঁদের পায়ের ধুলা চোখের সুরমা করতে রাজি নয়, কিয়ামত দিবসে সে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সুপারিশের জন্য উপযুক্তও নয়। যার অন্তরে আহলে বায়তের ভালবাসা-মুহাব্বত নাই, সে যেন বুঝে নেয় যে, তার তাকদীরই খারাপ। সে যতই ইবাদত করুক না কেন মহান আল্লাহর দরবারে এ ইবাদতের কোন মূল্য নাই।

**৬০ হিজরীর শেষের সময়কাল হতে মুক্তি প্রার্থনা :**

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর অনন্য শাহাদাতের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এ যে, হুযুর নবী করিম (দ.) এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অনেক আগেই এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। আহলে বায়তের প্রায় সকলই

জানতেন সামনে তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে। রাসূলুল্লাহ (দ.) এর এ ভবিষ্যতবাণীর কারণে শেরে খোদা আলী (রা.) সিফফীনের যুদ্ধে কারবালার যে স্থানে ইমাম আলী মক্বাম হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) শহীদ হবেন তা চিহ্নিত করে সকলকে দেখিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (দ.) এর বিভিন্ন ভবিষ্যতবাণী গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে জানা যাবে যে, হুযুর নবী করিম (দ.) তাঁর কোন কোন সাহাবীকে এ ঘটনা কখন সংঘটিত হবে তা বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ (দ.) এর কাছের সাহাবীদের মধ্যে একজন। তিনিও জানতেন ৬০ হিজরীর শেষে শান্ত এ জগত অশান্ত হয়ে উঠবে। রাষ্ট্রে নেতৃত্বের পরিবর্তন হবে। অসভ্য পাষন্ডদের হাতে আসবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। যাদের হাতে মহান আল্লাহর আমানত ধুলিস্যাৎ হবে। আমোদ-পূর্তি, রঙ তামাশাই হবে তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য। অন্যায় অবিচারে ছেয়ে যাবে সমাজ। তাই হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সবসময় দোয়া করতেন-

اعوذ بالله من رأس الستين و امارة الصبيان

অর্থাৎ আল্লাহ তোমার কাছে ৬০ হিজরীর শেষের সময়কাল ও বাৎসল্য নেতৃত্বের হাত থেকে মুক্তি চাই। (ফতহুল বারী, ১:২১৬)

আরেক বর্ণনায় আছে- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বাজার হয়ে যাওয়ার সময় এ দোয়া পড়তেন-

اللهم لاتدركنى سنة ستين و لا امارة الصبيان

অর্থাৎ, আল্লাহ আমি যেন ৬০ হিজরী ও কিশোরের নেতৃত্ব না পাই। (ফতহুল বারী ১০:১২)

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এ ভয়ানক যুগ শুরু হওয়ার পূর্বেই যেন তিনি দুনিয়া থেকে চলে যান। তার দোয়া কবুল হয়েছে। তিনি ৫৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ৬০ হিজরীতে ইয়াযিদ ক্ষমতা দখল করে। ৬১ হিজরীর শুরুতে দশদিনের মাথায় কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়। বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ (দ.) ইয়াযিদের এ কুশাসন থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করতে শিখিয়েছেন।

**ইয়াযিদকে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার উপদেশ :**

যখন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া ইয়াযিদকে সিংহাসনে বসানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তখন সুশীল চিন্তার লোকেরা এর সমালোচনা করেন। আমরা মানি যে, সে আপনার পুত্র কিন্তু তার মানে এই নয় যে, জাতির বুযুর্গ বিদ্বান জ্ঞানীগুনী মানুষের ওপর তাকে প্রাধান্য দেয়া ঠিক হবে। সে তো একজন অলস, অনভিজ্ঞ বাঁধনহীন এক যুবক। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। তাই আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হল তার হাতে যেন বায়াত গ্রহণ করা না হয়।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া উত্তরে বললেন, আমি আশা করি কাঁধের ওপর দায়িত্ব আসলে হয়ত ভাল হয়ে যাবে। তাছাড়া হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) রাজনৈতিক বিচক্ষণতার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন সে সকল বড় বড় নেতাদের বায়াত নিতে পারলেও হযরত ইমাম আলী মক্বাম ইমাম হোসাইন (রা.) এর বায়াত গ্রহণের জন্য উৎসাহী হবেন না। কতিপয় বিজ্ঞ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর প্রমুখ সাহাবী তাদের ইন্তিকালের পূর্বে ইয়াযিদকে ইমাম হোসাইনের ব্যাপারে ওয়াছিয়ত করেছেন। ইরাকীরা তাঁকে হেজায থেকে বের করেই ছাড়বে। যদিও তুমি তাঁর ওপর প্রাধান্য পাও তবুও তাঁর সাথে কোন প্রকারের ফন্দি করো না। তাঁকে তাঁর মত করে ছেড়ে দিও। কেননা, তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। (ইবনে আসীর ৪:৬)





**মদীনার গভর্ণরের নামে ইয়াযিদের চিঠি :**

ইয়াযিদ সিংহাসনে বসার পর তার জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত ইমাম হোসাইন ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের বায়াত গ্রহণ করা। কেননা, তাদের কেউ ইয়াযিদের খেলাফতের দাবী স্বীকার করে নেননি। তাছাড়া তাঁরা মুসলিম জাতির কর্ণধার ছিলেন। তাই ইয়াযিদের ভয় ছিল তাদের কেউ খেলাফতের দাবী করে বসবেন। তার সিংহাসনের স্থায়ীত্ব ও দৃঢ়তার জন্য জরুরী ছিল যে, তাঁদের বায়াত গ্রহণ করা। ফলে সে মদীনার গভর্ণর ওয়ালিদ ইবনে উকবার কাছে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার ইন্তিকালের পয়গাম পাঠায় এবং সাথে এ নির্দেশও জারী করে যেন হযরত ইমাম হোসাইন, হযরত ইবনে ওমর তার পক্ষে বায়াত গ্রহণ করেন। যতক্ষণ না তাঁরা আমার নামে বায়াত গ্রহণ করবে ততক্ষণ তাঁদেরকে ছাড়া যাবে না। (আত তাবারী ৬:২৪)

**মারওয়ানের সাথে ওয়ালিদের পরামর্শ :**

ওয়ালিদ ইবনে উকবা একজন সাদাসিধা কোমল মনের অধিকারী নবী পরিবারের প্রতি সশ্রদ্ধ এক গভর্ণর ছিলেন। তিনি ইয়াযিদের এ নির্দেশ পেয়ে বিমূর্ষ হয়ে পড়েন। ইয়াযিদের নির্দেশ মানা তাঁর জন্য বড় কঠিন ছিল। কিন্তু অমান্য করার পরিণতিও তিনি ভাল করে জানতেন। ফলে পরামর্শের জন্য তিনি তার সহকারী মারওয়ানকে ডেকে পাঠান। পুরো ঘটনা সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। মারওয়ান কঠিন হৃদয় ও বদ মেজাজের মানুষ ছিল। সে পরামর্শ দিল আপনি তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং বায়াত গ্রহণ করার জন্য বলুন। সোজা কথায় বায়াত গ্রহণ করলে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি অস্বীকার করে তবে তাদের শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিন। যদি আপনি এরকম না করেন তবে তারা হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার ইন্তিকালের সংবাদ শুনে স্ব স্ব স্থানে খেলাফতের দাবী তুলবেন। অতঃপর তাদেরকে আয়ত্বে আনা কঠিন হয়ে পড়বে। তবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ঝগড়া বিবাদ পছন্দ করেন না। তাই তিনি খেলাফতের দাবী নাও করতে পারেন। (ইবনে আসীর- ৪:১৬)

ওয়ালিদ হযরত ইমাম হোসাইন ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) এর কাছে একজন দূত প্রেরণ করে। তিনি তাদেরকে মসজিদে নববীতে পেলেন। দূত তাদের কাছে এমন সময়ে আসলেন যখন সাধারণত ওয়ালিদ কারো সাথে দেখা করেন না। দূত বলল- হুজুর! আপনাদেরকে গভর্ণর ডেকেছেন। তারা বললেন- তুমি যাও, আমরা আসছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর হযরত ইমাম হোসাইনকে বললেন- গভর্ণর আমাদেরকে এমন সময়ে ডাকলেন যখন তিনি কারো সাথে কথা বলেন না। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন- আমার মনে হয়, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) ইন্তিকাল করেছেন। আমাদেরকে এজন্য ডেকেছেন যেন আমীরে মুয়াবিয়ার ইন্তিকালের সংবাদ প্রচার হওয়ার পূর্বেই ইয়াযিদের হাতে যেন আমরা বায়াত গ্রহণ করি। হযরত ইবনে যুবাইর (রা.) বললেন, আমার ধারণাও তাই। অতঃপর তিনি ইমাম হোসাইনের পরিকল্পনা কি তা জানতে চাইলেন। ইমাম হোসাইন বললেন, আমি তরুন শুভাকাঙ্খীদের সাথে নিয়ে তার কাছে যাব। কেননা বায়াত অস্বীকার করলে পরিস্থিতি অন্য রকমও হতে পারে। হযরত ইমাম হোসাইন সদলবলে ওয়ালিদের দরবারে যান। তিনি সাথীদের বললেন, আমি ঘরের ভেতরে প্রবেশ করব। যদি আমি তোমাদের ডাকি অথবা আমার উচ্চ বাক্য শুন তবে তোমরা কাল বিলম্ব না করে ভেতরে ঢুকে পড়বে। আর আমি যতক্ষণ না ভেতর থেকে বের না হব তোমরা স্থান ত্যাগ করবে না। তিনি ভেতরে ঢুকে সালাম দিয়ে বসলেন। ওয়ালিদের পাশে মারওয়ানও উপস্থিত ছিল। ওয়ালিদ প্রথমে তাঁকে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার ইন্তিকালের সংবাদ দিলেন পরে ইয়াযিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করতে প্রস্তাব দেন। তিনি শোক প্রকাশ করে বললেন- গোপনে বায়াত গ্রহণ করা আমার জন্য উচিত হবে না। ওয়ালিদ বললেন, ঠিক আছে আপনি যান। তখন মারওয়ান

বলল- যদি আপনি এখন তাঁকে যেতে দেন এবং বায়াত না নেন তবে আর তাঁকে আয়ত্বে আনা সম্ভব হবে না। আর এতে অনেক রক্তপাতও হতে পারে। তাই আমার পরামর্শ হল তাঁকে বন্দী করে বায়াত নিয়ে নিন। অন্যথায় তাঁর শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। ইমাম হোসাইন (রা.) মারওয়ানের এ দম্ভ উক্তি শুনে বললেন- ইবনে যারকা! তুমি আমাকে হত্যা করবে না উনি আমাকে হত্যা করবে? আল্লাহর শপথ! তুমি মিথ্যুক ও কাপুরুষ। এ বলে তিনি ঘরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান। ইমাম হোসাইন বের হয়ে গেলে মারওয়ান ওয়ালিদকে বলল- আপনি আমার পরামর্শ শুনলেন না। এমন সুযোগ দ্বিতীয়বার আপনি পাবেন না। ওয়ালিদ বললেন, আফসোস! তুমি আমাকে এমন পরামর্শ দিচ্ছ, আল্লাহর কসম! যদি অনেক ধন সম্পদ ও বাদশাহী আমাকে নবী করিম (দ.) এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইনকে ইয়াযিদের হাতে বায়াত গ্রহণ না করায় তাকে হত্যা করার বিনিময়ে অর্জিত হয় আমি তা গ্রহণ করব না। আল্লাহর শপথ! ইমাম হোসাইনের সাথে বেয়াদবী করে কিয়ামত দিবসে কেউ রেহাই পাবে না। মারওয়ান বলল- আপনি ঠিকই বলেছেন। এ সত্যকথা মারওয়ান মুখে স্বীকার করলেও অন্তরে ওয়ালিদের কথা তার অপছন্দই ছিল। (ইবনে আসীর ৪: ১৩, ১৫)

**মদীনা মুনাওয়ারা হতে রওয়ানা :**

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) বিভিন্ন কৌশলে ওয়ালিদের প্রেরিত দূত হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেন। ওয়ালিদের কাছে না গিয়ে সহোদর জাফর (রা.) কে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। এর একদিন পর হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) নিজের আপনজন আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজনকে একত্রিত করেন। মদীনার সমূহ সংঘাত এড়ানোর জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সবাইকে তল্পীতল্পা গোছানোর নির্দেশ দিয়ে তিনি রাসূলে পাক (দ.) এর রওজা আকদসে প্রবেশ করেন। দু'রাকাত নফল আদায় করে করজোড়ে নানাজানকে সালাম আরজ করেন। রওজা আকদাসের বিরহ চিন্তায় মনের অজান্তে তিনি অশ্রুসিক্ত হন। যে প্রিয় শহর মদীনা তৈয়্যবায় তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় পার করেছেন, যে শহরের স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ তাঁকে বিমোহিত করে, সে শহরের মুক্ত আকাশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া তাঁর জন্য ছিল বড় কঠিন।

**হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার পরামর্শ :**

হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া ছাড়া ইমাম হোসাইন (রা.) এর পরিবারের সকলেই মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কায় হিজরত করেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন- ভাই! দুনিয়াতে আপনিই আমার সবচেয়ে বড় আপনজন। আমার পরামর্শ হল, আপনি কোন শহরে অবস্থান না করে বরং কোন গ্রামে বা পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থান করুন। মানুষের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করে আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করার জন্য আহবান করুন। যদি তারা আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করে তবে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। আর তারা অন্য কারো হাতে বায়াত গ্রহণ করতে ঐকমত হলেও আপনার মান-সম্মান ও ব্যক্তিত্বের ওপর কোন প্রভাব পড়বে না। আমার ভয় হচ্ছে যদি আপনি কোন নির্দিষ্ট শহরে কিংবা গোষ্টির কাছে যান তবে সেখানে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। একদল আপনাকে সমর্থন করবে অন্য দল আপনার বিরোধিতা করবে। উভয় দলের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হলে সর্বপ্রথম আপনিই শত্রুদের তীরের নিশানা হবেন। এতে এসময়ের সবচেয়ে মর্যাদাবান একজন ব্যক্তির অপমান হবে আর তাঁর পরিবার পরিজনকেও বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতন অপমান সহ্য করতে হবে। এ পরামর্শ শুনে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন, ভাই! এখন আমি কোথায় যেতে পারি? মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বললেন- আপনি মক্কায় যেতে পারেন। সেখানে আপনার ভাল লাগলে অবস্থান করবেন অন্যথায় কোন (পাহাড়ী)





মরু অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করবেন। কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস না করে নতুন নতুন এলাকায় গিয়ে মানুষের মনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। কঠিন সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে। ভাই! তোমার মমতাপূর্ণ কল্যাণকর পরামর্শ আল্লাহ চাইলে বাস্তবায়ন করতে পারে। (তাবারী ৬:২৪)

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) যখন পরিবার পরিজন নিয়ে মদীনা হতে রওয়া হলেন- তখন তিনি পবিত্র কুরআন মজীদের এ আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন-

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنى من القوم الظالمين

"অতঃপর তিনি শহর হতে ভীতাবস্থায় বের হলেন এ চিন্তায় যে, সামনে কী হয়। তিনি বললেন- প্রভূ! আমাকে অত্যাচারী গোষ্ঠী হতে নাজাত দাও।"

তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন কুরআন মজীদের এ আয়াত তেলাওয়াত করেন-

ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربى ان يهدينى سواء السبيل

আর যখন তিনি "মাদায়েন" শহরের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন বললেন- আমার প্রভূ আমাকে সহজ-সরল পথ দেখাবেন।"

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) মক্কায় পৌছার পূর্বেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) তাঁর কিছু শুভাকাঙ্খী সৃষ্টি করে রাখেন। ইয়াযিদ ৬০ হিজরীর রমযান মাসে ওয়ালিদ ইবনে ওকবাকে বহিষ্কার করে তার স্থানে আমর ইবনে সাদকে গভর্ণর মনোনয়ন দেয়। আমর ইবনে সাদ মতান্তরে স্বয়ং ইয়াযিদ মক্কাকে অবরুদ্ধ করে। অন্যদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে গ্রেফতার করার জন্য দুই হাজার পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। এ যুদ্ধে ইয়াযিদের সেনাপতি মারা যায় এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বিজয় লাভ করেন। এ যুদ্ধে ইমাম হোসাইন (রা.) নিজেকে জড়ান নি।

**কূফাবাসীর পরামর্শ ও ইমাম আলী মক্বামের প্রতি দাওয়াত :**

কূফা শহর শেরে খোদা হযরত আলী (রা.) এর অনুসারী ও মুহিব্বীনের মিলন কেন্দ্র ছিল। তিনি দারুল খেলাফত মদীনা তৈয়্যবা থেকে কূফায় স্থানান্তরিত করলে তাঁর অনুসারীরা প্রায় সেখানে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। এরা পূর্বেই হযরত ইমাম হোসাইনকে (রা.) হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার শাসনামলে কূফা আগমন করার জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। এরা যখন শুনতে পেলেন যে, হযরত ইমাম হোসাইন (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ইয়াযিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। আর এও জানতে পারলেন যে, ইয়াযিদের বাহিনী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। তখন তাদের মনে সাহস বৃদ্ধি পায়। তারা সকলে সোলায়মান ইবনে সারদ আল খাযামীকে নেতা করে তার ঘরে পরামর্শ সভার আহবান করে।

হযরত আলী (রা.) এর অনুসারীরা সোলায়মান ইবনে সারদের ঘরে একত্রিত হলেন। সেখানে আমীরে মুয়াবিয়ার ইন্তিকাল হওয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করেন। সোলায়মান ইবনে সারদ বললেন- হযরত আমীরে মুয়াবিয়া ইন্তিকাল করেছেন আর ইমাম হোসাইন (রা.) ইয়াযিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। তোমরা তাঁর পিতার অনুসারী এখন যদি তোমরা সাহায্যকারী হতে চাও এবং তাঁর দুশমনের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকো তবে তাঁর কাছে চিঠি লিখতে পার। আর কোন প্রকারের ভয়-ভীতি থাকলে কাপুরুষতা থাকলে তাঁর সাথে প্রতারণা করো না। সবাই সমোস্বরে বললেন, আমরা তাঁর সাথে প্রতারণা করবো না। তাঁর শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তাঁর জন্য

আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করব না। তখন সোলায়মান ইবনে সরদ বললেন, তোমরা যখন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ এখন চিঠি লিখতে পার। তারা অসংখ্য চিঠি প্রেরণ করে। (তাবারী ৬: ২৫)

চিঠির বিষয়বস্তু ছিল যেন তিনি দ্রুততম সময়ে কূফায় আগমন করেন। খেলাফতের সিংহাসন তাঁর জন্য খালি পড়ে আছে। হযরত আলীর (রা.) অনুসারীদের জান-মাল আপনার জন্য উৎসর্গিত। সকলেই আপনার আগমন ও সাক্ষাতের অধীর আগ্রহে বসে আছে। আপনি ছাড়া আমাদের কোন পথ প্রদর্শক ও ইমাম নেই। আপনার সাহায্যের জন্য অনেক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত। কূফায় গভর্ণর নোমান বিন বশীর থাকলেও আমরা তার পেছনে নামাজ পড়িনা। আপনি আগমন করলে আমরা তাঁকে কূফা থেকে বিতাড়িত করব। (জালাউল হাইওয়ান ২০: ১৩৯)

**ইমাম হোসাইনের (রা.) সিদ্ধান্ত :**

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর কাছে এসব চিঠি পৌছার পর তাঁর হিম্মত শতগুনে বৃদ্ধি পায়। তিনি সৎকাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের জন্য জেহাদের আওয়াজ বুলন্দ করা নিজের জন্য ফরয মনে করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ তাঁর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই তাঁর দরবারে নিবেদন করেন হুজুর। কূফায় গমন করা আপনার জন্য ঠিক হবে না। কূফার মানুষ বড় বে-ওয়াফা। তাঁরা আপনার পিতার সাথে প্রতারনা করেছে, সুক্ষ্ম কূটনীতির মাধ্যমে তাঁকে শহীদ হতে তারাই বাধ্য করেছে। তারা তো তাদের জালিম শাসককে পদচ্যুত করে আপনাকে আহবান করছে না। তারা জালিম শাসকের অনুকরণের শৃঙ্খল গলায় ঝুলিয়ে আপনাকে আহবান করছে। তারা আপনার সাথে প্রতারণা করছে না তো। ইমাম আলী মক্কাম (রা.) সবতনে বললেন-

এর জন্য এখন আমার ওপর জেহাদ করা ফরয হয়েছে। তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী হোক কিংবা ভঙ্গকারী এতে আমার কি আসে যায়? কিয়ামত দিবসে যখন মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হব সে সময়কে ভয় করছি। যখন মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন- অত্যাচার-নির্যাতনে মানবতার ইতিহাসে যখন চরম পাশবিকতা বিরাজ করছিল। ইসলামের চিরন্তন বাণী কুরআন-হাদীসের হুকুম আহকামকে অবজ্ঞা করা হচ্ছিল হোসাইন সে সময় তুমি কেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করো নি? এছাড়া কিয়ামত দিবসে কূফাবাসীরা রাব্বুল আলামিনের দরবারে অভিযোগ করবে আমরা ইমামের কাছে অনেক দরখাস্ত পেশ করেছিল, তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু ইমাম আমাদের কথা রাখেন নি। ফলে বাধ্য হয়ে আমরা অত্যাচারী ইয়াযিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছি।

পরিশেষে ইমাম হোসাইন (রা.) কূফাবাসীদের ডাকে সাড়া দিলেন। যদিও অধিকাংশ বিজ্ঞ সাহাবী এর বিরোধিতা করেন। ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের কথা তাঁর জন্মের পরপরই প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইমাম হোসাইন (রা.) বিজ্ঞ সাহাবীগণের পরামর্শ ও মনের অবস্থা বুঝতে পারলেও কূফাবাসীদের আহবান প্রত্যাখ্যান করার মত তাঁর কাছে কোন শরয়ী কারণ ছিল না। এ কারণে ইমাম হোসাইন (রা.) প্রথমে তার চাচাত ভাই মুসলিম ইবনে আকীলকে কূফার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রেরণ করেন। কূফাবাসীরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে একটি শরয়ী উযর পাওয়া যাবে। আর তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে যেসব সাহাবী বিরোধিতা করছে তাদেরকে সান্তনা দেয়া যাবে। ভাই মুসলিম! তুমি কূফায় গিয়ে তাদের অবস্থা দেখবে। যদি অবস্থা অনুকূল হয় তাহলে আমাকে চিঠি লিখে জানাবে। কূফার জ্ঞানী-গুনীদের সাথে পরামর্শ করে চিঠি লেখবে। তোমার চিঠি পেলে আমি ইনশাআল্লাহ খুব কম সময়ের মধ্যে কূফায় পৌছে যাব। ইমাম তিনিই হন যিনি কিতাবুল্লাহর ওপর আমল করেন।

**কূফায় ইমাম মুসলিমকে প্রতারণামূলক অভিনন্দন :**





হযরত মুসলিম ইবনে আকিল তার কতিপয় সাথী ও নিজের দু'পুত্র মুহাম্মদ ও ইব্রাহীমকে সাথে নিয়ে কূফায় রওয়ানা হলেন। কূফায় পৌছে তিনি মুখতার ইবনে উবাইদের ঘরে উঠেন। হযরত আলী (রা.) এর অনুসারীরা তাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান। হযরত ইমাম হোসাইনের প্রতিনিধি শুনে তারা দলে দলে তার হাতে বায়াত গ্রহণ করতে লাগল। প্রথমদিকে বার হাজারের মত লোক বায়াত গ্রহণ করে। তাদের আন্তরিকতা, মুহাব্বত দেখে তিনি ইমাম হোসাইন (রা.) এর কাছে চিঠি পাঠান। ভাই! এখানের অবস্থা আমাদের জন্য বড় অনুকূল। আপনি নিশ্চিন্ত মনে কূফায় চলে আসুন। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৮:১৫২)

**ইয়াযিদের অবগতি :**

এ সময় কূফার গভর্ণর ছিলেন নোমান ইবনে বশীর। তিনি মুসলিম ইবনে আকীলকে কোন প্রকার বাঁধা না দিয়ে পরিস্থিতিকে সহ্য করে যাচ্ছিলেন। ইয়াযিদের অনুসারীরা যখন দেখতে পেল যে, কূফার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। পাল্লা ইমাম হোসাইনের দিকে ভারী হচ্ছে। তখন তারা নোমান ইবনে বশীরের কাছে এসে বলল- কূফা ইয়াযিদের শাসনের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও কোন বাধা বিপত্তি ছাড়া মুসলিম ইবনে আকীলের হাতে হাজার হাজার মানুষ হযরত ইমাম হোসাইনের পক্ষে বায়াত গ্রহণ করছে। অথচ আপনি নিশ্চুপ তামাশা দেখছেন। মুসলিম ইবনে আকীলকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হউক। যেন আর কেহ এ রকম ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে সাহস না পায়।

উত্তরে নোমান ইবনে বশীর বললেন- যে আমার সাথে যুদ্ধ করবে না আমি তার সাথে যুদ্ধ করতে রাজি নই। আর আমি শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে তাকে গ্রেফতার করতে পারিনা। কিন্তু আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি তোমাদের আমীরের সাথে প্রতারণা কর তার বায়াত ছিন্ন কর তবে আমি তা দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করব। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম নামক এক ব্যক্তি বলল- হুজুর! এটা তো দূর্বল লোকের তরীকা। উত্তরে নোমান ইবনে বশীর বললেন- অবাধ্যতার মধ্যে বাহাদুর হওয়ার চেয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যে দূর্বলতাই আমার জন্য শ্রেয় ।

যখন ইয়াযিদের অনুসারীরা বুঝতে পারল যে, নোমান ইবনে বশীর হযরত মুসলিমের বিরুদ্ধে কোন একশ্যান গ্রহণ করবে না। অন্যদিকে প্রতিদিন হযরত মুসলিম ইবনে আকীলের হাতে সহস্রাধিক লোক বায়াত গ্রহণ করছে। তারা কোন উপায় না দেখে একজন প্রতিনিধি ইয়াযিদের কাছে প্রেরণ করে যে, নোমান ইবনে বশীর আপনার হুকুমত সংরক্ষণে সচেষ্ট নয়। ইমাম হোসাইন (রা.) কূফায় আসার পথে, প্রত্যহ যেভাবে হযরত মুসলিমের হাতে বায়াত গ্রহণ করছে অচিরেই কূফা-বসরা আপনার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

**নোমান ইবনে বশীরকে অপসারণ ও ইবনে যিয়াদকে মনোনয়ন :**

কূফার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে ইয়াযিদ তার পারিবারিক গোলাম সরজোনকে ডেকে পাঠায়। সরজোন ছিল হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার (রা.) পরিবারের বিশ্বস্ত ও তার বিশ্বস্ত কর্মচারী। ইয়াযিদ তার কোলেই বড় হয়েছে। ইয়াযিদ তাকে কূফার পূর্বাপর ঘটনা অবহিত করে এখন কর্তব্য কাজ কি হতে পারে তা জানতে চাইল। সরজোন বলল- আমার পরামর্শ হল এখন আপনি কূফায় উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে গভর্ণর নিযুক্ত করুন। তিনিই একাজের জন্য বড় উপযুক্ত হবেন। (বেদায়া নেহায়া-৮:১৫৬)

ইবনে যিয়াদ ছিল বসরার গভর্ণর। কূফায় হযরত আলী (রা.) এর অনুসারীদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তাকে নিযুক্ত করা হল। সাথে একটি রাষ্ট্রীয় পয়গাম প্রেরণ করা হলো যেন কূফায় মুসলিম ইবনে আকীলকে তালাশ করে হত্যা করা হয় নতুবা তাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। (বেদায়া নেহায়া ৮:১৫৬)

বসরায় যেদিন ইবনে যিয়াদ ইয়াযিদের পয়গাম পায় সেদিন বসরাবাসীদের কাছে হযরত ইমাম

হোসাইন (রা.) এর একজন দূত তাঁর একটি চিঠি নিয়ে হাজির হন। বসরাবাসীও ইমামের প্রতি অনুগত ছিল। আমি তোমাদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও তাঁর প্রেরিত রাসূল (দ.) এর সুন্নাতের প্রতি আহবান করছি। কেননা, বর্তমানে তাঁর সুন্নাতকে পদদলিত করে বেদআতের সয়লাব শুরু হয়েছে। আমি তোমাদেরকে সত্য রাস্তার দিকে আহবান করছি।

বসরার নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে যিনি ইমাম হোসাইন (রা.) এর চিঠি পাঠ করেন তিনি তা গোপন করেন। মুনযির ইবনে জারুদের সন্দেহ হয় যে, ইনি ইবনে যিয়াদের জাসুস নয় তো। ইবনে যিয়াদ যেদিন কূফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল সেদিন সকালে মুনযির ইবনে জারুদ ইমাম হোসাইন (রা.) এর প্রেরিত দূতকে নিয়ে তার ঘরে উপস্থিত হয়। চিঠি পড়ে ইবনে যিয়াদ কাল বিলম্ব না করে ইবনে যিয়াদ ইমাম হোসাইনের (রা.) দূতকে হত্যা করে বসরার জামে মসজিদের মিনারায় দাঁড়িয়ে এক জ্বালাময়ী বক্তব্য দেয়। আল্লাহর শপথ! আমি কোন মসিবত, শত্রুর অস্ত্রের ঝংকারে শঙ্কিত নই। যে আমার সাথে শত্রুতা রাখে আমি তার জন্য বড় শত্রু। আর যে আমার সাথে যুদ্ধ করবে আমি তার জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আমীরুল মুমেনিন ইয়াযিদ আমাকে কূফার দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি কূফার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি এবং উসমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান বসরায় আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন। আমি যাওয়ার পর যদি কোন বিরোধিতা, অবাধ্যতার কথা শুনি তবে তার চরম মূল্য দিতে হবে। যারা বিরোধিতা করবে এবং তাদেরকে সাহায্য করবে আমি চরম শাস্তি দিব, আর তোমরা জান আমি কোন পিতার কেমন সন্তান যিনি পাথরকে বিচূর্ণ করে বালিতে রূপান্তর করতেন।

**ইবনে যিয়াদের কূফায় প্রবেশ :**

উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তার পরিবার ও পাঁচশত অশ্বারোহী নিয়ে কূফার পথে যাত্রা শুরু করে। পথিমধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মুখ ফিরিয়ে নিলেও ইবনে যিয়াদ তা পরোয়া করল না। কাদেসিয়ায় পৌছে অনুগত মাত্র সতেরজনকে সাথে নিয়ে কালো নেকাব পরে ইবনে যিয়াদ কূফায় প্রবেশ করল (যেন মানুষের এ ভুল হয় যে, ইমাম হোসাইন আগমন করেছেন)। সে যেখানেই যেত আসসালামু আলাইকুম বলত। আর লোকেরা তাকে ইমাম হোসাইন (রা.) মনে করে বলত, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ইয়া ইবনা রাসূলিল্লাহ। রাসূলের নয়নমণি আপনাকে স্বাগতম। কিছুদিনের মধ্যে ইবনে যিয়াদের আশে-পাশে অনেক লোকের সমাগম হয়। মুসলিম ইবনে আমর অনুগত লোকদের সম্বোধন করে বললেন- সরে যাও, ইনি ইমাম হোসাইন (রা.) নন, ইনি হলেন আমাদের আমীর ইবনে যিয়াদ। এ কথা শুনে সাধারণ মানুষের মনে বড় কষ্ট হল। তাদের সাদা মন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এতে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের বুঝতে কষ্ট হল না যে, মুসলিম ইবনে আকীল হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর পক্ষে বায়াত গ্রহণ পথ প্রশস্ত করে চলেছেন।

ইবনে যিয়াদ যখন কূফার রাজদরবারের প্রবেশ দ্বারে নেকাব পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করল, নোমান ইবনে বশীরের মনে হল হযরত ইমাম হোসাইনই (রা.) তাশরীফ এনেছেন। তিনি প্রাসাদের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন- আমি নেতৃত্ব আপনার কাছে সোপর্দ করব না এবং আপনার সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছাও আমার নেই। ইবনে যিয়াদ বলল- দরজা খোল না হয়, আমি নিজেই দরজা খুলব। নোমান দরজা খুলে দিলেন। তখনও তিনি বুঝতে পারেন নি যে, সে ইবনে যিয়াদ। পরে এজন্য তিনি লজ্জিতও হলেন।

(বেদায়া নেহায়া- ৮:১৫৩)

ইবনে যিয়াদ ঘোষণা দিল- আমার আগমনের বার্তা কূফাবাসীদেরকে জানিয়ে দাও। লোকেরা গভর্ণর হাউজের আশেপাশে একত্রিত হতে লাগল। ইবনে যিয়াদ লোকসম্মুখে এসে বলল- "আমীরুল মুমেনীন





ইয়াযিদ আমাকে তোমাদের জানমালের নিরাপত্তার বিধান করার জন্য গভর্ণর নিযুক্ত করেছেন। তাঁর নির্দেশ হল আমি যেন তোমাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী তাদের সাথে ইনসাফ করি, অভাবীদের সাহায্য করি এবং অনুগতদের প্রতি দয়া করি। আর যারা অবাধ্য সন্দেহভাজন তাদের সাথে যেন কঠোর হই।

(বেদায়া নেহায়া- ৮:১৫৩)

এ বক্তব্যের পর ইবনে যিয়াদ কূফার নেতৃত্ব স্থানীয় অনেককে গ্রেফতার করে তাদের কাছ থেকে লিখিত মুচলেকা নেয় যেন তিনি ও তার গোষ্ঠির কেউ কোন অবাধ্যকে আশ্রয় না দেয়। আর তারা যেন কোন প্রকার অবাধ্যচারিতায় অংশ না নেয়। আর যদি কেউ রাষ্ট্রের অবাধ্য ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় তাকে আদালতে সোপর্দ করতে হবে। যারা এ লিখিত মুচলেকা মানবে না তাদের জান মাল রাষ্ট্রের জন্য হালাল বলে গণ্য হবে। তাকে হত্যা করে আদালতের দরজায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। ইবনে যিয়াদের আগমনে এবং তার ধমক শুনে কূফাবাসী ভীত হয়ে পড়ে। তাদের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আসতে থাকে। এসময় মুসলিম ইবনে আকীল মুখতার ইবনে উবাইদাহর কাছে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। রাতের অন্ধকারে তিনি হানী ইবনে উরওয়ার কাছে চলে আসেন। যিনি কূফার একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু মুসলিম ইবনে আকীলের আগমন তার কাছে পছন্দ হয়নি। তিনি বললেন- আপনি আমার ঘরে না আসলেই ভাল হত। হযরত মুসলিম ইবনে আকীল বললেন- আমি নবী পরিবারের একজন পরদেশী মুসাফির। হানী বললেন- আপনি আমার ঘরে প্রবেশ না করলে আমি বলতাম, চলে যান অন্য কোথাও আশ্রয় নেন। এটা আমার আত্মসম্ভ্রমের পরিপন্থী যে, আমি কোন মুসাফিরকে আমার ঘর থেকে বের করে দিই। পরে হানী মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত একটি গোপন কক্ষে তাঁকে আশ্রয় দেন। (ইবনে আসীর- ৪:২৫)

কূফার এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শরীক ইবনে আউযার অসুস্থ ছিলেন। তিনি শুনলেন যে, ইবনে যিয়াদ তার শুশ্রূষা করতে আসছে। তিনি হানীকে বললেন, আমার কাছে মুসলিম ইবনে আকীলকে পাঠিয়ে দিন। ইবনে যিয়াদ আমার ঘরে আসলে মুসলিম ইবনে আকীল তাকে হত্যা করতে সহজ হবে। তিনি শরীক ইবনে আউযার এর কাছে মুসলিম ইবনে আকীলকে পাঠিয়ে দেন। শরীক তাঁকে বললেন- আপনি পর্দার আড়ালে চুপ করে বসে পড়ুন। ইবনে যিয়াদ আসলে আমি পানি পান করতে চাইব। আর এটাই হবে আপনার জন্য সবুজ সংকেত। হঠাৎ এসে আপনি তাকে হত্যা করবেন।

ইবনে যিয়াদ এসেই শরীকের শয্যায় বসে পড়ল। এসময় শরীকের পাশে হানীও উপস্থিত ছিলেন। ইবনে যিয়াদের সামনে তার ভৃত্য দন্ডায়মান ছিল। কিছুক্ষণ আলাপচারিতার পর শরীক পানি পান করতে চাইল যেটা সবুজ সংকেত ছিল। কিন্তু মুসলিম ইবনে আকীল তাকে হত্যা করার জন্য বের হলেন না। পরিচারিকা পানির মশক নিয়ে এসে পর্দার আড়ালে মুসলিম ইবনে আকীলকে দেখে লজ্জায় ফিরে যায়। এভাবে তিনবার সে ফিরে গেলে শরীক বললেন- তোমরা কি আমাকে পিপাসায় মারতে চাও। মেহরান এ দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে ইবনে যিয়াদকে ইশারা করে। সাথে সাথে ইবনে যিয়াদ দাঁড়িয়ে ঘর হতে বের হয়ে যায়। শরীক বললেন- হুজুর আমি আপনাকে কিছু অছিয়ত করতে চাই। ইবনে যিয়াদ বলল- আমি আবার আসব এ বলে সে ভৃত্যের ঘোড়ায় চড়ে দৌড়ে গৃহ ত্যাগ করে। ভৃত্য বলল- হুজুর। তারা তো আপনাকে হত্যা করার ফন্দি করছিল। ইবনে যিয়াদ বলল- আফসোস! যার সাথে আমি ভাল ব্যবহার করলাম, সে কিনা এমন প্রতারণা করছে।

ইবনে যিয়াদ চলে যাওয়ার পর হযরত মুসলিম ইবনে আকীল আড়াল থেকে বের হন। শরীক বললেন- ইবনে যিয়াদকে হত্যা করতে আপনাকে কিসে বাধা দিল? তিনি বললেন- নবী করিম (দ.) এর একটি হাদীস। হুজুর (দ.) ইরশাদ করেছেন- ঈমান ধোকা দিয়ে হত্যা করাকে পছন্দ করেনা। তাছাড়া আপনার

ঘরে তাকে হত্যা করাটাও আমার অপছন্দ ছিল। শরীক বললেন- আপনি যদি তাকে হত্যা করতেন তবে কূফার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে আপনার জন্য আর কোন বাধা থাকত না। বসরাও আপনার করতলে আসত। এছাড়া এ জমিন একজন পাষন্ড নরপিশাচ হতে মুক্তি পেত। (বেদায়া নেহায়া- ৮:১৫৩)

তিনদিন পর শরীক ইন্তিকাল করলে, ইবনে যিয়াদ তার নামাযে জানাযার ইমামতি করে। পরে যখন ইবনে যিয়াদ বুঝতে পারল যে, মুসলিম ইবনে আকীলকে দিয়ে তিনি তাকে হত্যা করার জন্য কৌশল করেছেন। তখন ইবনে যিয়াদ বলল- খোদার শপথ! ভবিষ্যতে আমি আর কোন ইরাকীর জানাযায় শরীক হব না। আমার পিতা যিয়াদ এর কবর এখানে না হলে আমি শরীকের কবর বিচুর্ণ করে দিতাম।

**মুসলিম ইবনে আকীলকে তালাশ :**

হযরত মুসলিম ইবনে আকীল হানীর ঘরে নীরবে তাঁর অনুসারীদের সাথে যোগাযোগ ও বায়াতের কাজ করে যাচ্ছিলেন। ইবনে যিয়াদও রাত দিন মুসলিম ইবনে আকীলের অবস্থান জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। ইবনে যিয়াদ তার এক অনুগত ভৃত্যকে তিন হাজার দেরহাম দিয়ে বলল- তোমার কাজ হবে মুসলিম ইবনে আকীল ও তার অনুসারীদের অবস্থান খুঁজে বের করা। সে আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর অনুগত সেজে হযরত মুসলিম ইবনে আউবেহার কাছে এসে বলল- হুজুর! আমি মুলকে শাম থেকে এসেছি, মহান আল্লাহর মেহেরবানী যে, তিনি আমাকে আহলে বায়তের ভালবাসা দিয়েছেন। আমার কাছে তিন হাজার দেরহাম আছে। আহলে বায়তের পক্ষে যিনি বায়াত নিচ্ছেন আমি তার হাতে দেরহামগুলো হাদিয়া দিয়ে বায়াত গ্রহণ করতে চাই। আমি শুনেছি, আপনি তাঁকে জানেন এবং তাঁর অবস্থান সম্পর্কে অবগত আছেন। আপনার দরবারে আমার বিনয় আকুতি হল, আপনি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন এবং এ সৎকাজে সাহায্য করবেন।

হযরত মুসলিম ইবনে আউযিহা এতে খুশী হলেন আর বললেন, তুমি যাকে ভালবাস আল্লাহ তোমাকে তার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ অবশ্যই করে দিবেন। এ বলে তিনি তাকে হযরত মুসলিম ইবনে আকীলের কাছে নিয়ে আসেন। এ প্রতারক লাগাতার পনের দিন হযরত মুসলিম ইবনে আকীলের সান্নিধ্যে অবস্থান করে পুরো অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সব ঘটনাই ইবনে যিয়াদের কাছে পৌছিয়ে দেয়। (বেদায়া নেহায়া- ৮:১৫৩)

**হানীকে গ্রেফতার :**

হানী ইবনে উরওয়া কূফার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইবনে যিয়াদের সাথে তার পুরানো সম্পর্ক ছিল। মুসলিম ইবনে আকীল আসার পূর্বে তিনি ইবনে যিয়াদের ঘরে আসা-যাওয়া করতেন। মুসলিম ইবনে আকীল তার ঘরে অবস্থান করার পর থেকে তিনি ইবনে যিয়াদের সাথে যাতায়াত বন্ধ করে দেন। যেহেতু ইবনে যিয়াদ পুরো ঘটনা জেনে যায়, তাই একদিন জিজ্ঞেস করল- হানী এখন দরবারে আসেনা কেন? লোকেরা বলল, তিনি অসুস্থ তাই আসতে পারছেন না।

এরপর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক হানীর ঘরে এসে বললেন, ইবনে যিয়াদ আপনার ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণ করছে। অতএব আপনি আমাদের সাথে তার দরবারে চলুন। তার ভুল ধারণা হয়ত ভেঙ্গে যাবে। হানী ভেতরে গিয়ে মুসলিম ইবনে আকীলের সাথে কথা বলে সঙ্গী-সাথীদের সাথে ইবনে যিয়াদের কাছে আসলেন। দরবারে এসে হানী ইবনে যিয়াদকে সালাম করলে ইবনে যিয়াদ সালামের উত্তর দিল না। এতে হানী দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে ইবনে যিয়াদ বলল- হানী! মুসলিম ইবনে আকীল কোথায়? তিনি বললেন- আমি জানিনা। এ সময় ইয়ামেনী ভৃত্য দাঁড়ায়, যে শামী মুসাফির হয়ে হানীর ঘরে পনের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছিল। যে হানীর সামনেই মুসলিম ইবনে আকীলের হাতে





বায়াত গ্রহণ করেছিল এবং তিন হাজার দিরহাম উপঢৌকনও দিয়েছিল। ইবনে যিয়াদ বলল- তুমি কি একে চিনতে পারছ? তখন হানী বললেন- আল্লাহর কসম! আমি তাকে আমার ঘরে আসার জন্য দাওয়াত করি নাই। বরং সে নিজেই আমার ঘরে এসেছিল। ইবনে যিয়াদ বলল- ঠিক আছে। যাও, উনাকে আমার এখানে নিয়ে এসো। হানী বললেন- সেটা হবে না। ইবনে যিয়াদ সৈন্যদের বলল- তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। যখন হানীকে তার পাশে আনা হল, সে হানীর চেহরাতে তীর দ্বারা আঘাত করল। হানী একজন সিপাহী হতে তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে ইবনে যিয়াদকে আক্রমণ করতে চাইলেন। কিন্তু সিপাহীদের প্রতিরোধের কারণে তা সম্ভব হল না। ইবনে যিয়াদ বলল- এখন তোমর রক্ত আমার জন্য হালাল হয়ে গেল। হানীকে বন্দী করার জন্য সিপাহীদের নির্দেশ দিল।

হানীর গোষ্ঠীর লোকেরা তাকে হত্যা করা হয়েছে মনে করে গভর্ণর হাউজের পাশ জমায়েত হয়। ইবনে যিয়াদ কাজী শোরইহকে বলল- "আপনি তাদেরকে বলুন যে, ইবনে যিয়াদ তাকে শুধুমাত্র মুসলিম ইবনে আকীল সম্পর্কে জানার জন্য বন্দী করেছে।" কাজী শোরাইহ বললেন- আপনাদের নেতা হানী জীবিত আছেন। আমীর ইবনে যিয়াদ তাঁকে সামান্য আহত করেছে। আপনারা চলে যান- নিজকে এবং আপনাদের নেতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবেন না। হযরত মুসলিম ইবনে আকীল যখন এ সংবাদ পেলেন, হানীকে ইবনে যিয়াদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য রাস্তায় বের হয়ে অনুসারীদেরকে আহবান করলেন। ইত্যবসরে হযরত মুসলিম ইবনে আকীলের আশেপাশে প্রায় চার হাজার লোকের সমাগম হয়। তিনি তাদেরকে সাথে করে ইবনে যিয়াদের প্রাসাদের দিকে রওনা হলেন। পথিমধ্যে তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং বিচ্ছিন্ন না হওয়ার পরামর্শ দেন। গভর্ণর হাউজের চৌকিদাররা ইমাম মুসলিম ইবনে আকীলের বানী ইবনে যিয়াদকে পৌছিয়ে দেয়। চার হাজার সঙ্গী-সাথী নিয়ে মুসলিম ইবনে আকীল তার প্রাসাদের কাছে এসেছে শুনে ইবনে যিয়াদ ভেতরে ঢুকে মূল দরজা বন্ধ করে দেয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর সরদার যারা সে সময় ইবনে যিয়াদের প্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন, তারা ইবনে যিয়াদের নির্দেশে দেওয়ালের ওপর চড়ে আপন আপন গোষ্ঠীর লোক যারা মুসলিম ইবনে আকীলের সাথে এসেছে তাদেরকে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ইবনে যিয়াদ পিছনের দরজা দিয়ে তার অনুগত কয়েকজন সিনিয়র নেতা বাইরে প্রেরণ করে যেন সাধারণ মানুষকে মুসলিম ইবনে আকীল হতে বাধা দেয়া যায়। আর সঙ্গী-সাথীদেরও তাদের মেয়েদেরকে ডেকে এনে ঘরের পুরুষদেরকে মুসলিম ইবনে আকীলকে সহযোগিতা করা থেকে নিভৃত করতে চেষ্ঠা করে এবং ইবনে যিয়াদের শক্তিকে আরো মজবুত করার জন্য শামী সৈন্যবাহিনী আসছে বলে প্রচার শুরু। যেন মুসলিম ইবনে আকীলের সাথে আসা সহাযোগিরা তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। তাদের এসব ফন্দি কাজে আসে। আস্তে আস্তে লোকেরা মুসলিম ইবনে আকীলকে ছাড়তে শুরু করে। মাগরিবের নামাযের সময় শুধুমাত্র ৩০ জন মানুষ ছাড়া বাকী সবাই চলে যায়। মাত্র এ ত্রিশজনকে নিয়ে তিনি মাগরিবের নামায আদায় করেন। নামাযের পর বাকী ত্রিশজনও এক এক করে চলে যায়। অবস্থা এমনই হল যে, তাঁকে এ দুঃসময়ে সাহস ও পরামর্শ দেয়ার মত আর কেউ থাকল না। অন্ধকার নেমে আসলে তিনি তাওয়া নামক এক মহিলার দরজায় উপস্থিত হয়। ঐ মহিলা দরজায় বসে ছেলে বেলালের জন্য অপেক্ষা করছিল। মুসলিম ইবনে আকীল তার কাছে পানি চাইলেন। সে তাকে পানি পান করিয়ে ভেতরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর এসে আগন্তুক মুসাফিরকে তার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি পানি পান করেন নি? তিনি বললেন- হ্যাঁ, পান করেছি। তাহলে নিজ গন্তব্যে চলে যেতে অসুবিধা কোথায়? তিনি বললেন, এ শহরে যাওয়ার মত আমার কোন ঘর নেই, কারো সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্কও নেই। আমি মুসলিম ইবনে আকীল। এ জনপদের লোকেরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছে, প্রতারণা করেছে। মহিলা বলল- আপনি ভেতরে আসুন। তাঁর জন্য সে একটি আলাদা রুমে বিছানা করে দিল এবং রাতের খাবার তৈরী করল। কিন্তু

মুসলিম ইবনে আকীল খাবার গ্রহণ করলেন না। কিছুক্ষণ পর মহিলার ছেলে আসলে সে মাকে জিজ্ঞাসা করে- ইনি কে? অনেক কাকুতি মিনতি করার পর মা তাকে বলল- বাবা, ইনি হযরত মুসলিম ইবনে আকীল। ইবনে যিয়াদ তার কর্মকর্তা ও নেতৃস্থানীয়দের নিয়ে মহল থেকে বের হয়ে জামে মসজিদে নামায আদায় করে। নামাযের পর সে কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলল- মুসলিম ইবনে আকীলের অনুসন্ধান কর, যার কাছে ইবনে আকীলকে আশ্রিত পাওয়া যাবে তার খুনও আমার জন্য হালাল। আর যে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। পুলিশদের নির্দেশ দেয়া হল তারা যেন যে কোন মূল্যে ইবনে আকীলকে গ্রেফতার করে।

সকালবেলা বুড়ির ছেলে বেলাল আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আশয়াসকে ইমাম মুসলিম ইবনে আকীলের অবস্থান সম্পর্কে বলে দেয়। এ সময় আব্দুর রহমানের পিতা মুহাম্মদ ইবনে আশয়াস ইবনে যিয়াদের পাশে বসা ছিল। পুত্র এসে তাকে মুসলিম ইবনে আকীলের অবস্থান বলে দিলে ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞেস করল- পুত্র কি বলল? মুহাম্মদ ইবনে আশয়াস বলল- মুসলিম ইবনে আকীলের অবস্থানের খবর। ইবনে যিয়াদ খুশীতে হাতের চটি দিয়ে তাকে খোচা দিয়ে বলল- যাও, তাকে গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে এসো। পুলিশ অফিসার ওমর ইবনে হারিছ মাখজূমীকে সত্তর-আশিজনের একটি বাহিনী দিয়ে আবদুর রহমান ও মুহাম্মদ ইবনে আশয়াসের সাথে মুসলিম ইবনে আকীলকে গ্রেফতার করার জন্য প্রেরণ করা হয়।

হযরত মুসলিম ইবনে আকীল তখনই বুঝতে পারেন যখন তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়। প্রাণপণ প্রতিরোধ গড়ে তুলে অবশেষে শত্রু সিপাহীর আঘাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ইবনে যিয়াদের সিপাহীরা তার তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তাকে খচ্চরে চড়িয়ে ইবনে যিয়াদের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। হযরত মুসলিম ইবনে আকীলের বুঝতে বাকী রইল না যে, সেখানে তাকে শহীদ করা হবে। এ সময় ইমাম হোসাইন (রা.) এর কথা ভেবে তাঁর দু'চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু পড়তে থাকে। তার অশ্রুসিক্ত নয়ন দেখে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আস সালামী বললেন- আপনি যে পথের যাত্রী তারা তো কোন মুসিবতে ভেঙ্গে পড়েনা। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি আমার কথা ভেবে কাঁদছিনা। বরং ইমাম হোসাইন ও নবী পরিবারের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। মুহাম্মদ ইবনে আশয়াসকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, ভাই! পারলে একটি কাজ করো- ইমাম হোসাইন (রা.) আজকালের মধ্যে কূফার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। দূত পাঠিয়ে তাঁকে যাত্রা বিরতি করতে অনুরোধ করো। মুহাম্মদ ইবনে আশয়াস বললেন, আমি এ কাজ অবশ্যই করব। ইবনে আশয়াস সব কাহিনী লিখে একজন দূত মারফতে একটি চিঠি হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর কাছে পৌছিয়ে দেন। দূত চারদিন পর মক্কার অদূরে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর সাক্ষাত করে চিঠি হস্তান্তর করে। চিঠি পাঠ করে ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন, পরিশেষে সেটাই হবে যা রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা হবে।

হযরত ইবনে আকীলকে নিয়ে সিপাহীরা যখন ইবনে যিয়াদের দরবারে পৌছে তখন তিনি একটু ঠান্ডা পানি চাইলেন। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায় ইবনে আকীল পাশের পানির মশকের প্রতি ইঙ্গিত করে পানি চাইলে একব্যক্তি বলল- জাহান্নামের ফুটন্ত পানির পূর্বে এ পানিতে তোমার কাজ কি? ইবনে আকীল বললেন- জাহান্নামের আগুন তোমার জন্যই বেশী প্রযোজ্য।

ইমারাহ ইবনে উকবা ইবনে আবু মুয়িত তার ভৃত্যকে পাঠিয়ে মুসলিম ইবনে আকীলের জন্য এক মশক ঠান্ডা পানি আনে। ইমাম মুসলিম ইবনে আকীল অনেক চেষ্ঠা করে রক্তের কারণে পানি পান করতে পারলেন না। এমন সময় তার সামনের দুটি দাঁত পড়ে যায়। এসময় অজান্তেই তিনি বললেন- কিছুক্ষণ পর ইবনে যিয়াদের সামনে হযরত মুসলিম ইবনে আকীলকে হাজির করা হল। তিনি ইবনে





যিয়াদকে সালাম করলেন না। দারোয়ান বলল, আপনি কি আমীরকে সালাম করেন না? তিনি বললেন- না, সে যদি আমাকে শহীদ করে তবে এর আর প্রয়োজন নেই। আর যদি শহীদ না করে তবে সালাম করার সুযোগ ভবিষ্যতে অনেক পাব। ইবনে যিয়াদ বলল- ইবনে আকীল! তুমি এখানে এসে মানুষের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট করেছ। পরস্পরের মধ্যে রক্তের খেলায় উম্মত্ত করে তুলেছ। তিনি বললেন- কখনও না, বরং আমি কূফায় আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছি। (বেদায়া নেহায়া- ৮: ১৫৪-১৫৬)

**হযরত মুসলিম ইবনে আকীলের (রা.) শাহাদাত :**

হযরত মুসলিম ইবনে আকীল ও ইবনে যিয়াদের মধ্যে লম্বা কথা কাটাকাটি হয়। ইবনে যিয়াদের সব প্রশ্নের তিনি দাঁতাভাঙ্গা উত্তর দেন। পরিশেষে যখন ইবনে যিয়াদ তাঁকে শহীদ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় তখন ইমাম মুসলিম ইবনে আকীল বললেন, আমাকে শাহাদতের পূর্বে কিছু ওয়াছিয়ত করার সুযোগ দেয়া হোক। ইবনে যিয়াদ বলল- ঠিক আছে, আপনি ওয়াছিয়ত করতে পারেন। ইমাম মুসলিম সভাসদের দিকে নজর দিয়ে দেখলেন, সেখানে ওমর ইবনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসও উপস্থিত আছে। তিনি বললেন- ওমর! তোমার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। আমার সাথে মহলের এক পাশ চলো। আমি তোমার সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে চাই। কিন্তু ওমর আলাদা ভাবে কথা বলতে অস্বীকার করে। পরে ইবনে যিয়াদ তাকে অনুমতি দিলে তার পাশেই হযরত মুসলিম ওমরের সাথে কথা বলেন। কূফায় আমার সাতশত দেরহাম কর্জ আছে। তুমি আমার পক্ষ থেকে এ দেনা পরিশোধ করবে। দ্বিতীয় ওয়াছিয়ত হল, আমাকে দাফন করার ব্যবস্থা করবে। তৃতীয় ওয়াছিয়ত হল- কোন প্রকারে ইমাম হোসাইন (রা.) কে কূফায় আসা হতে বিরত করবে। মনে হয় তিনি কূফার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।

ওমর ইবনে সাদ হযরত মুসলিম ইবনে আকীলের সব ওয়াছিয়তই ইবনে যিয়াদকে বলে দিল। ইবনে যিয়াদ তাকে সব ওয়াছিয়ত পূর্ণ করার অনুমতি দিল। এরপর ইবনে যিয়াদের নির্দেশে মুসলিম ইবনে আকীলকে গভর্ণর ভবনের ওপরে আনা হয়। দরূদ পড়তে পড়তে ইমাম মুসলিম ওপরে উঠেন। দু'হাত তুলে রাব্বুল আলামিনের কাছে ফরিয়াদ করলেন, আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে এবং এ ধোকাবাজ গোষ্ঠির মধ্যে ফায়সালা করে দাও, যারা কথা দিয়ে কথা রাখল না, দোয়া শেষ হতে না হতেই জাল্লাদ তার শিরকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। এরপর ইবনে যিয়াদ হানী ইবনে উরওয়াকে হত্যা করার হুকুম দেয়। হানীকে 'সাওকুল গনম'-এ হত্যা করে বাজারে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এছাড়া ইবনে যিয়াদ আরো অনেক আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর অনুগতদের হত্যা করে। হযরত মুসলিম ইবনে আকীলসহ সকল হত্যাকান্ডের ঘটনা চিঠি মারফত ইয়াযিদকে অবহিত করা হয়। (বেদায়া নেহায়া- ৮: ১৫৭)

**হযরত মুসলিম ইবনে আকীলের পুত্রদ্বয় :**

হযরত মুসলিম ইবনে আকীল কুফার অবস্থা বেগতিক দেখে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ও ইব্রাহীমকে কাজী শুরাইহ এর নিকট নিরাপত্তার আশায় প্রেরণ করেন। অধিকাংশ ইতিহাসের কিতাবে আছে যে, মুহাম্মদ ও ইব্রাহীমকে মুসলিম ইবনে আকীলের শাহাদতের পরপরই শহীদ করা হয়েছে। 'রওযাতুশ শোহাদা' গ্রন্থে মুল্লা হুসাইন কাশেফী এ ঘটনার বিবরণ এভাবে দিয়েছেন যে, হযরত মুসলিম ইবনে আকীল তাঁর পুত্রদ্বয়কে এ বলে কাজী শুরাইহ এর নিকট প্রেরণ করেন- পুত্রগণ! তোমরা এখানে অবস্থান করো, আমি তোমাদের চাচা উম্মে হানীকে রক্ষার জন্য যুদ্ধে যাচ্ছি, দ্রুততম সময়ে আমি ফিরে আসছি। পুত্রদ্বয় পিতার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিল। দিন গেল, রাত গেল; কিন্তু পিতা মুসলিম ইবনে আকীল ফিরে আসলেন

না। নিষ্পাপ পুত্রদ্বয় পিতার অনুপস্থিতিতে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিল। কাজী শুরাইহ প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। তারা দু'দিন যাবৎ কিছুই পানাহার করল না; শুধু পিতার আগমনের প্রহর গুণছিল। একসময় ছোটভাই ইব্রাহীম বড়ভাই মুহাম্মদকে বলল- আল্লাহই জানেন আমাদের পিতা কখন ফিরবেন, আমার তোম মদীনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে; শয়নে-স্বপনে এখন আমি শুধু মদীনার অলি-গলি দেখতে পাচ্ছি। মদীনার ছেলেরা হয়ত বলবে- ইব্রাহীম কুফায় গিয়ে আমাদের ভুলে গেছে। এ নিষ্পাপ কণ্ঠে এসব কথা শুনে কাজী শুরাইহ এর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল।

এসময় কুফার রাস্তায় ঘোষণা হচ্ছে- যে ব্যক্তি মুসলিম ইবনে আকীলের পুত্রদ্বয়কে গ্রেফতার করবে তাকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করা হবে। আর যে তাদেরকে আশ্রয় দেবে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। গোয়েন্দারা সব জায়গায় নিষ্পাপ ছেলেদ্বয়ের তালাশে লেগে গেল। উপায়ান্তর না দেখে কাজী শুরাইহ অনেক কষ্টে ছেলেদ্বয়কে বুকে জড়িয়ে বলল- বাবা! তোমাদের পিতাকে শহীদ করা হয়েছে। শত-সহস্র কুফাবাসী যারা তোমাদের হাতে-মুখে চুম্বন করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতে, তোমাদের পিতার হাতে বায়াত গ্রহণ করে তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ করার ঘোষণা দিত তারা সকলেই তোমাদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে। এখন গোপনে মদীনায় চলে যাওয়া ছাড়া তোমাদের আর কোন পথ নেই। যদি তোমরা এখানে বেশিদিন অবস্থান করো তবে যে কোন মুহূর্তে তোমাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। তিনি পুত্র আসাদকে ডেকে বললেন- আজ 'বাবুল ইরাকীন' হতে একটি কাফেলা মদীনার পথে রওনা হচ্ছে, তুমি আহলে বায়তে রাসুল (দ.) এর অনুগত কাউকে এ নিষ্পাপ ছেলেদ্বয়কে তুলে দাও যেন সে অতি গোপনে তাদেরকে মদীনায় পৌঁছে দেয়।

**মুসলিম ইবনে আকীল (রা.)'র পুত্রদ্বয়ের শাহাদাত :**

কাজী শুরাইহের পুত্র আসাদ সকাল সকাল নিষ্পাপ ছেলেদ্বয়কে নিয়ে বাবুল ইরাকীনে পৌঁছে জানতে পারল, কাফেলা অল্প কিছুক্ষণ পূর্বেই রওনা হয়ে গেছে। সে ছেলেদ্বয়কে নিয়ে মদীনার পথে রওনা হল। কিছুদূর গিয়ে সামনে কাফেলা দেখতে পেল। আসাদ বলল- ঐ যে দেখছ কাফেলা, ওটিই মদীনার পথযাত্রী কাফেলা। তোমাদের সাথে যাওয়া আমার জন্য সঙ্গত হবে না। দৌড়ে গেলে তোমরা কাফেলার সাথী হতে পারবে। নিষ্পাপ ছেলেদ্বয় তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হাতে হাত ধরে কাফেলার দিকে দৌড়ে রওনা হল। কিন্তু নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! কিছুদূর যেতে না যেতেই ছোটভাই ইব্রাহীমের পায়ে কাঁটা বিদীর্ণ হয়। বড়ভাই মুহাম্মদ ছোটভাইকে নিয়ে আর দ্রুত দৌড়াতে পারল না। কাঁটাটি বের করতে করতে মদীনার পথযাত্রী কাফেলা তাঁদের চোখের আড়াল হয়ে গেল। নির্জন মরুভূমির সে পথে তাদের চোখে মুখে অন্ধকার নেমে আসল। উপায়ান্তর না দেখে দু'ভাই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। হায় আল্লাহ! এখন আমরা যাব কোথায়!

দিনের আলো প্রসারিত হতেই ইবনে যিয়াদের সৈন্যদল তাদের তালাশে সেখানেই এসে পৌঁছল যেখানে শাহজাদারা দাঁড়িয়েছিল। নিষ্পাপ চেহারার ঝলক দেখেই সৈন্যরা বুঝতে পারল, এরাই নবী পরিবারের জ্যোতির্ময় প্রদীপ হবে। ফলে সৈন্যরা তাদেরকে গ্রেফতার করে ইবনে যিয়াদের দরবারে নিয়ে গেল। ইবনে যিয়াদ বলল- 'তাদেরকে কারাবন্দী করো, তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এ বিষয়ে আমি ইয়াযিদের সাথে আলোচনা করে নিচ্ছি।'

তাদেরকে অন্ধকার কুঠরীতে বন্দী করা হল। সংকীর্ণ ভয়ানক অন্ধকার কুঠরীতে তারা হতবিহবল হয়ে পড়ল। তারা পরস্পরে বলল- 'এটি কোন্ ধরণের কুঠরী, মদীনায় আমরা এমন কুঠরীতো কখনো দেখিনি।' এ নিষ্পাপ ছেলেরা কারাগার সম্পর্কে ছিল অনবহিত। অসহায় এ ছেলেদ্বয় চিন্তিত মনে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়ল। তিনদিন যাবৎ তাদের নাওয়া-খাওয়া হয়নি। তাই দুর্বলতায় নিথর হয়ে আসছিল তাদের শরীর। কারাগারের প্রহরীদের মধ্যে মাশকুর নামক একব্যক্তি আহলে বায়তে রাসূল





(দ.) এর আশেক ছিলেন। যখন সে এ নিষ্পাপ ছেলেদ্বয়ের ওপর নির্যাতন দেখল, গোপনে তাদেরকে তার হাতের আংটি দিয়ে বলল- 'বাবারা! আমি একজন আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর গোলাম, এ আংটি নিয়ে গোপনে কাদেসিয়ায় চলে যাও, সেখানকার কতোয়াল আমার ছোট ভাই। তাকে এ আংটি দেখিয়ে আমার কথা বলবে এবং তোমাদেরকে মদীনায় পৌঁছিয়ে দিতে বলবে।'

ছেলেদ্বয় সারারাত পথ চলল, কিন্তু কাদেসিয়ায় পৌঁছা তাদের হল না। সকাল হতেই বুঝতে পারল, তারা কুফার এলাকায় ঘুরাঘুরি করেছে, যেখান থেকে শুরু করেছে সেখানে এসেই পৌঁছল। নির্যাতনের কথা ভেবে উভয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। অনতিদূরে একটি শুকনো গাছের ডালের ভেতরে আশ্রয় নিয়ে দিনটি কাটিয়ে দিয়ে রাতের বেলায় কাদেসিয়ার পথে রওনা হওয়ার ইচ্ছায় শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর এক কুমারী পাশে প্রবাহিত ঝর্ণা থেকে পানি নিতে আসলে তার চোখ জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা এ নিষ্পাপ ছেলেদের ওপর পড়তেই চিৎকার দিয়ে বলে উঠল- হায়রে বাচাধন। তোমরা কার কোলের মানিক, এত সুন্দর নিষ্পাপ শিশু তো আর কখনো দেখিনি। তোমরা কি আহলে বায়তে রাসুল (দ.) এর কেউ? এমন মায়াবী কণ্ঠের আহাজারী শুনে তারা বলে দিল, 'আমরা মুসলিম ইবনে আকীলের পুত্র; যাকে কুফাবাসীরা শহীদ করেছে।' এতটুকু বলতে না বলতে তারা ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। কুমারী বলল- 'বাচাধন! কেঁদো না; আমার মালিকাও আহলে বায়তে রাসুল (দ.) এর প্রেমিকা, চলো আমার সাথে চলো। হায়রে আহলে বায়ত! কয়দিন পর্যন্ত তোমাদের নাওয়া-খাওয়া হয় নি।' কুমারী তাদেরকে সাথে করে তার মালিকার কাছে নিয়ে আসল। মালিকা পূর্বাপর সব ঘটনা শুনে বড় আদরে ছেলেদ্বয়কে জড়িয়ে ধরল এবং খুশীতে সে কুমারীকে আযাদ করে দিল। বড় যত্ন করে তাদেরকে গোসল করাল এবং পরম মমতায় খেতে দিল। বলল- আমার কাছে তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। নির্ভয়ে তোমরা এখানে থাকতে পার।

এদিকে ইবনে যিয়াদ অবগত হল যে, মাশকুর ছেলেদ্বয়কে মুক্ত করে দিয়েছে। সে মাশকুরকে ডেকে পাঠাল এবং জিজ্ঞাসা করল- তুমি মুসলিমের ছেলের সাথে কি করেছ? মাশকুর বলল- এ নিষ্পাপ ছেলেদ্বয়কে শহীদ করলে দুনিয়াতে আমি আর কিইবা পেতাম। আমি তাদের সাথে সেই আচরণ করেছি যেন পরকালে তাদের পিতামহের সুপারিশ নসীব হয়। আর তোমার তো সেই সুপারিশ কখনো নসীব হবে না। এতে ইবনে যিয়াদ রাগান্বিত স্বরে বলল- এখন তোমার যোগ্য শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। মাশকুর বলল- যদি আমার হাজার জীবন থাকত আমি সবটিই আহলে বায়তে রাসুল (দ.) এর জন্য কুরবান করতাম।

ইবনে যিয়াদ জল্লাদকে বলল- একে এত বেশি বেত্রাঘাত কর যাতে সে মরে যায়। পরে তার মস্তক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। জল্লাদ তাই করল, যা তাকে নির্দেশ দেয়া হল। [ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন]

পবিত্র মনের সেই রমণী বড় আদর যত্ন করে ছেলেদ্বয়কে পানাহার করিয়ে ঘরের এক কামরায় বড় মমতায় শুইয়ে দিল। ইত্যবসরে স্বামী হারেস ঘরে ফিরল। তার চেহারায় না পাওয়ার চাপ দেখে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল- আজ এত দেরী কেন, সারাদিন কোথায় ছিলেন? সে বলল- সকালে আমীরে কুফার নিকট গিয়েছিলাম। শুনলাম, দারোগা মাশকুর মুসলিম ইবনে আকীলের ছেলেদ্বয়কে মুক্ত করে দিয়েছে এবং আমীর ঘোষণা করেছে, যে কেউ তাদের গ্রেফতার করতে পারলে তাকে ঘোড়া, সম্মানজনক পোশাক ও বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার দেয়া হবে। অনেকেই তাদের তালাশে সারাদিন এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করেছে। আমিও অনেক জায়গায় তাদের তালাশে ছিলাম। ঘোড়ায় চড়ে পদব্রজে সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তার স্ত্রী বলল- হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় করো, রাসুল (দ.) এর পরিবার-পরিজন নিয়ে তোমার কাজ কি? হারিস বলল- চুপ কর! তুমি জান না, ইবনে যিয়াদ ঐ ছেলেদের সম্পর্কে খবর পৌঁছাতে পারলে কত পুরস্কার দেবে। তার স্ত্রী বলল- তারা বড় হতভাগ্য, যারা

এ দু' ইয়াতিম বাচ্চাকে যালেমদের হাতে সোপর্দ করার জন্য দিনরাত তাদের তালাশে মগ্ন এবং যারা আখিরাতকে পার্থিব সম্মান উপঢৌকনের জন্য বিক্রয় করে। হারেস বলল- এসব বিষয়ে মন্তব্য করার তুমি কে? খাবার নাও। স্ত্রী খাবার আনলে সে খেয়ে আরামে শুয়ে পড়ল।

রাতে বড়ভাই মুহাম্মদ স্বীয় পিতা মুসলিম ইবনে আকীলকে স্বপ্নে দেখল এবং জেগে ছোটভাই ইব্রাহীমকে জাগিয়ে বলল- ভাই! এখন আর ঘুমানোর সময় নেই। উঠো! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমাদের আব্বাজান, রাসুলুল্লাহ (দ.), হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতেমা (রা.) ও হাসান (রা.) একত্রে বেহেশতের মধ্যে হাটাহাটি করছে। হঠাৎ রাসুলুল্লাহ (দ.) আমাদেরকে দেখে আব্বাজানকে বললেন- মুসলিম! তুমি এসে গেছ, অথচ তোমার পুত্রদ্বয়কে যালিমদের হাতে ছেড়ে এসেছ! আব্বাজান আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন- হুযুর! তারাও এসে পড়ছেন। একথা শুনে ছোটভাই বড়ভাইয়ের বক্ষে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বড়ভাই বলল- কেঁদো না, ধৈর্য্য ধর।

বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনে যালিম হারিসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে স্ত্রীকে জাগিয়ে বলল- আমার ঘরে ছোট ছেলের কান্নার আওয়াজ কোত্থেকে আসছে। বেচারী স্ত্রী সম্বিত হারিয়ে নির্বাক হয়ে পড়ল। হারিস চেরাগ জ্বালাল। যেদিক থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে সেদিকে গেল। কামরায় ঢুকতেই এ নিষ্পাপ নুরানী চেহারার আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর প্রতি দৃষ্টি পড়ল। তারা জড়ো হয়ে অঝোর নয়নে কাঁদছিল। হারেস জিজ্ঞাসা করল- তোমরা কারা? বাচ্চারা বলল- আমরা মুসলিম ইবনে আকীলের ছেলে। হায়রে কপাল! তোমরা আমার ঘরে বসে আছ, আর আমি কিনা সারাদিন তোমাদের খোঁজে শহরের অলি-গলিতে প্রাণান্তকর চেষ্টায় দিন কাটিয়েছি। স্ত্রী তার স্বামীর পায়ে পড়ে অনেক অনুনয় বিনয় করে এ ইয়াতীম ছেলেদের প্রতি নির্দয় হতে বারণ করে; কিন্তু পাষাণ হারেসের মন কিছুতেই গলল না; বরং স্ত্রীকে ধমক দিয়ে কামরার দরজা তালাবদ্ধ করে দিল যাতে স্ত্রী তাদেরকে অন্য কোথাও যেতে দিতে না পারে।

সকাল হতেই হারেস এ নিষ্পাপ ছেলেদ্বয়কে নিয়ে রওনা হল। স্ত্রী খালি পায়ে স্বামীর পিছনে পিছনে দৌড়াতে শুরু করল। ও হে, আল্লাহকে ভয় কর, এ ইয়াতীমদের প্রতি দয়া কর। স্ত্রীর কোন অনুরোধই তাকে প্রভাবান্বিত করল না; বরং উল্টো সে স্ত্রীকেই মারতে উদ্যত হল। এ সময় হারেসের এক ক্রীতদাস যে তার পুত্রের দুধুভাই ছিল, সেও হারেসকে থামাতে চেষ্টা করল। হারেস তার ক্রীতদাসকে বলল- হয়ত রাস্তায় কেউ পুরস্কারের আশায় আমাকে পরাভূত করে এদেরকে ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে যাবে। তাই তুমি এ তলোয়ার নাও এবং এ ছেলেদ্বয়ের মস্তক শরীর থেকে আলাদা করে দাও যাতে আমি নির্বিঘ্নে ইবনে যিয়াদের কাছে এদেরকে নিয়ে যেতে পারি। ক্রীতদাস বলল- আমি কাল কিয়ামতের দিনকে ভয় করছি, যখন রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সামনে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, এদেরকে কেন শহীদ করেছ?

হারেস বলল- তুমি এদের হত্যা করো, অন্যথায় আমি তোমাকে হত্যা করব। এ সময় হারেসের স্ত্রী ও পুত্র উভয়ের মধ্যে উপস্থিত হল। হারেস পুত্রকে বলল- বাবা! তলোয়ার নাও এবং এদেরকে হত্যা কর। পুত্র বলল- আপনার কি আমার দুধু ভাইকে এভাবে আঘাত করতে এতটুকুও দয়া হয়নি। পিতা উত্তর না দিয়ে তলোয়ারের আঘাতে ক্রীতদাসকে শহীদ করে দিল। পুত্র বলল- আপনার ন্যায় এত পাষাণ হৃদয়ের মানুষ আমি দেখিনি। আল্লাহর শপথ! আমি কখনো এই ঘৃণিত কাজ করব না। স্ত্রী পুনরায় স্বামীকে অনুরোধ করে বলল- এ ইয়াতীম ছেলেদ্বয়কে শহীদ কর না; বরং তুমি তাদেরকে জীবিত ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে যাও। হারেস বলল- আমার শংকা হচ্ছে যে, কুফাবাসী তাদের জীবিত দেখলে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে।

অবশেষে এ যালিম তলোয়ার হাতে নিয়ে ইয়াতীম নিষ্পাপ ছেলেদ্বয়ের দিকে অগ্রসর হলে স্ত্রী তার সামনে এসে প্রতিরোধ করল। সে স্ত্রীকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল। মাকে আহত দেখে পুত্র দৌড়ে আসলে পাষন্ড নিজের ছেলের ওপর আঘাত করতে দ্বিধা করল না। তলোয়ারের আঘাতে নিজের সামনে আপন পুত্রকে হত্যা করল। ছেলেকে মৃত্যুপানে চলতে দেখে মায়ের বুক চিরে প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল।





অতঃপর এ নির্মম পাষন্ড হারেস তলোয়ারের আঘাতে আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর দু' কুসুমকলিকে জান্নাতের পানে বিদায় করল। [ ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন ]

এ ইয়াতিমদের শহীদ করে তাদের মস্তক শরীর হতে বিচ্ছিন্ন করে এক বড় থলেতে ভরে গোপনে ইবনে যিয়াদের নিকট উপস্থিত হয়ে দম্ভ ভরে বলল- এ হল আপনার শত্রুর মাথা! আমার কোন্ শত্রুর মাথা? হারেস বলল- মুসলিম ইবনে আকীলের পুত্রদ্বয়ের। ইবনে যিয়াদ রাগান্বিত স্বরে বলল- তোমাকে এদের হত্যা করতে কে বলেছে, বদবখ্ত? ইয়াযিদ আমাকে তাদের জীবিত পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে। এখন আমি কি করব? ইবনে যিয়াদ হারিসকে বিনা অনুমতিতে এদেরকে হত্যা করার কারণে নির্মমভাবে হত্যা করল এবং তার মস্তকও শরীর থেকে আলাদা করে দিল। (রাওযাতুশ শোহাদা)

ইমাম হোসাইন (রা.) এর কূফায় আগমনের দৃঢ় প্রত্যয় :

কূফাবাসীদের অসংখ্য চিঠি এবং প্রতিনিধি দলের আহবানের পর হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) মুসলিম ইবনে আকীলকে আসল অবস্থা জানার জন্য কূফায় প্রেরণ করেন। তিনি কূফাবাসীদের আতিথিয়তা ও ভালবাসা দেখে ইমাম হোসাইন (রা.) এর কাছে চিঠি লিখেন যে, আপনি এখানে আসতে কোন বাধা নেই। বর্তমানে হাজার হাজার মানুষ আপনার পক্ষে আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে। ফলে ইমাম আলী মকাম কূফায় গমনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কিন্তু কূফা এলাকার অবস্থা যে, পরিবর্তন হয়ে গেছে তা তার জানা ছিল না। যখন তিনি নবী পরিবারের পবিত্র রমণীকূল, সন্তান-সন্ততি ও একান্ত আপনজনদের নিয়ে কূফাভিমুখে রওনা হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) পুনরায় তাঁকে নিষেধ করলেন। কূফাবাসী বড় অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি কূফা গমন থেকে বিরত থাকুন। যদি কূফাবাসীরা বর্তমান গভর্ণরকে প্রত্যাখ্যান করত শত্রুদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করত সর্বোপরি অবস্থা অনুকূল হত তবে আপনার জন্য কূফায় গমন করা ঠিক হত। কিন্তু তারা এমন সময়ে আপনাকে আহবান করছে যখন কূফায় একজন গভর্ণর বিদ্যমান আছে, তার হুকুমত চলছে, কর্মকর্তা কর্মচারীরা নিয়ম মাফিক বেতন-ভাতা নিচ্ছে, তাই এটা বুঝতে বাকী নেই যে, তারা আপনাকে যুদ্ধ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে যারাই আপনার কাছে চিঠি লিখেছে তারাই আপনার চরম শত্রু হবে। তারাই হুকুমতের সাথে মিলে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে।

এভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ও অন্যান্য সাথীরা ইমামকে বারণ করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু ইমাম আলী মকাম সকলকে এ উত্তর দিলেন- এ সমস্যা তো বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের নয়। এ সমস্যা তো কলিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে উড্ডীন করার, অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার, শরীয়তে মুস্তফাকে জিন্দা করার। অতএব, আমি লক্ষ্য হতে পিছপা হবনা। এটাই আমার দৃঢ় প্রত্যয়। কিছু লোক মনে করে ইমাম আলী মকাম পরিবারের সদস্য ও নিরস্ত্র আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে ইয়াযিদের সুসংগঠিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হওয়া ঠিক হয় নি। মূলতঃ এটা আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর প্রতি মনের ঈর্ষার প্রমাণ বৈ কিছুই নয়।

রোখসত ও আযীমত :

ইসলামী শরীয়তে কঠিন সময়ে দু'টি পন্থা অবলম্বন অনুমোদন করে। এক. রোখসত তথা মসিবতের কারণে শরীয়তের ওপর আমল করা থেকে বিরত থাকা। দুই. আযীমত তথা শত মসিবতকে পদদলিত করে কর্তব্য কাজে অবিচল থাকা। পন্থা দু'টিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দ.) আমাদের জন্য বৈধ করেছেন। একটিকে রোখসত ও অপরটিকে আযীমত বলা হয়।

যদি অবস্থা অনুকূল হয় জুলুম নির্যাতনের মাত্রা কম হয়, শয়তানি ও কুফরী শক্তি সহজে দমন করা যায়, তখন সকল ঈমানদারের ওপর জুলম নির্যাতনকে পরিপূর্ণ ভাবে বিদায় করার জন্য জেহাদ করা ফরজ। সে সময় কারো জন্য শরয়ী উযর ছাড়া জেহাদের ময়দান ত্যাগ করার অনুমতি নাই। কিন্তু যদি অবস্থা

প্রতিকূল হয় জেহাদের সরঞ্জাম না থাকে, অত্যাচারী জালেম বড় শক্তিধর হয়, তবে এমন সময়ে শরীয়ত ঈমানদারের জন্য দু'টি রাস্তা অনুমোদন করে। এক. রোখসতের ওপর আমল করে জেহাদের ময়দান থেকে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া এবং অন্তরে নির্যাতন ও জুলুমকে ঘৃণা করা। যুগে যুগে অধিকাংশ মানুষ রোখসতের ওপর আমল করেছে। এটা যেমন অবৈধ নয় তেমনি মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণও নয়। তাই বলে সবাই যদি রোখসতের ওপর আমল করে তবে দুনিয়াতে তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করা জুলুম নির্যাতন থেকে দেশ জাতিকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

একারণে শরীয়তে রোখসতের অনুমোদন থাকলেও কিছু অনন্য অসাধারণ লোক আযীমতের রাস্তায় অবিচল থাকেন, অবস্থা অনুকূল হোক কিংবা প্রতিকূল। তাঁরা কখনও সৈন্য দলের সংখ্যাধিক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না।

হাতিয়ারের ঝনঝনানি, জয় পরাজয়ের ধার ধারেন না। বরং তাঁদের দৃষ্টি নিপতিত হয় কিভাবে মহান আল্লাহর কলিমার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন সে দিকে। শরীর-মনে লেগে যাওয়া আগুন হয়ত পরবর্তী প্রজন্মের অন্ধকারের আলো হবে। এ কারণে তারা প্রতিকূল সময়েও আযিমতের রাস্তায় দৃঢ় প্রত্যয়ে অবিচল থাকেন। ধর্মের জন্য এ পদক্ষেপই তাঁদের কাছে ফরজে আইন।

রোখসতের রাস্তায় যেমন সবাই চলেনা। তেমনি আযিমতের রাস্তায় স্থির অবিচল থাকা সকলের জন্য সম্ভব নয়। ইমাম আলী মকাম হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর রক্ত মাংসে, শিরা-উপশিরায় যেহেতু শেরে খোদার রক্ত প্রবাহিত, নবী তনয় মা ফাতেমাতুজ জোহরার কোলে লালিত সেহেতু তাঁর পক্ষেই এমন দুঃসময়ে একা বিশাল বাহিনীর সামনে অন্যায় ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যাপ্তকণ্ঠে হুংকার দেয়া শোভা পায়।

এ মাসয়ালাও আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে, রোখসতের ওপর আমল করা যদিও বৈধ ও আমলকারীর সমালোচনা করা যায় না, কিন্তু এ রাস্তায় যারা চলেন তাদেরকে অন্যেরা জীবন চলার মডেল ও পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহন করেন না। রাহে আযিমতের ওপর যারা চলেন তারই সকলের মডেল হন। মানুষ তাদেরকেই অনুসরণীয় হিসেবে শ্রদ্ধাভক্তি করে।

প্রতিকূল অবস্থায় ইমাম হোসাইন (রা.) এর এ অভিযানকে যারা রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তারা শরীয়তের জীবনীশক্তি ও ধর্মের প্রাণশক্তি কী তাই বুঝে না। দ্বীনের পুনঃজাগরণের জীবনীশক্তির জন্য কীভাবে উৎসর্গিত হওয়া যায় তা তাদের বুঝার বিষয় নয়। যদি সেদিন ইমাম হোসাইন (রা.) ময়দানে জিহাদে কালিমায়ে হক উড্ডীন করার জন্য বের না হতেন- নবী পরিবারের ৭২ জন পবিত্র আত্মা জীবন উৎসর্গ না করতেন, তবে আজ ইসলামের যে বৈশ্বিক সম্মান, স্বাধীন মুক্ত চিন্তাধারা আমাদের সকলের সামনে জ্বলজ্বল করছে তা হয়ত ম্রীয়মান হয়ে যেত। ইসলাম ও উম্মতে মুস্তফা (দ.) হযরত হোসাইন (রা.) ও নবী পরিবারের রক্তের কাছে ঋণী। যিনি নিজের সবকিছু কুরবান করে রাহে আযিমত গ্রহণ করেছেন সে ত্যাগ দুনিয়ার সকল অন্ধকারের আলো হয়ে আজ প্রায় চৌদ্দশত বছর ধরে নির্যাতিত মানুষের পথের আলোকবর্তিকা হয়ে আছে। কিয়ামত পর্যন্ত এ দীপ শিখা মানুষের চলার পাথেয় হয়ে থাকবে, ইনশাআল্লাহ। তাই দুনিয়াতে এখনও যখন কোন মডেল উপস্থাপন করার প্রয়োজন হয় তখন সর্বাগ্রে ইমাম হোসাইন (রা.) এর নাম শতকণ্ঠে উচ্চারিত হয়। জয় ইমাম হোসাইন।

**মক্কা থেকে কারবালা পর্যন্ত :**

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ৮ জিলহজ্জ মক্কা হতে কূফার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি যখন বের হলেন তখন মক্কাবাসীরা আবেদন করেন, হুজুর! আপনি কূফায় যাবেন তো যাবেন আর দু'য়েক দিন মক্কায় অবস্থান করুন। কিন্তু ইমাম হোসাইন (রা.) এর সামনে পিতার একটি উক্তি বারবার মনে পড়ছে-





"মক্কা মুকাররমার হেরেমের পবিত্রতা একজন কুরাইশীর কারণে বিনষ্ট হবে। আর তার কারণেই মক্কায় রক্তপাত হবে। আমার মনে হচ্ছে ইয়াযিদ আমাকে গ্রেফতার করার জন্য মক্কায় সৈন্য প্রেরণ করবে আর আমার অনুসারীরা তাদের প্রতিহত করার জন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এভাবে হেরেমের পবিত্রতা বিনষ্ট হবে। আমি চাইনা যে, আমার পিতার এ উক্তির কারণ আমি হই।"

ইমাম আলী মকাম (রা.) মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে কূফার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথিমধ্যে সফাহ নামক স্থানে তাঁর সাথে আরবের প্রসিদ্ধ কবি ফরযদকের সাক্ষাত হয়। তিনি কূফা থেকে মক্কায় আসছিলেন। ফরযদক প্রথমে সালাম দিয়ে বললেন, আল্লাহ আপনার উদ্দেশ্য পূরণে সহায় হোন। ইমাম হোসাইন (রা.) জানতে চাইলেন- কূফাবাসীদের অবস্থা কেমন? তিনি বললেন-

قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى امية

অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের অন্তর আপনার দিকে থাকলেও তাদের তলোয়ার বণী উমাইয়ার সাথে।

তাছাড়া পরিশেষে সেটাই হবে যা আল্লাহর ইচ্ছা হবে। ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন- তুমি সত্য বলেছ, সবই তো আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। তিনি যা চান তাই করেন। আমরা যা চাই তা যেন আল্লাহর ফায়সালা হয় তজ্জন্য শোকরিয়া আদায় করি। আর যদি আল্লাহর সিদ্ধান্ত ভিন্ন কিছু হয় তবে কোন মুত্তাকীর জন্য আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর অভিযোগ থাকার কথা নয়। এরপর ইমাম হোসাইন (রা.) সালাম দিয়ে কূফার পথে যাত্রা করেন। (বেদায়া নেহায়া-৮:১৬৬) কবি ফরযদকের সাক্ষাতের পর হোসাইনি কাফেলা কিছুদূর যেতে না যেতে তাঁর ভাতিজা হযরত আউন ও মুহাম্মদ পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের চিঠি নিয়ে পৌছেন। চিঠিতে লেখা ছিল- "আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আশা করব যে, আপনি আমার চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে যাত্রা বিরতি করবেন এবং মক্কায় ফিরে যাবেন। আমি এ যাত্রায় আহলে বায়তে রাসূলের (দ.) কঠিন পরিণতির ভয় করছি। আপনি ইসলামের আলো, যদি আপনার কিছু হয় এ দীপ্তি শিখা মুছে গেলে মানুষ কার আলোতে উদ্ভাসিত হবে। আপনি হলেন হেদায়ত অন্বেষণকারীর আশার প্রতীক। সফরে তাড়াহুড়ো না করে ধৈর্য্য ধরুন। এ চিঠির পরপরই আমি আপনার কাছে আসছি।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) চিঠি প্রেরণ করার পর মক্কার গভর্ণর আমর ইবনে সাঈদের সাথে দেখা করে তাঁকে অনুরোধ করেন যে, আপনি একটি চিঠি প্রেরণ করে ইমাম হোসাইন (রা.) কে কূফার এ যাত্রা হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করুন। মক্কায় তার সাথে ভাল ব্যবহার করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিন। যাতে তিনি আশ্বস্ত হয়ে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। আমর ইবনে সাঈদ বললেন, যা লিখতে হয় আপনি লিখুন, নীচে আমি স্বাক্ষর করে দিব। তারপরেও তাকে কূফার যাত্রা হতে বিরত রাখা যায় কিনা? চিঠি লেখে মক্কার গভর্ণর আমর ইবনে সাঈদ তার সহোদর ইয়াহয়াকে দিয়ে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর কাছে চিঠিটি পাঠিয়ে দেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ও ইয়াহইয়া (রা.) দ্রুত গতিতে গিয়ে ইমাম হোসাইন (রা.) এর সাথে দেখা করেন। তাঁরা চিঠিটি পাঠ করে শুনালেন। কিন্তু ইমাম হোসাইন (রা.) নিজ প্রত্যয়ে অবিচল। তিনি তাদেরকে বললেন-

انى رايت رسول الله ﷺ فى المنام و قد امرنى فيها بامر وانا ماض له فقالا وما تلك الرؤيا فقال لا احدث بها احدا حتى القى ربى عز و جل

অর্থাৎ, আমি রাসূলুল্লাহ (দ.) কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে একটি কাজ সম্পাদন করতে বলেছেন। আমি অবশ্যই তা সম্পাদন করব। তারা জিজ্ঞেস করলেন- কাজটি কি? তিনি বললেন- এটা আমি কাউকে বলব না। যতক্ষণ না আমি আমার প্রভূর সাথে সাক্ষাত করেছি। (বেদায়া নেহায়া- ৬: ২৮)

**কূফাবাসীদের নামে চিঠি :**

হযরত মুসলিম ইবনে আকীল (রা.) এর শাহাদতের খবর ইমাম হোসাইন (রা.) এর কাছে পৌছেনি। তাই তিনি 'যি রিনা' উপত্যকায় পৌছে কায়স ইবনে মাসহার অথবা দুধ ভাই আবদুল্লাহ ইবনে লকতারকে দিয়ে কূফাবাসীদের কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। "মুসলিম ইবনে আকীলের চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। তিনি আমাকে আপনাদের সত্যনিষ্ঠার কথা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উদ্দেশ্যকে কামিয়াব করুন আর আল্লাহ তা'আলা একাজে সাহায্য করুন। আমি জিলহজ্জের ৮ তারিখ মঙ্গলবার কূফার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। আমার এ দূত যখন আপনাদের কাছে পৌছবে আশা করি আপনারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য কাজের গতি আরও বেগবান করবেন। ইনশাআল্লাহ আমি অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের কাছে পৌছে যাব।

ইমাম হোসাইন (রা.)'র দূত চিঠি নিয়ে কাদেসিয়ায় পৌছলে ইবনে যিয়াদের সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে ইবনে যিয়াদের দরবারে পেশ করা হয়। ইবনে যিয়াদ চিঠি পাঠান্তে তাকে গভর্ণর হাউসের ওপরে নিয়ে তাঁকে দিয়ে জোর গলায় হযরত আলী (রা.) ও ইমাম হোসাইন (রা.) কে গালমন্দ করার জন্য নির্দেশ দেয়। তিনি ছাদে উঠে গালমন্দ করার পরিবর্তে তাঁদের প্রশংসা করেন এবং তাদের জন্য রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করেন। ইবনে যিয়াদ ও তার পিতার ওপর খোদার লা'নত বর্ষিত হওয়ার জন্য বদ দোয়া করেন। ভাইসব! হযরত ইমাম হোসাইন মক্কা হতে রওনা হয়েছেন। আমি তাঁর প্রেরিত দূত। সকলেই তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হউন।

ইবনে যিয়াদ তাকে মহলের ওপর থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেয়। এভাবে ইমাম হোসাইন (রা.) এর প্রেরিত দূতের শাহাদাত সম্পন্ন হয়। (বেদায়া নেহায়া- ৮: ১৬৮)

**মুসলিম ইবনে আকীলের শাহাদাতের খবর :**

হোসাইনী কাফেলার কাছে হযরত ইমাম মুসলিম ইবনে আকীল ও হানী ইবনে উরওয়াহর শাহাদাতের খবর পৌছেনি। সা'লেবা নামক স্থানে পৌছলে তাদের কাছে উভয়ের শাহাদতের খবর পৌছে। আবদুল্লাহ ইবনে সলিম আসদী ও মুনযির ইবনে মাশয়াল আসদী বর্ণনা করেন- যখন আমরা হজ্বের হুকুম-আহকাম সম্পাদন করলাম তখন আমাদের কাছে ইমাম হোসাইন (রা.) এর কাফেলার সাথে সংযুক্ত হওয়ার আগ্রহই বেশী প্রিয় হয়। দ্রুতবেগে আমরা হোসাইনী কাফেলার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পথিমধ্যে বনী আসাদের এক ব্যক্তির সাথে দেখা হয়। যিনি কূফা থেকে আসছিলেন। তাঁর কাছে আমরা কূফার বিশেষ অবস্থা জানতে পারলাম। তিনি আল্লাহর শপথ করে বলেন- ভাই! ইবনে যিয়াদ হযরত মুসলিম ইবনে আকীল ও হানী ইবনে উরওয়াহকে নির্মমভাবে শহীদ করেছে। এবং হানীর লাশ বাজারে গাছের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে। এ নির্মম অত্যাচারের খবর আমরা ইমাম হোসাইন (রা.) কে পৌছাই। এ খবর শুনে তিনি বেশ কয়েকবার "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন" পড়েন। (বেদায়া নেহায়া- ৮:১৬৮)

আবদুল্লাহ ইবনে সলিম ও মুনযির ইবনে মাশয়াল করজোড়ে মিনতি করলেন- হুজুর! আপনি আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের ও নবী পরিবারের কথা চিন্তা করুন। কূফায় আপনার কোন অনুসারী সাহায্যকারী নেই। আপনি মক্কায় ফিরে যান। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যারাই আপনাকে দাওয়াত দিয়েছে তারাই আপনার প্রমিত শত্রু হবে। হোসাইনী কাফেলার সদস্য আকীল বললেন- আমরা আমাদের ভাই মুসলিম হত্যার বদলা নিবই নিব। আরেকজন বললেন- হুজুর! মুসলিম ও আপনি এক নন। আপনাকে দেখলে কূফাবাসী হয়ত ইবনে যিয়াদকে ছেড়ে আপনার অনুসারী হয়ে বায়াত গ্রহণ করবেন। (বেদায়া নেহায়া- ৮:১৬৯)

যখন ইমাম হোসাইন (রা.) কাফেলা নিয়ে "যরূদ" নামক স্থানে পৌছেন, তখন তাঁর কাছে প্রেরিত





দূতের খবর পৌছে যে, তাকে ইবনে যিয়াদ শহীদ করেছে। এ হৃদয়বিদারক ঘটনা ইমামের কাছে আসলে তিনি কাফেলার সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "কূফায় আমার অনুসারীরা আমার আনুগত্য পরিহার করেছে। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা ফিরে যেতে চাও চলে যাও। এতে আমার পক্ষ থেকে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যেই চাও খুশী মনে চলে যেতে পার।"

তিনি এ ঘোষণা এজন্যই দিলেন যে, চলার পথে অনেক গ্রাম্য লোক তাঁর সঙ্গ ইখতেয়ার করেছিল। তারা প্রকৃত অবস্থা না জেনেই ইমামের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। সম্মুখ মুসিবতে যারা দৃঢ়স্থির থাকতে পারবেনা তাদেরকে বিপদের মুখোমুখি করা ঠিক হবেনা। এ ঘোষণা দেয়ার পর যারা রাস্তায় ইমামের সঙ্গী হয় তাদের অধিকাংশই বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। পরিশেষে ইমামের সাথে তারাই ছিলেন যাদেরকে নিয়ে তিনি মক্কা থেকে বের হয়েছেন।

**হুর ইবনে ইয়াযিদের আগমন :**

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কে গ্রেফতার করার জন্য হুর ইবনে ইয়াযিদকে একহাজার সৈন্য দিয়ে প্রেরণ করা হয়। "কোহে যি হিশাম" নামক স্থানে সে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর সামনে এসে তার গতিরোধ করে। সে তার সকল সৈন্য নিয়ে যোহর ও আসরের নামায ইমাম হোসাইন (রা.)'র ইমামতিতে আদায় করে। আসরের নামাযের পর ইমাম তার উদ্দেশ্যে বলেন- তোমরা অত্যাচারী জালেম এর আনুগত্য ছেড়ে দাও। সত্য ন্যায় নিষ্ঠার পথে আনুগত্য প্রকাশ করো।

তিনি কূফা থেকে আসা চিঠি ও তাদের প্রেরিত প্রতিনিধিদলের বিভিন্ন দরখাস্ত তাকে দেখান। হুর ইবনে ইয়াযিদ বলল- আমরা এসব চিঠি যারা লেখেছে তাদের কাউকে জানিনা ও চিনিনা। আমাদের এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন আপনার সাথে আমাদের দেখা হবে, তখন থেকে ইবনে যিয়াদের কাছে আপনাকে হাজির না করা পর্যন্ত আপনার সঙ্গ যেন না ছাড়ি।

ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন, মৃত্যু এর চেয়ে আরও নিকটে। অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চাইলেন যে, জীবিত হোসাইনকে তার কাছে হাজির করা সম্ভব নয়। এরপর ইমাম হোসাইন (রা.) কাফেলার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন- তোমরা মক্কায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নাও। কিন্তু হুর তার গতিরোধ করে। ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন- তোমার মায়ের অভিসম্পাত কি তুমি চাও? হুর বলল- আপনি ছাড়া আরবের অন্য কেউ হলে আমি এর যোগ্য উত্তর দিতাম। কিন্তু আমি আপনার মায়ের প্রতি সবসময় শ্রদ্ধাশীল।

অনেকক্ষণ তর্কবিতর্কের পর হুর বলল- আপনার সাথে যুদ্ধ করার হুকুম নেই। আমাকে শুধুমাত্র আপনার সঙ্গ না ছাড়ার জন্য বলা হয়েছে। যতক্ষণ না আপনি কূফায় ইবনে যিয়াদের কাছে পৌছেছেন। যদি আপনি চান তবে ইয়াযিদের কাছে পত্র লিখুন, আমি ইবনে যিয়াদের কাছে লেখছি। সম্ভবতঃ আল্লাহ এরই মধ্যে কোন সমাধান বের করে দেবেন। ইমাম হোসাইন (রা.) কাফেলার যাত্রা শুরু করাতে নির্দেশ দেন। কাদেসিয়া ও গদিবের রাস্তার দিকে মোড় নিয়ে যাত্রা করেন। হুর ইবনে ইয়াযিদও তার পিছনে পিছনে চলল। (বেদায়া নেহায়া- ৮:১৭২)

চলতে চলতে সবাই দূরে একজন আরোহী আসতে দেখলেন। সবাই দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষা করলেন। সে এসে ইমাম হোসাইন (রা.) কে সালাম না করে হুর ইবনে ইয়াযিদ ও তার সৈন্যবাহিনীকে সালাম করল। ইবনে যিয়াদের একটি চিঠি তাকে হস্তান্তর করল। চিঠিতে লেখা ছিল- আমার এ দূত যখন তোমার কাছে এ চিঠি নিয়ে পৌছবে, তখন থেকে তুমি ইমাম হোসাইনের ওপর কঠোরতা প্রদর্শন করবে। তাঁকে এমন এক ময়দানে যেতে বাধ্য করবে যেখানে কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং পানি থাকবে না। আমার এ দূতকে বলে দিয়েছি, সে যেন তোমার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে।

**হুসাইনী কাফেলা কারবালার যমীনে :**

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ৬১ হিজরীর মুহাররমের ২ তারিখ বৃহস্পতিবার "নি-নেওয়া" নামক স্থানে পৌছেন। সেখানে তিনি তাঁবু স্থাপন করেন। হুর ইবনে ইয়াযিদও তাঁর সামনা-সামনি তাঁবু স্থাপন করে। যদিও হুর ইবনে ইয়াযিদের অন্তরে আহলে বায়তের ইজ্জত সম্মান ছিল, ইমামের পিছনে নামায আদায় করছিল কিন্তু সে ইবনে যিয়াদের নির্দেশের কাছে মজবুর ছিল। সে ইবনে যিয়াদের জালেম অত্যাচারী পাষন্ড মেজাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল। ইমাম হোসাইন (রা.) এর সাথে কোন প্রকার নম্রতা প্রদর্শন করলে এক হাজার সৈন্যের মধ্যে তা গোপন থাকবে না। এ কারণে হুর ইবনে ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদের হুকুম বরাবর পালন করে যাচ্ছিল। ইমাম হোসাইন (রা.) যে স্থানে শিবির স্থাপন করে তার উদাসীন নির্মম পরিবেশ দেখে জিজ্ঞেস করেন, এ এলাকার নাম কি? লোকেরা বলল, এর নাম কারবালা। তিনি বললেন, এখানেই তাঁবু স্থাপন করো, এটাই আমার শেষ মনযিল।

কারবালায় পৌছেই ইমাম হোসাইন (রা.) এর সামনে বাল্যকালের সব স্মৃতি চোখের সামনে ভাসতে লাগল। হুজুর নবী করিম (দ.) যেসব ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন সবই একটি একটি করে মনে পড়ছে। হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর বর্ণনানুযায়ী একদিন ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সামনে খেলছিলেন। সে সময় হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আপনার উম্মতের একটি দল আপনার এ পুত্র হোসাইনকে কারবালায় শহীদ করবে। জিব্রাঈল হুজুর (দ.) কে সে স্থানের কিছু মাটিও দেন। রাসূলুল্লাহ (দ.) মাটিগুলোর ঘ্রাণ নিয়ে বললেন, এ থেকে তো দুঃখ মসিবতের ঘ্রাণ আসছে। তখন হুজুর নবী করিম (দ.) ইমাম হোসাইনকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন-

يا ام سلمة اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمى ان ابنى قد قتل

হে উম্মে সালমা! যখন এ মাটি রক্ত হয়ে যাবে, তবে তুমি বুঝে নিবে যে, আমার হোসাইন শহীদ হয়েছেন। (আল মু'জামুল কবির, ৩:১০৮)

হযরত উম্মে সালমা (রা.) এ মাটিগুলো একটি বোতলে রেখে দেন। তিনি প্রত্যহ মাটিগুলো দেখতেন এবং বলতেন যেদিন এ মাটি রক্ত হবে সেদিন বড় মসিবতের দিন হবে।

এ ময়দান সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) বলেছেন-

ههنا مناخ ركابهم وموضع رحالهم ومهراق دماء هم فئة من ال محمد ﷺ يقتلون بهذه العرصة تبكى عليهم السماء و الارض

এটা হোসাইন (রা.) ও তাঁর কাফেলার উট বসার স্থান, এটা তার তাঁবুর স্থান। আর এটা তাঁর শাহাদত বরণ করার স্থান। নবী পরিবারের একটি জামাত এ স্থানে শহীদ হবেন যাদের জন্য আসমান যমীনের সবাই কাঁদবেন।

কারবালা ময়দানে যে ইমাম আলী মকাম শাহাদত বরণ করবেন একথা তিনি আগে থেকেই জানতেন। এ কারণে ইমাম এ স্থানে সফরের শেষ স্থান হিসেবে শিবির স্থাপন করেন।

**ওমর ইবনে সা'দের আগমন :**

পরদেশে হোসাইনী কাফেলা কারবালায় শিবির স্থাপন করে। অন্য দিকে ইয়াযিদি হুকুমত এ পবিত্র আত্মাসমূহের সর্বনাশ করার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে।

এ ধারাবাহিকতায় মুহাররম এর ৩ তারিখ ওমর ইবনে সাদের নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট বহর কূফা হতে কারবালায় পৌছে। ইবনে যিয়াদ এ বাহিনীকে দায়লামের জন্য প্রস্তুত করেছিল।





কিন্তু যখন তার সামনে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর বিষয় উপস্থিত হয় তখন সে ওমর ইবনে সাদকে হুকুম দিল তুমি প্রথমে কারবালায় যাও। সেটা শেষ করে পরে দায়লামে চলে যাবে। ওমর ইবনে সাদ ইমাম হোসাইন (রা.) এর ওপর হামলা করতে অস্বীকার করল এবং নিজের পদত্যাগ পত্র পেশ করল। ইবনে যিয়াদ বলল, আমি তোমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করতে পারি তবে এর সাথে আমি তোমাকে সকল দায়িত্ব থেকেও বহিষ্কার করব। ওমর ইবনে সাদ চিন্তা করার জন্য কয়েকদিন সময় চাইল। এ সময় ওমর ইবনে সাদ যার সাথেই পরামর্শ করেন সকলেই তাকে ইমাম হোসাইন (রা.) এর ওপর হামলা করতে নিষেধ করে। তার ভাগিনা হামযা ইবনে মুগিরা বলল- আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি ইমাম হোসাইন (রা.) এর বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত থাকুন। এটা সরাসরি মহান আল্লাহর নাফরমানিতে গণ্য হবে। কিন্তু পরে ইবনে যিয়াদ তাকে হত্যার হুমকি দিলে সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইমাম হোসাইন (রা.) এর দিকে রওনা করে।

**পানি বন্ধ করার নির্দেশ :**

ওমর ইবনে সাদ হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর কাছে একজন দূত প্রেরণ করে জিজ্ঞেস করল- আপনি কেন এ পথে আসলেন? তিনি বললেন- কূফাবাসী আমার কাছে চিঠি লিখেছে যেন আমি তাদের আহবানে সাড়া দিই। যদি এখন তারা আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয় তবে আমি মক্কায় ফিরে যাব। ইবনে সাদ উত্তর শুনার পর বলল- আশা করছি আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইমাম হোসাইন (রা.) এর সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখবেন।

ইবনে যিয়াদের কাছে চিঠি লিখে জানিয়ে দেয়া হয়, কূফাবাসী ইমাম হোসাইনের ওপর অসন্তুষ্ট শুনে তিনি মক্কায় ফিরে যেতে রাজী আছেন। কিন্তু আফসোস! ইবনে যিয়াদ উত্তরে ইমাম হোসাইন ও তাঁর কাফেলার জন্য পানি বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। আর তুমি ইমাম হোসাইনকে বল যেন তিনি ও নবী পরিবারের সবাই যেন আমীরুল মুমেনীন ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়ার হাতে বায়াত গ্রহণ করে। যদি তিনি বায়াত গ্রহণ করলে তবে আমি চিন্তা করব কি করা যায়। এ নির্দেশের পর ওমর ইবনে হাজ্জাজের নেতৃত্বে ইবনে সাদের লোকেরা ইমাম হোসাইন (রা.) এর কাফেলার জন্য পানির সকল রাস্তা বন্ধ করে দেয়া। (বেদায়া নেহায়া- ৮:১৭৫)

হযরত ইমাম হোসাইন ভাই আব্বাস (রা.) এর সাথে বিশজন আরোহী ও বিশজন পদাতিককে পানির জন্য প্রেরণ করেন। ওমর ইবনে হাজ্জাজ তার সাথীদের নিয়ে পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস ও তার সাথীদের প্রতিরোধে পানি নিতে সক্ষম হন। (ইবনে আসীর ৪:৫৪)

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ইবনে সাদের সাথে সাক্ষাত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। ইমাম হোসাইন (রা.) তাঁর অনুসারীদের এবং ইবনে সাদ তার আরোহীদের থেকে আলাদা হয়ে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। তাদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল তা নিয়ে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. কিছু লোকের ধারণা, তারা উভয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সৈন্যবাহিনীকে এখানে রেখে দু'জনই সরাসরি সিরিয়ায় গিয়ে ইয়াযিদের সাথে দেখা করে মীমাংসার পথ বের করবে। এতে ইবনে সাদ বলল- এ রকম কিছু করলে ইবনে যিয়াদ আমার ভিটাবাড়ী বিলীন করে দেবে। ইমাম হোসাইন বললেন- আমি তোমাকে পরিবর্তে আরো সুন্দর ঘর তৈরী করে দিব। ইবনে সাদ বলল- সে আমার সব সহায় সম্পত্তি জব্দ করে নিবে। তিনি বললেন- পরিবর্তে আমি হেজাযে এর চেয়ে বেশী সম্পত্তি তোমাকে দেবো। কিন্তু ইবনে সাদ তা গ্রহণ করতে পারল না।

২. কিছু লোকের ধারণা, তিনি তিনটি প্রস্তাব দেন।

ক. আমরা উভয়েই ইয়াযিদের কাছে যাই।

খ. আমি হেজাযে ফিরে যাই।

গ. তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করতে সরহাদের দিকে রওনা হই।

ওমর ইবনে সাদ এ প্রস্তাবগুলো ইবনে যিয়াদের কাছে লেখে পাঠায়। ইবনে যিয়াদ চিঠি পাঠান্তে কোন প্রস্তাব মানা যায় কিনা চিন্তা করল। এসময় পাষন্ড শিমর ইবনে যি-জোশন দাঁড়িয়ে বলল- আপনি কি এমতাবস্থায় ইমাম হোসাইন (রা.) এর প্রস্তাব মানতে যাচ্ছেন। যখন তিনি আপনার হাতে বন্দী। আল্লাহর শপথ! তিনি যদি আপনার আনুগত্য ব্যতিরেকে চলে যায়, তবে এটিই ভবিষ্যতে আপনার পরাজয়ের কারণ হবে। তাঁকে সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না। হ্যাঁ, ইমাম হোসাইন ও নবী পরিবারের সবই যদি আপনার কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তখন আপনি চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন অথবা মাফও করতে পারেন। আল্লাহর শপথ! আমি তো এও জানি যে, ইমাম হোসাইন (রা.) ও ইবনে সাদ খোশালাপের মধ্যে রাত যাপন করছে।

ইবনে যিয়াদ বলল- তুমি বড় ভাল পরামর্শ দিয়েছ। অতঃপর ইবনে যিয়াদ এ হুকুম দিয়ে কারবালায় শিমরকে প্রেরণ করে যদি ইমাম হোসাইন (রা.) ও তার অনুসারীরা আমার আনুগত্য করে তো ভাল, অন্যথায় ইবনে সাদকে বলো যেন সে ইমাম হোসাইনের ওপর হামলা করে। যদি সে হামলার ব্যাপারে যেহেতু সেহেতু করে তবে তুমি তাকে হত্যা করে সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে নিবে। ইমাম হোসাইনকে হত্যা করার ব্যাপারে নমনীয়তা প্রদর্শনের ওপর ইবনে যিয়াদের পক্ষ হতে কঠোর ভাষায় একটি চিঠিও শিমরের হাতে দেয়া হয়- ইমাম হোসাইন ও তাঁর সাথীরা আনুগত্য প্রকাশ না করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। কেননা, তারা রাষ্ট্রদ্রোহী। (বেদায়া নেহায়া ৮:১৭৫)

শিমর যখন ইবনে যিয়াদের চিঠি নিয়ে ইবনে সাদের কাছ পৌছে তখন সে বলল, হে শিমর! তোমার ঘর বিরাণ হোক। যে কাজ তুমি করেছ তার জন্য তোমার সর্বনাশ হবে। আমার বুঝতে বাকী নাই যে, আমার পাঠানো প্রস্তাবগুলো তোমার কু-পরামর্শের কারণেই ইবনে যিয়াদ গ্রহণ করে নাই। শিমর বলল- এখন তোমার উদ্দেশ্য কি বল? তুমি কি যুদ্ধ করবে নাকি আমার ও তার মাঝখান থেকে সরে পড়বে? ইবনে সাদ বলল- আমি নেতৃত্ব তোমার হাতে দিব না। বরং আমিই বাহিনীর নেতৃত্ব দিব। এ বাহিনী ৯ মুহাররম বৃহস্পতিবার ইমাম হোসাইন (রা.) এর তাঁবুর সম্মুখে অবস্থান নেয়। (বেদায়া নেহায়া ৮:১৭৫)

**একরাতের অবকাশ :**

৯ মুহাররম বৃহস্পতিবার ইমাম হোসাইন নিজ তাঁবুর সামনে তলোয়ারে ভর দিয়ে বসেন। এসময় তাঁর তন্দ্রা এসে যায়। ঐদিকে ইবনে সাদ সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে আসরের নামায আদায় করে হামলা করার জন্য ইমাম হোসাইন (রা.) এর তাঁবুর কাছে চলে আসে। ইয়াযিদ বাহিনীর শোরগোল শুনে ইমাম আলী মকামের বোন হযরত যয়নব এসে তাঁকে জাগিয়ে দেন। তিনি মাথা তুলে বললেন-

انى رأيت رسول اللهﷺ فى المنام فقال لى انك تروح الينا

"স্বপ্নে আমার সাথে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে বললেন- অনতিবিলম্বে তুমি আমাদের কাছে চলে আসবে।"

স্বপ্নের কথা শুনে হযরত যয়নব (রা.) বললেন- হায় মসিবত! ইমাম হোসাইন বললেন, বোন! আফসোস করে নয় বরং ধৈর্য্যধারণ করো, আল্লাহ তোমাদের ওপর দয়া করবেন।

তাঁর ভাই হযরত আব্বাস (রা.) বললেন- তারা তো আপনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি বললেন- তুমি





গিয়ে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তাদের উদ্দেশ্য কি? হযরত আব্বাস (রা.) প্রায় বিশজন আরোহী সাথে নিয়ে তাদের কাছে যান এবং তাদের উদ্দেশ্য জানতে চান। তারা বলল- ইবনে যিয়াদের হুকুম হল- আপনারা তার আনুগত্য করবেন অন্যথায় আমরা যেন আপনাদের সাথে যুদ্ধ করি। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন- দাঁড়াও, এ বিষয়ে আমি ইমাম হোসাইনকে (রা.) অবগত করে আসি। এ বলে হযরত আব্বাস (রা.) সাথীদেরকে সেখানে ছেড়ে দ্রুতগতিতে ইমাম হোসাইনকে অবহিত করেন। তিনি বললেন- তুমি গিয়ে তাদের বলো, তারা যেন আমাদেরকে এক রাতের জন্য অবকাশ দেয়। আমরা মনভরে নামায পড়ব, দোয়া করব এবং আল্লাহর দরবারে ইসতিগফার করব। মহান আল্লাহ জানেন যে, নামায, তেলাওয়াত ও দোয়া ইসতিগফারের সাথে আমার অন্তরের গভীরতা কত।

হযরত আব্বাস (রা.) ইবনে সাদকে বললেন, আমাদেরকে এক রাতের অবকাশ দেয়া হোক। আমরা এ রাতে ইবাদত করতে চাই এবং চিন্তা করে সকালে আমাদের সিদ্ধান্ত তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। ইবনে সাদ এ প্রস্তাব গ্রহণ করল।

**সঙ্গী-সাথীদের প্রতি ইমাম হোসাইনের বক্তব্য :**

ইবনে সাদের সৈন্যরা পিছনে সরে গেলে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) সঙ্গী-সাথীদের একত্রিত করেন। হযরত জয়নুল আবেদীন (রা.) বলেন, আমি অসুস্থ শরীরে পিতা ইমাম হোসাইনের (রা.) পাশে বসি যেন তার বক্তব্য ভালভাবে শুনতে পাই।

মহান আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সৈয়্যদুল মুরসালীন মুহাম্মদ (দ.) এর ওপর দরূদ পাঠ করে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন- "আমি কারো সঙ্গী-সাথীকে আমার সঙ্গী-সাথীর চেয়ে উত্তম ও অনুগত মনে করি না, অন্য কারো পরিবার পরিজনকে আমার পরিবার পরিজনের চেয়ে সৎ ও হিতৈষী মনে করি না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি দৃঢ়ভাবে ধারণা করছি যে, আগামী কালই হবে আমার সাথে শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করার দিন। আমি খুশি মনে তোমাদের সকলকে অনুমতি দিচ্ছি, তোমরা রাতের অন্ধকারে চলে যাও। একজন আহলে বায়তের সাথে তোমাদের একজন একটি করে উট নিয়ে আপন গ্রাম ও শহরে বিক্ষিপ্তভাবে চলে যাও। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মসিবত থেকে রক্ষা করুক। তারা তো শুধু আমাকেই হত্যা করতে চায়। আমাকে হত্যা করতে পারলে তারা অন্য কারো রক্তের পিপাসু হবে না।"

তাঁর আত্মীয় স্বজনরা বললেন- আপনি ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকার অর্থই বা কি? আমাদের কাছে সে দূর্দিন যেন না আসে। যখন আমরা থাকব অথচ আপনি থাকবেন না। এটাই মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের ফরিয়াদ। তিনি বনী আকীলকে সম্বোধন করে বললেন- হে আকীল গোত্রের সন্তানেরা! তোমাদের ভাই মুসলিমের রক্তের বদলা নেওয়াই তোমাদের কর্তব্য কাজ। তোমাদের আমি অনুমতি দিচ্ছি, তোমরা চলে যাও। আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন বনী আকীলের লোকেরা বললেন- শুধু পার্থিব জীবনের স্বার্থে আমরা আমাদের শায়খ নেতা ও শ্রেষ্ঠ সন্তানকে দুঃসময়ে ছেড়ে চলে গেছি, আল্লাহর শপথ! এমন কাপুরুষ আমরা নই। আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজনসহ আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করব ইনশাআল্লাহ। আপনার পরে জীবিত থাকাটাই আমাদের জন্য অসম্ভব। এছাড়া কাফেলার সকলেই একে একে সবাইর এক কথা। আমরা আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করেই আমরা আমাদের ফরয আদায় করতে চাই। (বেদায়া নেহায়া ৮:১৭৬)

ইমাম হোসাইন (রা.) বক্তব্য শেষ হলে কাফেলার সকলেই নফল নামায, দোয়া, ইসতিগফারের মধ্য দিয়ে রাত অতিবাহিত করেন। (ইবনে আসীর ৪:৫৯, বেদায়া নেহায়া ৮:১৭৭)

**৬১ হিজরীর ১০ মুহাররম : দ্বিতীয় এক কিয়ামত**

১০ মুহাররম রক্তিম সূর্য রক্ত নেশায় উদিত হলো। ওমর ইবনে সাদ তার বাহিনী নিয়ে ফজর নামাযের পর যুদ্ধের পুরো প্রস্তুতি নিয়ে নিল। অন্যদিকে হোসাইনী কাফেলার মাত্র ৭২ জন জীবন উৎসর্গকারী বিশাল ইয়াযিদী বাহিনীর মুকাবিলায় কারবালার ময়দানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। ৭২ জনের মধ্যে ৩২ জন অশ্বারোহী আর ৪০ জন পদাতিক। ইমাম হোসাইন ডান পাশে যোহাইর ইবনে কায়স এবং বাম পাশে হাবিব ইবনে মুযাহিরকে দাঁড় করিয়ে দেন। ভাই হযরত আব্বাসের (রা.) হাতে পতাকা তুলে দেন। নারীদের অবস্থান

তাঁবুর পশ্চাতে করে দেন। তাঁর নির্দেশে সঙ্গী-সাথীরা রাতেই তাঁবুর পিছনে পরিখা খনন করেন। যাতে পশ্চাদ পথে কেউ নারীদের ওপর হামলা করতে না পারে। (বেদায়া নেহায়া- ৮:১৭৮)

এরপর ইমাম হোসাইন পবিত্র কুরআন নিয়ে রাব্বুল আলামিনের দরবারে দু'হাত তুলে দেন। হে আল্লাহ! সব মসিবতে তুমিই আমার রক্ষক, তুমিই সকল দুঃখে আমার ভরসা, সব বিপদে তুমিই আমার সাহায্যকারী। অনেক দুঃখ এমন হয় যাতে অন্তর ভেঙ্গে যায়, উত্তোরণের উপাদান অপ্রতুল হয়, আপনজনরা সঙ্গ ছাড়ে আর শত্রুরা খুশী হয়। কিন্তু আল্লাহ এমন সব মসিবতে আমি শুধু তোমারই সান্নিধ্য চেয়েছি, মনের বেদনা তোমাকেই জানিয়েছি, তোমাকে ছাড়া কাউকে মনের কথা বলতে ইচ্ছা হয় না। প্রভূ! তুমিই আমার দুঃখ মসিবত লাঘব করেছ। তুমিই নেয়ামতদাতা, তুমিই মালিক। তুমিই আমার সব।

**ইতমামে হুজ্জাত :**

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ইয়াযিদ বাহিনীর পাশে এসে জোর আওয়াজে বললেন, হে লোকেরা! আমি তোমাদের নসীহত করছি, মনোযোগ দিয়ে শুন। তাদের সকলেই নিশ্চুপ ইমামের কথা শুনতে লাগলেন। তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন- যদি তোমরা আমার আবেদন শুন এবং ইনসাফ কর তোমাদের জন্য মঙ্গল। আর তোমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ আমার জন্য বৈধ নয়। যদি আমার আবেদন গ্রহণ না কর, তবে মহান আল্লাহর এ বাণীটি শোন-

فاجمعوا امركم و شركائكم ثم لايكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الى و لاتنظرون

"তোমরা ও তোমাদের শরীকরা সকলেই মিলে নিজেদের কর্তব্য ঠিক করে নাও। যেন তোমাদের সেই কর্তব্যের ব্যাপারে কারো কাছে অস্পষ্ট না থাকে। অতঃপর আমার বিরুদ্ধে তোমাদের ফায়সালা সম্পাদন করো। আর আমাকে কোন সুযোগ দিও না।"

[উল্লেখ্য, হযরত নূহ (আ.) তাঁর কওমের ওপর নিরাশ হয়ে এ আবেদন করেছিলেন ]

এরপর হযরত ইমাম হোসাইন সূরা আরাফের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন-

ان ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين

"নিশ্চয় আমার সাহায্যকারী আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আর তিনি পূণ্যবানদের সহায়।"

তাঁবুতে অবস্থানরত মহিলারা যখন এ তেলাওয়াত শুনলেন তখন সকলেই কেঁদে দিলেন। তিনি তাঁর ভাই আব্বাস (রা.) কে তাঁবুতে পাঠালেন। তিনি এসে তাঁদেরকে শান্ত করলেন। অতঃপর ইমাম হোসাইন (রা.) ইয়াযিদ বাহিনীর প্রতি নিজের হাসব নসব ও মান মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে বললেন- আমার মত কাউকে হত্যা করা তোমাদের জন্য শোভা পায় কিনা চিন্তা করো, আমি তোমাদের নবী (দ.) এর প্রাণের টুকরো মা ফাতেমার (রা.) ছেলে। আমি ছাড়া পুরো যমীনে নবীজির আর কোন দৌহিত্র জীবিত নেই। হযরত আলী (রা.) আমার পিতা, জাফর তৈয়্যার (রা.) আমার চাচা, হযরত আমীর হামযা (রা.) আমার





পিতার চাচা। সর্বোপরি, হুযুর নবী করিম (দ.) আমি ও আমার ভাই সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন- هذان سيدا شباب اهل الجنة "এরা দুইজন জান্নাতের সকল যুবকেদের সর্দার।" তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করো। আল্লাহর শপথ! মিথ্যাবাদীর ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তোমরা নবীজির প্রিয় সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, আবু সাঈদ খোদরী, যায়েদ ইবনে আরকম ও আনাস ইবনে মালিকের কাছে জিজ্ঞেস করো, তারা সকলেই এ হাদীসটি সত্যায়িত করবেন। আফসোস হয় তোমাদের ওপর, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না? আমার এসব কথার মধ্যে কোনটি কি রক্তপাত বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট নয়?

অতঃপর তিনি বললেন- হে লোকেরা! আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। আমি কোন নিরাপদ স্থানে চলে যাব। তারা বলল- ইবনে যিয়াদের কথা শুনতে আপনার অসুবিধা কোথায়? এতে ইমাম হোসাইন (রা.) নাউযুবিল্লাহ বলে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন-

انى عذت ربى و ربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب

"আমি সেসব অহংকারী যারা কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান রাখে না তাদের থেকে সকলের প্রভূর কাছে মুক্তি চাই।"

অতঃপর তিনি নিজের বাহন থেকে নেমে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা কি কোন রক্তের বদলা নিতে চাও? না আমি তোমাদের সম্পদ নষ্ট করেছি, না কাউকে রক্তাক্ত করেছি যার প্রতিশোধ তোমরা আমার কাছে নিতে চাও! কিন্তু তারা কোন উত্তর দিল না। এরপর তিনি নাম ধরে বললেন, হে শীস ইবনে রবী, হে হেজায ইবনে জবর, হে কায়স ইবনে আশয়াস, হে যায়েদ ইবনে হারেস তোমরা কি আমার কাছে এ বলে চিঠি লেখনি যে, আমাদের ফল পেকেছে, আমাদের বাগানগুলো ফুলে-ফলে ভরা, আপনি ভরা মৌসুমে তাশরীফ আনুন। আপনি এক প্রত্যয়ী সৈন্যবাহিনীর কাছে আসবেন। উত্তরে তারা বলল, আমরা তো কোন চিঠি লিখি নাই। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! তোমরা অবশ্যই লেখেছ। অতঃপর তিনি বললেন, হে লোকেরা! যখন তোমরা আমার ওপর অসন্তুষ্ট তবে আমার রাস্তা ছেড়ে দাও, আমি দূরে কোথাও চলে যাব। কায়স ইবনে আশয়াস বলল- "আপনি জ্ঞাতি ভাই ইবনে যিয়াদের নির্দেশ কেন মানছেন না। তিনি আপনার কোন ক্ষতি করবেন না। আপনি যা-ই চাইবেন, তিনি তা-ই করবেন।" ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন- তুমি তো সেই ভাইয়ের ভাই যে মুসলিম ইবনে আকীলকে প্রতারণার মাধ্যমে ইবনে যিয়াদের কাছে সোপর্দ করেছিল। তোমরা কি চাও যে, বনূ হাশেম তোমাদের কাছে মুসলিম ইবনে আকীল ছাড়া অন্য কারো রক্তের বদলা অন্বেষণ করুক? না আল্লাহর শপথ! আমি অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পন করব না। আর এমন কোন গুনাহ স্বীকার করতে পারব না যা আমি করি নাই। (বেদায়া নেহায়া- ৮:৯৭১)

**হুরের তাওবা :**

যখন ওমর ইবনে সাদ যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল তখন হুর ইবনে ইয়াযিদ বলল- আল্লাহ তোমাকে হেদায়ত করুক। সত্যিই তুমি কি তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছ? সে বলল- হ্যাঁ, যাচ্ছি। হুর বলল- তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কিছুই কি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি? ইবনে সাদ বলল- আল্লাহর কসম! যদি আমার কাছে ইখতিয়ার থাকত তবে অবশ্যই আমি কিছু করতাম। কিন্তু তোমাদের আমীর তো মানছেনা। এটা শুনামাত্র হুরের শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়। তার এ অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে এক ভাই বলল- ভাই! আজ তোমার এমন অবস্থা কেন? তোমার এমন অবস্থা অন্য কোন যুদ্ধে তো দেখি নাই। তুমি কূফার একজন বীর বাহদুর। উত্তরে হুর বলল- আমার একপাশে জান্নাত আরেক পাশে দোযখ। আমি চিন্তা করছি, দোযখে থাকব না জান্নাতে যাব। কিছুক্ষণ পর বলল- আমার তো জান্নাতই চাই।

এতে আমাকে খন্ড বিখন্ড করা হোক কিংবা জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া হোক। একথা বলতে না বলতে সে ইমাম হোসাইন (রা.) এর শিবিরে চলে যায়।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শিবিরে হাজির হয়ে সে নিবেদন করল হে নবীজির নয়নের দুলালি। আমার জীবন আপনার জন্য কুরবান হোক, আমি সেই পাপাচারী যে আপনাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে। মহান আল্লাহর শপথ! যদি আমি জানতাম যে, এ লোকেরা আপনার সাথে এহেন অসদাচরণ করবে তবে আমি কখনও তাদের সঙ্গ দিতাম না। আমি আমার কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত। আল্লাহর কাছে তওবা করছি এবং আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমার তওবা কি কবুল হবে? তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমার তওবা গ্রহণ করবেন এবং মাফ করবেন। বল তোমার নাম কি? সে বলল- আমি হুর ইবনে ইয়াযিদ। তিনি বললেন- ইনশাআল্লাহ তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তই থাকবে। [আরবীতে 'হুর' শব্দের অর্থ হল স্বাধীন, মুক্ত] ঘোড়া থেকে নেমে এসো। সে বলল- না, হুযুর প্রথমে এ জালিমদের সাথে লড়ে নিজের জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ করি। তবে তোমার যা ইচ্ছা করো, আল্লাহ তোমার ওপর মেহেরবান হোন। (তাবারী ৬: ৩১)

**কুফাবাসীদের প্রতি হুরের ভাষণ :**

হুর ইবনে ইয়াযিদ ইমাম হোসাইন (রা.) এর জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তিনি কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে কুফাবাসী! তোমরাই তো ইমাম হোসাইনকে (রা.) দাওয়াত দিয়েছ। এখন তোমরা তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে চাও। তোমরাই তো বলেছিলে আমরা আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করব। এখন উল্টো তাঁকেই হত্যা করতে চাও। তোমরা তাকে আল্লাহর সেই প্রশস্ত জমিনে স্বাধীনভাবে চলতে বাধা দিচ্ছ, যেখানে পশু-পাখি মুক্তভাবে চলতে কোন বাধা নেই। যে ফোরাত থেকে প্রতিনিয়ত কুফার শূকর-কুকুর পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করছে তোমরা সেই ফোরাত তাঁর জন্য অবরুদ্ধ করেছ। হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর পরে তোমরা তাঁর বংশধরের ওপর বড় অসদাচরণ করছ। তোমরা যদি এ জঘন্য অন্যায় থেকে বিরত না হও তবে সেদিনকে ভয় কর যেদিন কঠিন পিপাসায় কাতর হয়ে হাশরের ময়দানে ছটফট করবে।

ইবনে সা'দের পদাতিক সৈন্যরা তার ওপর অজস্র তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলে তিনি ফিরে ইমাম হোসাইন (রা.) এর কাছে চলে আসেন। (বেদায়া নেহায়া- ৮:১৮০)

হুর ইবনে ইয়াযিদ ফিরে আসার পর ইবনে সাদ পতাকা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। সে প্রথমে একটি তীর নিক্ষেপ করে বলল- তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী। এভাবেই যুদ্ধ শুরু হয়। উভয় দলের সিপাহীরা নিজ নিজ বীরত্ব প্রদর্শন করতে শুরু করে। (তাবারী- ৬:৩১)

"মুবারাযা" যুদ্ধে (উভয় দল হতে একজন করে যোদ্ধা লড়াই করবে) ইমাম হোসাইনের যোদ্ধাদের পাল্লা ভারী দেখলে, ইয়াযিদ কাফেলায় যৌথভাবে হামলা করার সিদ্ধান্ত হয়।

শিমর ইবনে যি-জোশন ছিল ইয়াযিদ বাহিনীর বাম ডিভিশনের প্রধান। সে ইমাম হোসাইনের বাম ডিভিশনের ওপর হামলা করে। সাথে সাথে চারিদিক থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইমাম হোসাইনের সর্বমোট বত্রিশজন আরোহী সৈন্য তারপরও তাদের প্রাণপণ লড়াইয়ে ইয়াযিদ বাহিনীর সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। গররাহ ইবনে কায়স ইয়াযিদী অশ্বারোহী সৈন্যের লিডার যখন দেখল যে, তার বাহিনীর সৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাচ্ছে, তখন সে আব্দুর রহমান ইবনে হুসেনকে ইবনে সাদের কাছে পাঠায়। আপনি দেখছেন যে, ইমাম হোসাইনের গুটিকয়েক সৈন্যরা আমাদের সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে। দেরী না করে আমাদের সাথে কিছু পদাতিক সৈন্য দেয়া হোক। ইবনে সাদ গাররাহর পরামর্শক্রমে শীষ





ইবনে রবীকে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সে আমতা আমতা করল। পরে হুসেন ইবনে নোমাইরকে ডেকে তার সাথে কিছু অশ্বারোহী ও পাঁচশ তীরন্দাজ পাঠায়। এ তীরন্দাজরা ইমাম হোসাইন (রা.) এর বাহিনীর ওপর বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করে ইমাম হোসাইনের অশ্বারোহী সৈন্যদের ঘোড়াগুলোকে আহত করে দেয়। পরে তারা ঘোড়া থেকে অবতরণ করে প্রাণপণ লড়তে থাকে। (ইবনে আসীর- ৪:৬৮)

**হুসাইনী তাঁবুতে অগ্নিসংযোগ :**

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) তাঁবুগুলো এভাবে সাজিয়েছেন যেন ইয়াযিদ বাহিনী একদিক ছাড়া অন্য কোন প্রান্ত হতে যুদ্ধ করতে না পারে। ইবনে সাদ প্রত্যেক প্রান্ত থেকে যুদ্ধ করতে সুবিধার জন্য তাঁবু উচ্ছেদের নির্দেশ দেয়। যখন ইয়াযিদ বাহিনী পিছন থেকে তাঁবু উচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হয় তখন হুসাইনী বাহিনীর দু'য়েকজন আত্মোৎসর্গী যোদ্ধা পিছনে এসে তাদের তলোয়ার ও তীরের মাধ্যমে ধাওয়া করে। এতেও ইবনে সাদ অকৃতকার্য হয়ে তাঁবুগুলো জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়। তাঁবু জ্বলতে দেখে ইমাম হোসাইন তাঁর বাহিনীকে বললেন- তাঁবু জ্বলতে দাও, তারপরও যেন ইয়াযিদ বাহিনী চারদিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে সে ব্যবস্থা করো।

পাপিষ্ট শিমর যে তাঁবুতে আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর পর্দানশীন মেয়ে ও ছোট শিশুরা ছিলেন সে তাঁবু লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন- হে যি-জওশনের বেটা! তুমি আহলে বায়তে রাসূলকে (দ.) আগুনে জ্বালাতে চাও, আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবে। শিমরের সাথীদের মধ্যে হামীদ ইবনে মুসলিম শিমরকে নারীদের ওপর হামলা না করার জন্য বলল। কেননা, এটা কাপুরুষের কাজ। তোমার মত যোদ্ধাদের এমন গর্হিত কাজ মানায় না। পরে শীস ইবনে রবী বারণ করলে সে তাঁবু আক্রমণ করা হতে বিরত থাকে। (ইবনে আসীর- ৪:৬৯)

**হযরত আলী আকবরের (রা.) শাহাদাত :**

আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর সদস্য ছাড়া যখন অন্যরা শাহাদাত বরণ করেন। তখন ইমাম হোসাইন (রা.) এর ১৮ বছর বয়সী বড় ছেলে হযরত আলী আকবর (রা.) যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হন। তিনি এ কবিতাটি পাঠ করতে করতে শত্রুদের ওপর হামলা শুরু করেন।

انا علی بن الحسین بن علی + نحن و بیت الله اولی بالنبی

تالله لایحکم فینا ابن الداعی + کیف ترون الیوم سنری عن ابی

অর্থাৎ, আমি ইমাম হোসাইনের পুত্র, হযরত আলীর নাতি। আল্লাহর শপথ! হারামজাদা ইবনে যিয়াদ আমাদের ওপর শাসন করতে পারবে না। তোমরা দেখবে আমি কিভাবে আমার পিতার পক্ষে যুদ্ধ করি। (বেদায়া নেহায়া- ৮:১৮৫)

হযরত আলী আকবর (রা.) হাতে তলোয়ার নিয়ে ইয়াযিদ বাহিনীকে গাজর-মুলার মত কাটতে লাগলেন। ইমাম হোসাইন (রা.) নিজের জোয়ান ছেলে হযরত আলী আকবর (রা.) এর বীরত্ব নিজ চোখে দেখার জন্য চেষ্টা করলেন কিন্তু ইয়াযিদ বাহিনীর চতুর্মুখী আক্রমণে তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু ইমামের বুঝতে কষ্ট হল না যে, যেদিকে ইয়াযিদ বাহিনী পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাচ্ছিল সেখানেই হযরত আলী আকবর (রা.) শত্রুদের বধ করে যাচ্ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে একা অনেকক্ষণ ধরে হযরত আলীর (রা.) এ পৌত্র নবীজির প্রপৌত্র হায়দারী মহিমায় ইয়াযিদিদের জাহান্নামে পৌছাতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু লড়তে লড়তে যখন তাঁকে পিপাসায় কাতর করে দেয় তখন এক ঢোক পানির জন্য তাঁবুতে এসে বললেন-

বাবাজান! যদি এক ঢোক পানি হয়, তবে পুনরায় বীরদর্পে শত্রুদের বধ করতে পারব। ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন- পানি তো নাই বাবা, তুমি আমার শুষ্ক জিহবাটা চোষে নাও। তাতে হয়ত তোমার সামান্য পিপাসা নিবারণ হবে। হযরত আলী আকবর ইমাম হোসাইনের শুস্ক জিহবা চোষে পুনরায় বীরদর্পে ইয়াযিদি বাহিনীর সাথে লড়াই শুরু করেন। অসংখ্য তীরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে পরিশেষে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। একটি তীর তাঁর বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। ঘোড়া থেকে তিনি যখন ঢলে পড়ে যাচ্ছিলেন, তখন বললেন- يا ابتاه ادركنى "বাবাজান! আমাকে রক্ষা করুন।"

ইমাম হোসাইন দৌড়ে গিয়ে পুত্র আলী আকবরকে জড়িয়ে ধরেন। বাবাকে মনভরে দেখে পুত্র বললেন- তীরটি বের করে নিন। আমি পুনরায় লড়তে চাই। লাবন্যময় উজ্জ্বল চেহারায় রক্তের বন্যা তাঁকে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় সাহসী দেখাচ্ছিল। পুত্রের এ অবস্থা দেখে ইমাম হোসাইন তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। নিজের প্রাণপ্রিয় পুত্র তাঁর বুকেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)

পুত্র আলী আকবর যখন শাহাদত বরণ করেন তখন ইমাম হোসাইন (রা.) এর বয়স ছিল ৫৬ বছর পাঁচ মাস পাঁচ দিন। এ বয়সে তার একটি চুল ও একটি দাঁড়িও সাদা হয়নি। কিন্তু নিজের বুকে পুত্র আলী আকবরের শাহাদত তাঁর কাছে এত বেশী বেদনাদায়ক ছিল যে, যুদ্ধের ময়দান হতে তাঁবুতে আসতে আসতে স্বল্প সময়ে তাঁর মাথার চুল ও দাঁড়ি সাদা হয়ে যায়।

**হযরত কাসেম ইবনে হাসানের (রা.) শাহাদাত :**

হযরত কাসেম ইবনে হাসান (রা.) ইমাম হাসান (রা.) এর পুত্র, ইমাম হোসাইন (রা:) এর ভাতিজা। তাঁর সাথে ইমাম হোসাইন (রা.) এর মেয়ে সকীনার সাথে বিবাহ বন্ধনের কথাও চূড়ান্ত ছিল। কিন্তু কারবালায় যখন আহলে বায়তে রাসূল (দ.) একজন একজন করে শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করছিলেন তখন হযরত কাসেম ইমাম হোসাইন (রা.) এর কাছে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। বেটা আমি তোমাকে কি করে অনুমতি দিই? তুমি তো ইমাম হাসানের (রা.) নিদর্শন, তাঁর বংশের চেরাগ। হযরত কাসেম কিন্তু নাছোড় বান্দা। চাচাকে বারবার অনুরোধ করলেন। আমাকে এমন সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমিও শহীদ হতে চাই। ইমাম হোসাইন (রা.) তাঁর আকুতি দেখে চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে তাঁকে অনুমতি দিলেন।

যুদ্ধের ময়দানে হযরত কাসেম (রা.) খুব বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। অনেক ইয়াযিদীকে জাহান্নামে পাঠালেন। হযরত কাসেম ইবনে হাসান (রা.) যুদ্ধের ময়দানে তলোয়ার হাতে ব্যাঘ্রশাবলের ন্যায় শত্রুদের ওপর ঝাপিয়ে পড়েন। ওমর ইবনে সাদ তার মাথার ওপর তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে। সাথে সাথে তিনি "ওহে চাচাজান!" বলে যমীনে লুটিয়ে পড়েন। ভাতিজার ডাক শুনামাত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) আহত বাঘের ন্যায় ইবনে সাদের ওপর আক্রমণ করেন। এতে তার হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আহত অবস্থায় সে যখন পলায়ন করে তখন ঘোড়ার পায়ের আঘাতে পৃষ্ঠ হয়। হযরত ইমাম হোসাইন ভাতিজা কাসেমের (রা.) সামনে এসে দাঁড়ান। আর ভাতিজা চটপট করছেন। এভাবে তিনিও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর কোলে শাহাদত বরণ করেন। তিনি বললেন- যে জাতি তোমাকে শহীদ করল, কাল কিয়ামতে আল্লাহর রহমত থেকে তারা দূরে থাকবে। তারা কিয়ামতের দিন তোমার মাতামহকে কী উত্তর দিবে? তোমার চাচার জন্য এটাই বড় কষ্টের, যে তুমি ডেকেছ অথচ, সে কিছুই করতে পারল না। আল্লাহর শপথ! তোমার চাচার শত্রু বেশী, সহযোগী কম।

এরপর ইমাম হোসাইন (রা.) তাঁকে বুকে ধরে আলী আকবর ও অন্যান্য শহীদদের পাশে শোয়ায়ে দিলেন। এ পর্যন্ত হযরত আলী আকবর, আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে আকীল, আবদুল্লাহ ইবনে





জাফরের দু'ছেলে আউন ও মুহাম্মদ, আকীল ইবনে আবু তালেবের দু'ছেলে আবদুর রহমান ও জাফর এবং কাসেম ইবনে হাসান শাহাদাত বরণ করেন।

**হযরত আলী আসগরের শাহাদাত :**

নবী পরিবারের একজন একজন করে শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করতে যাচ্ছেন। আপন প্রভূর ফায়সালার ওপর সকল মুসিবত ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে মোকাবেলা করছেন। এমন সময় তাঁর কোলে পরিবারের সবচেয়ে ছোট ছেলে হযরত আবদুল্লাহ আলী আসগরকে তাঁর কোলে দেয়া হয়। তিনি তাঁকে মমতায় চুম্বন করছিলেন এমন সময় বনূ আসাদের ইবনে মুকেদুন্নার তীরের আঘাতে আলী আসগরকে ইমাম হোসাইনের (রা.) কোলেই শহীদ করে দেয়। তিনি পুত্রের রক্ত নিয়ে আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে বলেন- যদি তুমি আসমানী ফায়সালায় আমার বিজয় ও সাহায্য বন্ধ করে থাক, তবে সেটাই কর যা তোমার কাছে মঙ্গল। আর যালেমদের থেকে আমার বদলা নিও। (বেদায়া নেহায়া- ৮:১৮৬)

আরেক বর্ণনা মতে, হযরত আলী আসগর কারবালার ময়দানেই জন্মলাভ করেন। জন্মের পরে তাঁকে ইমামের কোলে দেয়া হয়। তিনি পুত্রকে কোলে নিয়ে কানে আযান দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় শত্রুর তীর তার গলায় বিদীর্ণ হয়। ইমাম হোসাইন (রা.) এ নবজাতকের রক্তে রঞ্জিত দু'হাত তুলে ফরিয়াদ করে বলেন- বাবা! তুমি আল্লাহর কাছে হযরত সালেহ (আ.) এর উষ্ট্রীর চেয়ে বেশী প্রিয়। আর হযরত মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর নিকট হযরত সালেহ (আ.) হতে অনেক বেশি প্রিয়। হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাদের থেকে সাহায্যের পথ বন্ধ করে দাও, তবে সেটিই কর যাতে মঙ্গল নিহিত আছে। (তাবারী- ৬:৩১)

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, সে সময়ে হযরত আলী আসগরের বয়স ৬ মাস ছিল। তিনি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লে ইমাম হোসাইন তাঁকে নিয়ে ইয়াযিদ বাহিনীর কাছে পানি যাঞ্চা করেন। কিন্তু তারা পানির বদলে তীর নিক্ষেপ করে। ইমাম হোসাইনের আত্মসম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদা বোধ এ বর্ণনাটি গ্রহণ করতে অনুমতি দেয় না। যে ইমাম নিজের সামনে ইসলামের জন্য নিজের সবকিছু কুরবানী দিচ্ছেন তিনি পুত্রের জন্য ইয়াযিদ বাহিনীর কাছে পানি ভিক্ষা চাইবেন এটা মেনে নেয়া যায় না। তাঁর পানির দরকার হলে ইয়াযিদ বাহিনীর কাছে ভিক্ষা চাওয়ার প্রয়োজনই বা কি? তিনি ফোরাত নদীকে ইশারা করলে তাঁর কদমে এসেই হাজির হত। আকাশে হাত উঠালে মুষলধারে বৃষ্টি হত। যদি হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর বেটা হযরত ইসমাঈলের (আ.) পায়ের আঘাতে যমযম ফোয়ারা বের হতে পারে তবে সৈয়্যদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর বেটা ইমাম হোসাইন (রা.) এর পায়ের আঘাতে কেন কারবালায় ফোয়ারা হতে পারবে না। তিনি যদি পানির জন্য কারবালার মরুভূমিতে পায়ে আঘাত করতেন তবে একটি কেন হাজারো ফোয়ারা বের হয়ে পড়ত। কিন্তু এটা মকামে ইমতিহান (পরীক্ষার পর্যায়) ছিল। তাই তিনি ধৈর্য্যের সাথে সকল মুসিবত মোকাবেলা করেছেন। এভাবে সত্য ও মিথ্যার এ যুদ্ধে তার অন্যান্য ভাই যথা হযরত আবুবকর, আব্দুল্লাহ আব্বাস, ওসমান, জাফর ও মুহাম্মদ (রা.) শাহাদাত বরণ করেন।

**হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত :**

আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর সদস্যরা এক এক করে শহীদ হলে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) যুদ্ধের ময়দানে আসার মনস্থির করেন। অসুস্থ হযরত জয়নুল আবেদীন ইমাম হোসাইন (রা.) এর পাশে এসে বললেন- বাবাজান! আমি বেঁচে থাকতে আপনি যুদ্ধের ময়দানে যাবেন এটা আমি সহ্য করতে পারছিনা। আমিও ভাইদের ন্যায় শাহাদত বরণ করে মাতামহের সাথে দেখা করতে চাই। শাহাদতের অমৃত সুধা পান করার সময় এখন আমারই। ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন- বৎস! তুমি যুদ্ধের ময়দানে যেতে পার

না। নবী পরিবারের সকল সদস্য তো শাহাদত বরণ করেছে। এখন তুমিও যদি শহীদ হয়ে যাও, তবে তোমার মাতামহদের বংশধারা বন্ধ হয়ে যাবে। তোমার নানার বংশধর বাকী থাকার জন্যই তোমাকে বাঁচতে হবে। এ বলে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) নিজেই যুদ্ধের ময়দানে বের হয়ে যান। শেরে খোদা হযরত আলী (রা.) এর যোগ্যপুত্র তলোয়ার নিয়ে যেদিকে অগ্রসর হন ইয়াযিদবাহিনী ভীত মেষের ন্যায় পলায়ণ করতে থাকে। অনেক ইয়াযিদিকে জাহান্নামে পাঠিয়ে তিনি অবশেষে পিপাসায় কাতর হয়ে ফোরাত নদীর দিকে মুখ করেন। এ সময় হঠাৎ শত্রু পক্ষের একটি তীর তাঁর চেহারা বিদীর্ণ করে। তিনি তীরটি যখন টেনে বের করেন তখন তাঁর দু'হাত রক্তে ভরে যায়। তিনি রক্তমাখা হাতযুগল আকাশের দিকে উঠিয়ে মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলেন- হে আল্লাহ! দেখ, তোমার প্রিয় রাসূলের দৌহিত্রের সাথে এ কি আচরণ করা হল! (তাবারী- ৬:৩৩)

এ সময় শিমর ইবনে যি-জাওশন ১০ জন সৈন্য সাথে নিয়ে হযরত ইমাম হোসাইনের তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়। তাদেরকে দেখে ইমাম হোসাইন ফোরাত নদীতে না গিয়ে তাঁবুর দিকে ফিরলেন কিন্তু পথিমধ্যে শিমর ও তার সাথীরা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইমাম হোসাইন বললেন- আফসোস! যদিও তোমার কোন ধর্ম নেই, কিয়ামত দিবসকে ভয় করনা, অন্ততঃ পশু না হয়ে একজন মানুষ হও। নিজের লম্পটদের আমার পরিবারের মেয়েদের ওপর নির্যাতন করা থেকে বিরত রাখ। শিমর বলল, "হে ফাতেমার পুত্র! আপনার এ আবেদন রক্ষা করা হল।" (বেদায়া নেহায়া ৮:১৮৭)

আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার থেকে বর্ণিত আছে, ইয়াযিদ বাহিনী যখন ইমাম হোসাইন (রা.) কে অবরুদ্ধ করে রাখে তখন তিনি তাদের ডান ডিভিশনের ওপর আক্রমণ করলে তারা প্রাণভয়ে পালাতে থাকে। আল্লাহর কসম! আমি চরম দুঃসময়ে এমন স্থির দৃঢ়প্রত্যয়ী বীর পুরুষ আগে কখনও দেখিনি। (বেদায়া নেহায়া ৮:১৮৮)

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) অনেকক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইয়াযিদ বাহিনীর লোকেরা চাইলে মুহূর্তেই তাঁকে শহীদ করতে পারত কিন্তু কেউ ইমাম হোসাইনকে (রা.) হত্যা করে এত বড় গুনাহের ভার মাথায় নিতে রাজি হচ্ছিল না। শেষে শিমর বলল- তোমরা কিজন্য অপেক্ষা করছো? কাজ শেষ করো। ইমাম হোসাইন (রা.) তাদেরকে বললেন- তোমরা কি আমাকে হত্যা করার জন্য একে অপরকে উৎসাহিত করছো? আল্লাহর কসম! আমাকে হত্যা করলে মহান আল্লাহ যতবেশি অসন্তুষ্ট হবেন অন্য কাউকে হত্যা করলে তত অসন্তুষ্ট হবেন না। (ইবনে আসীর- ৪:৭৮)

শিমরের উসকানিতে ইয়াযিদ বাহিনীর সৈন্যরা চারদিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। যরআ ইবনে শরীক তামীমী সামনে এসে ইমাম হোসাইনের (রা.) গর্দানের বামদিকে তলোয়ার দিয়ে জোরে আঘাত করে। এতে তিনি বেসামাল হয়ে যান। এরপর সেনান ইবনে আবু আমর ইবনে আনস নাখয়ী তীর নিক্ষেপ করলে ইমাম মাটিতে লুঠিয়ে পড়েন। সেনান ঘোড়া থেকে নেমে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কে যবেহ করে তাঁর মাথা মুবারক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে খোলি ইবনে ইয়াযিদকে হস্তান্তর করে। (বেদায়া নেহায়া ৮:১৮৮)

অন্য বর্ণনা মতে, হযরত ইমাম হোসাইনকে (রা.) শিমরই শহীদ করে। (বেদায়া নেহায়া ৮:১৮৮)

বর্বর ইয়াযিদ বাহিনীর পাষন্ডরা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শরীরের কাপড় পর্যন্ত খুলে নেয়। কায়স ইবনে আশয়াস জামা, বাহার ইবনে খালেদ জুতা, আমর ইবনে ইয়াযিদ পাগড়ি, ইয়াযিদ ইবনে শাবল চাদর, সেনান ইবনে আনস নাখয়ী বর্ম ও তলোয়ার ছিনিয়ে নেয়।

ইমামের নিথর দেহ থেকে সব কাপড় ছিনিয়ে নেয়ার পরও এ পশুদের হিংস্রতা থামেনি। তাঁর পবিত্র শরীর মুবারককে ঘোড়ার খুরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে। এরপর তারা তাঁবুতে প্রবেশ করে নবী





পরিবারের সব মালামাল ছিনতাই করে। (তাবারী ৬:৩৩)

যখন ইমাম হোসাইন (রা.) শহীদ হন তখন তার পবিত্র শরীরে ৩৩টি তীরের আঘাত ও ৩৪টি তলোয়ারের আঘাত পাওয়া যায়। শিমর অসুস্থ হযরত জয়নুল আবেদীনকে হত্যা করতে চাইলে তার সাথী হামিদ ইবনে মুসলিম বাধা দেয়। অতঃপর ওমর ইবেন সাদ এসে ইয়াযিদি বাহিনীকে সতর্ক করে দেয় যেন তারা নারীদের ওপর কোন নির্যাতন না করে। আর যারা মালামাল ছিনতাই করেছে তারা যেন সব ফিরিয়ে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, কেউ মালামাল ফেরত দিল না। (বেদায়া নেহায়া ৮:১৮৮)

ইবনে সাদের কাছে এসে সেনান ইবনে আনাস উচ্চ স্বরে এ কবিতাটি পাঠ করে-

اوقر ركابى فضة وذهبا + انا قتلت الملك المحجبا

قتلت خير الناس اما و ابا + وخيرهم اذ ينسبون نسبا

অর্থাৎ আমাকে সোনা রূপা দিয়ে ভরপুর করে দাও, আমি মুকুটহীন এক বাদশাহকে শহীদ করেছি। আমি এমন এক ব্যক্তিকে শহীদ করেছি যার পিতা-মাতা সবচেয়ে মর্যাদাবান। সব বংশকৌলিন্যে তাঁর বংশ শ্রেষ্ঠ।

ইবনে সাদ তাকে ভেতরে ডেকে এনে বেত্রাঘাত করে বলল- তুমি কি পাগল হয়েছ? তোমার এ কবিতা শুনলে ইবনে যিয়াদ তোমাকে কি জীবিত ছাড়বে? (বেদায়া নেহায়া ৮:১৮৯)

**হযরত আব্বাস (রা.)'র কষ্টে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর আফসোস :**

হযরত আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (দ.) এর চাচা। বদর যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসেন। এ যুদ্ধে মক্কাবাসীদের পরাজয়ের কারণে হযরত আব্বাসও বন্দী হয়ে মদীনায় আনিত হন। অন্যান্য বন্দীদের ন্যায় তাঁকেও রশি দিয়ে আবদ্ধ করা হয়। যেহেতু তিনি আরাম-আয়েশে বড় হয়েছেন। তাই এটি তার জন্য ভীষণ কষ্টের কারণ হল। সকালে যখন রাসূলুল্লাহ (দ.) মসজিদে নববীতে নামায পড়তে আসলেন তখন বললেন- আমি সারারাত চাচা আব্বাসের চিন্তায় ঘুমাতে পারিনি। যখন তিনি চেঁচামেছি করত তখন আমার বড় কষ্ট হত।

চিন্তায় বিষয়, সে সময় হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন কাফের। এখনো তিনি ইসলাম গ্রহণ করে জীবন ধন্য করেন নি। উল্টো তিনি কুফরীর সাহায্যার্থে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী হন। তারপরও রাসূলুল্লাহ (দ.) তার কষ্টে ব্যথিত হন। তার জন্য নির্ঘুম রাত কাটান। কেননা, তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর বংশীয় সম্পর্ক ছিল। ফলে তিনি সাহাবীদের বললেন- মুক্তিপণ নিয়ে তাঁকে আযাদ করে দাও।

**হযরত হামযা (রা.) এর হত্যাকারীকে সতর্ক করা প্রসঙ্গে :**

ওহুদ যুদ্ধে নবী করিম (দ.) এর চাচা হযরত হামযা (রা.) শহীদ হন। ওয়াহশী নামক এক ক্রীতদাস তাঁকে শহীদ করে। এ ক্রীতদাস মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সাহাবীতে ভূষিত হন। ইসলাম ধর্মানুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পর তার পূর্বেকৃত সকল পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। এ নিয়মে ওয়াহশীর জন্যও হযরত হামযা (রা.) কে হত্যা করার অপরাধ মার্জিত হয়। তারপরও রাসূলুল্লাহ (দ.) তাঁকে বললেন- 'ওয়াহশী! তুমি কখনো আমার সামনে এসো না। তোমাকে দেখলে আমার প্রিয় চাচার কথা মনে পড়ে এবং সে দুঃখ আমাকে এখনো ব্যথিত করে।' (বুখারী শরীফ)

এ দু' বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, রাসূলুল্লাহ (দ.) তাঁর আত্মীয়দের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করতেন। তাদের ব্যাথায় ব্যথিত হতেন। অনেকদিন পরেও যখন তাদের কথা মনে পড়ত বড় কষ্ট অনুভব

করতেন। অতএব, যখন আমরা নবী দৌহিত্রের নির্মমভাবে শহীদ হওয়ার দৃশ্য কল্পনা করি তখন যে রাসূল (দ.) তাঁর চাচাদ্বয়ের জন্য নির্ঘুম রাত কাটান সে রাসূলের কষ্টের অবস্থা কী হবে, যখন তাঁর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র পরদেশে নির্মমভাবে শহীদ হন। যিনি ছিলেন খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমার নয়নমনি, রাসূল (দ.) এর কাঁধের সওয়ারী, হায়দারে কাররারের নয়ন তারা।

রাসূলুল্লাহ (দ.)কে কষ্ট দেয়া কোন মামূলি গুনাহ নয়। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে ইরশাদ করেন-

ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا و الاخرة و اعدلهم عذابا مهينا

অর্থাৎ, "নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের ওপর আল্লাহর অভিশম্পাত। এদের জন্য আল্লাহ তায়ালা বড় লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন"।

যখন আল্লাহ তায়ালা এমন বদবখতের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি ও লাঞ্ছনা নির্ধারণ করে রেখেছেন যারা রাসূলুল্লাহ (দ.) কে সামান্য কষ্ট দেয়। তখন সেসব পাপীদের কি হাশর হবে যারা নবী দৌহিত্রকে নির্মমভাবে শহীদ করেছে, নবী পরিবারকে অসম্মান করেছে, আহলে বায়তে রাসূলের মৃতদেহের ওপর ঘোড়া দৌড়িয়েছে এবং তাঁদের মস্তক শরীর হতে বিচ্ছিন্ন করেছে।

**হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) বর্ণনা :**

কারবালার মর্মন্তুদ কাহিনীর ওপর রাসূলুল্লাহ (দ.) এর কষ্টের হিসাব ইবনে আব্বাস (রা.) এর নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে অনুমান করা যাবে।

رأيت رسول الله ﷺ فيما يرى النائم ذات يوم بنصف النهار اشعث اغبر بيده قارورة فيها دم فقلت بابى انت و امى ماهذا قال هذا الحسين و اصحابه و لم ازل التقطه منذ اليوم ـ تهذيب التهذيب

অর্থাৎ, একদা দুপুরের সময় রাসূলুল্লাহ (দ.) কে স্বপ্নে দেখলাম, তাঁর চুল মুবারক বড় এলোমেলো ধুলাবালি মিশ্রিত, হাতে একটি রক্তভরা বোতল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম- আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, এটি কি? তিনি বললেন- এ হল হোসাইন ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের রক্ত, যা আমি আজ সকাল হতে একত্রিত করেছি। হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে আছে, যখন ইবনে আব্বাস (রা.) স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হন তখন তার মুখে "ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন" বাক্যটি উচ্চারিত হচ্ছিল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল- হুযুর! কি হয়েছে? তিনি বললেন- হোসাইন ইবনে আলীকে শহীদ করা হয়েছে। লোকেরা বলল- আপনি কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন- এখনই স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (দ.) শোকাহত অবস্থায় তাশরীফ এনেছেন। তাঁর হাতে রক্তেভরা বোতল এবং তিনি বলেছেন- হে ইবনে আব্বাস! আমার বৎস হোসাইনকে শহীদ করা হয়েছে। এসব তাঁর ও তাঁর সাথীদের রক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- আমি সেই তারিখ ও সময় স্মরণ রাখলাম। যখন খবর আসল তখন ইমাম হোসাইনের শাহাদাত ও স্বপ্নের সময় একই ছিল।

**হযরত উম্মে সালমা (রা.)'র বর্ণনা :**

যে সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সাক্ষাত লাভ করেন সেসময় হযরত উম্মে সালমা (রা.)ও স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সাক্ষাত লাভ করেন। উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর এ অনন্য সৌভাগ্য হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (দ.) তাঁকে কিছু মাটি রাখতে দিয়েছিলেন, যা জিব্রাঈল (আ.) ইমাম হোসাইনের বাল্যবয়সে কারবালার ময়দান থেকে হুযুর নবী করিম (দ.)কে এনে দিয়ে বলেছিলেন- এ মাটি সেই কারবালার, যেখানে আপনার অন্তর্ধানের পর আপনার





উম্মতের কিছু বদবখত লোক ইমাম হোসাইনকে শহীদ করবে। রাসূলুল্লাহ (দ.) মাটিগুলো উম্মে সালমা (রা.)কে দিয়ে বললেন- হে, উম্মে সালমা! যখন এ মাটি রক্তে পরিণত হবে তখন বুঝে নেবে আমার হোসাইন শাহাদাত বরণ করেছে।

اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمى ان ابنى قد قتل ـ الخصائص الكبرى

হযরত সালমা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, আমি যখন আমার মাতা উম্মুল মু'মিনীনের সাথে দেখা করতে যাই, তাঁকে উচ্চস্বরে কাঁদতে দেখি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উম্মুল মু'মিনীন! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন- এখন রাসূলুল্লাহ (দ.) কে এ অবস্থায় তাশরীফ আনতে দেখেছি যে,

على رأسه و لحيته تراب قلب مالك يا رسول الله ﷺ قال شهدت قتل الحسين انفا ـ البداية و النهاية

তাঁর মস্তক ও দাঁড়ি মুবারক ধুলাবালি মিশ্রিত ছিল। আমি জানতে চাইলাম, এসবের কারণ কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন- এখনই আমি হোসাইনের শাহাদত প্রত্যক্ষ করে আসলাম।

**হোসাইনী কাফেলার অবশিষ্টদের কুফায় গমন :**

কারবালার নির্মম ঘটনার পরদিন সকালে যখন ওমর ইবনে সাদ হোসাইনী কাফেলার অবশিষ্ট সাথীদের কুফায় প্রেরণ করে তখন কাফেলার লোকেরা কারবালার ময়দানে তাদের প্রিয় ইমাম হোসাইন ও তাঁর সাথীদের লাশ কাফনবিহীন মাটির ওপর দেখতে পেলেন। তখন সেখানে এমন কান্নার রোল ও চিৎকার হয়েছিল, মনে হল যেন তাদের হৃদয় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছিল। হযরত যয়নব (রা.) বড় বেদনায় বললেন- হে, আল্লাহর রাসূল! আপনার দোহাই, দেখুন! আপনার হোসাইন উন্মুক্ত মাটির ওপর ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে আছে। হে, আল্লাহর রাসূল! আপনার দোহাই, আপনার মেয়েরা বন্দী, দাফন-কাফন ছাড়া নিথর শরীর নিয়ে অবজ্ঞা আর অবহেলায় মাটির ওপর পড়ে আছে, বাতাসে তাদের শরীরে মাটি-বালির স্তুপ হয়ে আছে। হযরত যয়নবের এ করুণ আহবান শুনে সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া)

**শহীদগণের দাফন :**

ইয়াযিদের সৈন্যদল কারবালা ত্যাগ করল। শাহাদাতের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে বনূ আসাদ যারা ফোরাত নদীর তীরে গাদরিয়া এলাকায় বসবাস করত তারা ইমাম আলী মক্বাম হযরত হোসাইন (রা.) 'র মস্তকবিহীন শরীর দাফন করার ব্যবস্থা করেন এবং বাকী সঙ্গী-সাথীদের অন্যান্য জায়গায় দাফন করেন। (তাবারী, ৬:৩৩)

**নূরানী মস্তকে শুভ্রবর্ণের পাখি :**

আহলে বায়তে রাসূলের (রা.) অবশিষ্ট সদস্যরা ১১ মুহাররম কুফায় পৌঁছে। তবে শহীদগণের মস্তক পূর্বেই কুফায় পৌঁছেছিল। ইমাম আলী মক্বামের নূরানী মস্তক ইবনে সাদ খুলির হাতে সোপর্দ করে ইবনে যিয়াদের নিকট প্রেরণ করেছিল। খুলি যখন মস্তক নিয়ে কুফা পৌঁছে তখন ইবনে যিয়াদের সভাকক্ষের দরজা বন্ধ করা হয়েছিল। ফলে খুলি মস্তক মুবারক নিয়ে তার ঘরে চলে গেল এবং একটি বড় পাত্রে মস্তক মুবারকটি ঢেকে রাখল। অতঃপর স্ত্রীকে বলল- আমি তোমার জন্য সবচেয়ে বড় সম্মানের পাত্র নিয়ে এসেছি। সে বলল- সেটা কি? খুলি বলল- ইমাম হোসাইনের মস্তক মুবারক নিয়ে এসেছি। স্ত্রী বলল- মানুষ স্বর্ণ রৌপ্য আনে আর তুমি কিনা রাসূলে খোদা (দ.)'র প্রিয় দৌহিত্রের মস্তক মুবারক নিয়ে এসেছ? আল্লাহর শপথ! ভবিষ্যতে আমি তোমার সাথে আর সহবাস করব না। এ বলে সে বিছানা হতে উঠে দাঁড়াল। খুলি তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে শুয়ে পড়ল। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮:১৮৯)
খুলির স্ত্রী নূরানী মস্তক মুবারকের পাশে এসে বসল এবং বলল-

فوالله ما زلت انظر الى نور يسطع مثل العمود من السماء الى الاجابةو رأيت طيرا بيضاء ترفرف حولها ـ الطبرى

আল্লাহর শপথ! আমি দেখেছি একটি নূর আসমান থেকে এ পাত্র পর্যন্ত চকচক করছে এবং শুভ্র পাখি সে পাত্রের চতুস্পার্শ্বে উড়তে দেখলাম। সকাল হলে খুলি নূরানী মস্তক মুবারক ইবনে যিয়াদের নিকট নিয়ে গেল।

**ইমাম আলী মক্কামের মস্তক মুবারক ও ইবনে যিয়াদ :**

পরের দিন ইবনে যিয়াদের সভা বসল। সকলের জন্য দরবার উন্মুক্ত করা হল। এসময় ইবনে যিয়াদের সামনে ইমাম হোসাইনের মস্তক মুবারক একটি পাত্রের ওপর রাখা হল। হামীদ ইবনে মুসলিম বর্ণনা করেন- আমাকে সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে আমার পরিবার-পরিজনসহ কুফায় প্রেরণ করা হয়। যখন আমি পৌছলাম তখন ইবনে যিয়াদের দরবারে সাক্ষাতপ্রার্থীদের বিভিন্ন দল তার আশে পাশে বসা ছিল। আমি তার মজলিসে গিয়ে বসলাম। দেখলাম তার সামনে ইমাম হোসাইনের মস্তক মুবারক রাখা আছে। সে একটি ছড়ি দিয়ে ইমামের ঠোটে গুঁতো দিচ্ছিল। এদৃশ্য দেখে হযরত যায়েদ ইবনে আরকম (রা.) চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন- তোমার ছড়ি সে পবিত্র ঠোট থেকে সরাও, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ (দ.) কে এ ঠোটের ওপর চুমু খেতে দেখেছি। ইবনে যিয়াদ বলল- আল্লাহ তোমাকে কাঁদতে দিন। আর আল্লাহর শপথ! যদি তুমি বৃদ্ধ না হতে তবে আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করতাম। বর্ণনাকারী বলেন- পরে যায়েদ ইবনে আরকম (রা.) তার দরবার হতে উঠে চলে যান। তিনি চলে যাওয়ার পর লোকেরা বলল- যে কথা যায়েদ ইবনে আরকম বলেছেন তা ইবনে যিয়াদ শুনলে অবশ্যই তাকে হত্যা করত। হামীদ ইবনে মুসলিম জিজ্ঞাসা করলেন- তিনি কি বলেছেন? লোকেরা বলল- তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলছিলেন- এক গোলাম অন্য গোলামদের বাদশাহ হল এবং রাজত্বকে তার পৈতৃক সম্পত্তি করে নিল। হে আরববাসী! আজ তোমরা সকলে গোলাম যে, তোমরা ফাতেমার পুত্রকে শহীদ করেছ এবং মারজানার পুত্রকে বাদশাহ হিসেবে গ্রহণ করেছ। এখন সে তোমাদের মধ্যে সম্মানিতদের হত্যা করবে এবং তোমাদের মধ্যে অসম্মানিতদের গোলামে পরিণত করবে। যারা এ লাঞ্ছনা ও অপমানের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট তারাই হতভাগা। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮:১৯০)

হযরত আনাস ইবন মালেক (রা.) বলেন- যখন ইমাম হোসাইনের মস্তক মুবারক একটি পাত্রে করে ইবনে যিয়াদের সামনে রাখা হল তখন আমি তার পাশে ছিলাম। সে তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করছিল এবং হাতের ছড়ি দ্বারা তাঁর নাকে মুখে গুঁতো দিচ্ছিল।

হযরত আনাস বলেন- ইমাম হোসাইন রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সাথে শারীরিক গঠনে সাদৃশ্য রাখতেন। (সুনানে তিরমিযী)

**ইবনে যিয়াদ ও কারবালার বন্দীগণ :**

হযরত ইমাম হোসাইনের (রা.) মস্তক মুবারকের পর আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর অন্যান্য সদস্যদেরকে ইবনে যিয়াদের সামনে উপস্থিত করা হল। হযরত যয়নব সাধারণ জামা পরা অবস্থায় ছিলেন এবং কুমারী রমণীদের একদলের মধ্যে ছিলেন। ফলে তাকে কেউ চিনতে পারল না। ইবনে যিয়াদের সামনে যখন তাদেরকে উপস্থাপন করা হল, সে যয়নাবের (রা.) দিকে ইঙ্গিত করে বলল- তুমি কে? তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তখন এক কুমারী বলল- ইনি যয়নব বিনতে আলী। ইবনে যিয়াদ বলল- আল্লাহর শোকর যিনি তোমাদেরকে অপমানিত করেছেন এবং তোমাদের দাবীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছেন। হযরত যয়নব বললেন- বরং আল্লাহ আমাদেরকে সকলের ওপর সম্মানিত করেছেন এবং পবিত্র করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসিককেই অপমানিত করেন এবং মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেন। ইবনে যিয়াদ বলল- তোমরা কি দেখনি যে, আল্লাহ আহলে বায়তের সাথে কি আচরণ করেছেন? হযরত যয়নব





বললেন- শাহাদাত তাদের তাকদীরে ছিল বিধায় তারা নিজেরাই শাহাদাতের স্থানে চলে এসেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তাদেরকে একস্থানে একত্রিত করবেন। সেসময় তারা তোমাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর দরবারে নালিশ করবেন। এতে ইবনে যিয়াদ রাগের মাথায় কিছু করতে চাইল। আমর ইবনে হারিস বলল- আল্লাহ, আমীরের মঙ্গল করুক। এ তো একজন নারী। আপনি এক নারীর কথায় তাকে গ্রেফতার করবেন? নারীদের কথায় গ্রেফতার করা যায় না এবং তাদের মূর্খতার কারণে কেবল তাদেরকে ভর্ৎসনা করা যায়। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮:১৯৩)

যখন ইবনে যিয়াদ হযরত আলী ইবনে হোসাইন ইমাম যয়নুল আবেদীনকে দেখল তখন এক সৈন্যকে নির্দেশ দিল, যদি এ ছেলেটি প্রাপ্তবয়স্ক হয় তবে তাকে হত্যা করো। সেই সৈন্য সাক্ষ্য দিল- এ তো বালেগ হয়েছে। ইবনে যিয়াদ বলল- তাহলে তাকে হত্যা করো। এতে ইমাম যয়নুল আবেদীন বললেন- এ রমণীদের সাথে যদি তোমার কোন প্রকারের সম্পর্ক থাকে তবে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য কোন একজন রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রেরণ করো। ইবনে যিয়াদ তাকে বলল- তুমিই যাও। অতঃপর হযরত যয়নুল আবেদীনকে হত্যা না করে রমণীদের সাথে প্রেরণ করা হল।

**ইবনে আফীফের সাক্ষ্য প্রদান :**

ইবনে যিয়াদ ঘোষণা করল- তোমরা সকলেই জামে মসজিদে একত্রিত হও। যখন লোকেরা একত্রিত হল তখন ইবনে যিয়াদ মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে তার বিজয়ের কাহিনী ও ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলল- হোসাইন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ক্ষমতা গ্রহণ করতে চেয়েছিল। এতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আফীফ যিনি হযরত আলী (রা.) এর অনুসারী ছিলেন, বললেন- 'আফসোস! হে ইবনে যিয়াদ! নবীর পুত্রগণকে হত্যা কর আর সিদ্দীকিনদের ন্যায় বক্তব্য দাও।' ইবনে যিয়াদ তাকে হত্যা করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। ইবনে যিয়াদের নির্দেশে ইমাম হোসাইনের মস্তক মুবারক কুফার অলিতে-গলিতে ইবনে যিয়াদের নির্দেশে ঘুরানো হল। পরে হুর ইবনে কায়েসের নেতৃত্বে একটি বড় কাফেলা সহকারে ইমাম হোসাইনের মস্তক মুবারক কুফায় প্রেরণ করা হল। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮:১৯১)

বদবখ্ত ইবনে যিয়াদ অন্য এক কাফেলায় অন্যান্য শহীদগণের মস্তক ও আহলে বায়তে রাসূলের বন্দীদেরকে বড় অপমানের সাথে সিরিয়ায় প্রেরণ করে। হযরত যয়নুল আবেদীনের হাতে পায়ে শৃঙ্খলের বেড়ি লটকিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং নারীদেরকে উন্মুক্ত উটের ওপর বসিয়ে রওনা করা হল। ইবনে যিয়াদ কাফেলার প্রতিনিধিদের বলে দিয়েছিল- রাস্তায় তোমরা এ মস্তকগুলো তীরের ওপর উঁচিয়ে সকলে দেখার ব্যবস্থা করবে এবং বলবে- ইয়াযিদের বিরুদ্ধাচারীদের এ নির্মম পরিণতি, স্মরণ রেখো! যারাই বিরোধিতা করবে তাদের এ পরিণতি হবে। যেন ভবিষ্যতে লোকেরা ভয়ে বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকে।

ইমাম আলী মক্কামের মস্তক মুবারক বহনকারী কাফেলা পথিমধ্যে একটি গীর্জায় মঞ্জিল করে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে কাসীরের বর্ণনা মতে, তারা মস্তক মুবারকটি তাদের পাশে রেখে সকলে শরাবের নেশায় মত্ত হল। অলৌকিকভাবে একটি কলম এসে রক্ত দিয়ে গীর্জার দেওয়ালে এ পংক্তিটি লিখে দেয়-

اترجو امة قتلت حسينا + شفاعة جده يوم الحساب

অর্থাৎ, হোসাইনকে শহীদকারী কি এ আশায় বসে আছে যে, কিয়ামত দিবসে তারা তাঁর নানাজানের সুপারিশ পাবে? (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮:২০০)

কতিপয় বর্ণনায় এসেছে যে, এ পংক্তিটি আগে থেকেই নাকি এ দেওয়ালে লেখা ছিল। ইবনে কাসীর ইবনে আসাকির থেকে বর্ণনা করেন যে, এক সৈন্যবাহিনী রোম সাম্রাজ্যে যুদ্ধের জন্য বের হয়। তারা

সেখানকার এক গীর্জায় এ পংক্তিটি লেখা অবস্থায় দেখলে তারা লোকদের কাছে জানতে চায়- এটি কে লিখেছে? তারা বলল- হযরত মুহাম্মদ (দ.) আভির্ভূত হওয়ার তিনশত বছর পূর্বে এ পংক্তিটি এখানে লিপিবদ্ধ ছিল। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮:২০০)

যে গীর্জায় এ কাফেলা অবস্থান করছিল সে গীর্জার পাদ্রী শহীদগণের মস্তক তীরের ওপর দেখে এবং নিষ্পাপ চেহারার রমণীদের বন্দী অবস্থায় দেখে ব্যথিত হল। সে জানতে চাইল, এসব কাদের মস্তক এবং রমণীকূল কোন্ রাজ পরিবারের? সে যখন জানতে পারল, এরা আর কেউ নয়, নবী পরিবারের শেষ অবলম্বন। তখন পাদ্রী বলল- তোমরা বাস্তবই বড় নিষ্ঠুর, পাষাণ কেউ কি নবী পরিবারের সাথে এমন আচরণ করতে পারে? সেই পাদ্রী কাফেলার প্রতিনিধিকে বলল- তোমরা যদি আমাকে একরাতের জন্য এ মস্তক মুবারক রাখতে দাও এবং এ রমণীকূলকে সেবা করতে দাও, আমি তোমাদেরকে বিনিময়ে দশ হাজার দিনার দেব। যালিমরা ছিল টাকার গোলাম। তাই টাকার কথা শুনামাত্রই রাজি হয়ে মস্তক মুবারক ও রমণীকূলকে পাদ্রীকে সোপর্দ করল। সেই পাদ্রী তার ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে একটি সুরম্য কামরায় নবী পরিবারের রমণীদেরকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করল। যদিও আমি মুসলমান নই, কিন্তু নবী পরিবারের প্রতি আমার ভালবাসার কোন খাদ নেই। যখনই কিছুর প্রয়োজন হবে আমাকে খবর দিবেন। সে বলল- এ রাস্তায় আল্লাহ তায়ালা বড় পরীক্ষা করেন। ধৈর্য্য এ রাস্তার অবলম্বন। আহলে বায়তের রমণীরা তাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন।

পাদ্রী তার ভৃত্যকে ডেকে বলল- তুমি এখানে দাঁড়াও, যখন নবী পরিবারের রমণীদের কিছু প্রয়োজন হবে তুমি তা ব্যবস্থা করে দিবে এবং পাদ্রী একটি পবিত্র পাত্রের ওপর ইমাম আলী মক্বামের মস্তক মুবারক রেখে বড় যত্ন সহকারে ইমামের চেহারার রক্ত দাঁড়ি মুবারকের ওপর পড়া ধুলাবালি নিজ হাতে পরিষ্কার করতে লাগল এবং ইমাম আলী মক্বামের মস্তক মুবারকের সামনে বড় আদবের সাথে বসে সারারাত অঝোর নয়নে কাঁদল।

নবী পরিবারের রমণীরা পাদ্রীর আচরণে বড় খুশী হয়ে তার জন্য দোয়া করলেন এবং সর্বোপরি ইমাম আলী মক্বামের মস্তক মুবারকের কারামত দেখে পাদ্রীর অন্তরচক্ষু খুলে গেল। সে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল- "আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ"।
যখন এ পাদ্রী তার পার্থিব সম্পদ নবী পরিবারের জন্য উৎসর্গ করল, আল্লাহ তাকে পরকালের সম্পদ ঈমান দান করলেন। আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর প্রতি আদব থাকলে মানুষের তাকদীর বদলে যায়, তা আবারও প্রমাণিত হল। (আস সাওয়ায়েকুল মুহরেকাহ)

এ সময় আরেকটি অতি শিক্ষণীয় ঘটনা ঘটল। ইয়াযিদের বদবখত সৈন্যরা ইমাম আলী মক্বামের তাঁবু থেকে যেসব মালামাল ছিনতাই করেছিল এবং এ পাদ্রী থেকে যে সম্পদ তারা নিয়েছিল তা বণ্টন করার জন্য যখন তারা থলের মুখ খুলল, তখন তারা থলের ভেতর মাটির টুকরো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না এবং থলের ভেতর তারা কুরআন মজীদের নিম্নের আয়াতদু'টি দেখতে পেল-

و لاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون - ابراهيم ٤٢

অর্থাৎ, কখনো আল্লাহকে যালিমদের কৃতকর্ম থেকে গাফিলা ধারণা করো না। (ইবরাহীম, ১৪:৪২)

و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون - ٢٢٧:٢٦

অর্থাৎ, যালিম লোকেরা অচিরেই জানবে যে, তাদেরকে কোন্ দিকে ফেরানো হবে। (আশ শুয়ারা, ২৬:২২৭)

ইয়াযিদী বাহিনীদের জন্য এটি এক বড় শিক্ষা ছিল যে, তোমরা যে সম্পদের জন্য নবী পরিবারর প্রতি এ অবিচার করেছ সে সম্পদ দুনিয়াতেই মাটি হয়ে গেল। এখন পরকালের কঠোর শাস্তির জন্য অপেক্ষা করো।





**ইমাম হোসাইন (রা.)'র পবিত্র মস্তক ইয়াযিদের দরবারে :**

যখন ইমাম আলী মক্বামের পবিত্র মস্তক ও কারবালা প্রান্তরে বন্দী আহলে বায়তে রাসূল (দ.) ইয়াযিদের দরবারে পৌঁছল, তখন ইয়াযিদ তাদের সাথে কী আচরণ করেছিল তা নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দু'টি বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল-

**প্রথম বর্ণনা :**

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী- যখন শহীদগণের মস্তক মুবারক ও কারবালার বন্দীগণ ইয়াযিদের দরবারে আনীত হল তখন সর্বসাধারণের জন্য দরবার উন্মুক্ত করা হয়। লোকেরা দেখল, ইমাম হোসাইনের মস্তক মুবারক ইয়াযিদের সামনে একটি পাত্রে পড়ে আছে। ইয়াযিদের হাতে একটি ছড়ি ছিল, তা দিয়ে সে ইমাম আলী মক্বামের শুভ্র মশ্রিণ দাঁতের ওপর আঘাত করছে। মুখে তার একটি কবিতার এ পংক্তিগুলো আবৃত্ত হচ্ছিল-

ابى قومنا ان ينصفونا فانصفت + قواصب فى ايماننا تقطر الدما

يفلقن هاما من رجال اعزة + علينا و هم كانوا اعق و اظلما

অর্থাৎ, আমার সম্প্রদায় ইনসাফ করতে অস্বীকার করল, কিন্তু সে তলোয়ার ইনসাফ করল যা আমাদের ডান হাতে ছিল এবং যা থেকে রক্ত ঝরছে। এ তলোয়ার তাদের শির শরীর হতে বিচ্ছিন্ন করল, যারা আমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করছিল এবং তারা ছিল বড় নাফরমান ও যালিম।

হযরত আবু বরযাহ আসলামী (রা.) যখন দেখলেন যে, ইয়াযিদ ইমাম হোসাইনের দাঁত মুবারকে আঘাত করছে, তখন তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বললেন- ইয়াযিদ! তুমি সেই ঠোঁটের ওপর আঘাত করছ, যাতে আমি হুযুর নবী করিম (দ.) কে অসংখ্যবার চুমু খেতে দেখেছি (তুমি এ বেয়াদবী থেকে বিরত হও)। নিশ্চয় কাল কিয়ামত দিবসে তুমি যখন উপস্থিত হবে তখন তোমার সুপারিশকারী হবে ইবনে যিয়াদ আর ইমাম হোসাইনের সুপারিশকারী হবেন হুযুর মুহাম্মদ (দ.)। এ বলে হযরত আবু বারযাহ ইয়াযিদের দরবার থেকে বের হয়ে গেলেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮:১৯২)

**দ্বিতীয় বর্ণনা :**

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী- যখন ইমাম আলী মক্বামের পবিত্র মস্তক ও বন্দীগণকে ইয়াযিদের দরবারে হাজির করা হয়, তখন ইয়াযিদ এ পংক্তিগুলো আবৃত্তি করছিল-

ليت اشياخى ببدر شهدوا + جزع الخزرج فى وقع الاسل

قد قتلنا الضعف من اشرافكم + و عدلنا ميل بدر فاعتدل

হায়! বদর প্রান্তরে নিহত খাযরাজ গোত্রের আমার মুরুব্বিরা, যদি তারা তীরের আঘাতের আর্ত চীৎকার শুনত। হ্যাঁ আমি তোমাদের চেয়ে অধিক সম্মানিতকে হত্যা করেছি। বদরে আমার গোত্রের পাল্লা যেটুকু ছিল, তা আমি আজ বরাবর করে দিলাম। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮:১৯২)

ইয়াযিদ উন্মুক্ত ভরপুর মজলিসে নবী করিম (দ.) এর দৌহিত্রের ঠোঁট মুবারকে আঘাত করতে করতে বলছিল- যদি আমি আমার পূর্বপুরুষ যারা বদর প্রান্তরে নিহত হয়েছিল, তারা জীবিত থাকত তবে আমি তাদের বলতাম, আমি নবী পরিবারের শেষ অবলম্বন হোসাইনকে হত্যা করে তার বদলা নিলাম।

এমন দম্ভ উক্তি করার পর ইয়াযিদের ঈমানের আর কি বাকী থাকে। ইসলাম আখিরাত ও জান্নাতের সাথে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

**রোমের রাষ্ট্রদূত এর সমালোচনা :**

যে সময় আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর মস্তক মুবারক ইয়াযিদের সামনে উপস্থাপন করা হল তখন ইয়াযিদের দরবারে রোম সম্রাটের একজন দূত সেখানে উপস্থিত ছিল। সে ইয়াযিদের পাশবিক আচরণ দেখে জিজ্ঞাসা করল- যে ঠোঁট মুবারকে ইয়াযিদ আঘাত করছে এটি কোন রাজাধিরাজের মস্তক? লোকেরা বলল- এটি আমাদের রাসূল (দ.) এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইন এর মস্তক। খ্রীষ্টান এ দূত একথা শুনতেই তার শরীরে কম্পন সৃষ্টি হল এবং বলতে লাগল- হে যালিমরা! তোমরা তো বড় দুনিয়াপূজারী। আমার কাছে হযরত ঈসা (আ.) এর ঘোড়ার একটি পায়ের চিহ্ন আছে, বছরের পর বছর ধরে আমি সেই চিহ্নটি বড় সম্মানের সাথে সংরক্ষণ করছি। আমরা আমাদের নবীর ঘোড়ার পায়ের চিহ্নকে সম্মানের সাথে স্মরণ করি, আর তোমরা তোমাদের নবীর দৌহিত্রের সাথে এহেন আচরণ করছ! এ বড়ই অন্যায়!

**এক ইহুদীর ভর্ৎসনা :**

ইয়াযিদের দরবারে একজন ইহুদীও ছিল। সে বলল- আমি হযরত দাউদ (আ.) এর বংশধর। প্রায় সত্তর পুরুষ অতিবাহিত হয়েছে। তারপরেও ইহুদীরা আমাকে বড় সম্মানের সাথে স্মরণ করে শুধুমাত্র দাউদ (আ.) এর বংশধর হওয়ার কারণে। আর তোমরা কিনা নবীর এ প্রিয় দৌহিত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করলে? এ অন্যায়ের ওপর যতই আফসোস করো তা কম। (আস সওয়ায়েকুল মুহরিকাহ, ১৯৯)

**ইয়াযিদের প্রতারণামূলক রাজনীতি :**

ইমাম হোসাইনের পবিত্র মস্তক মুবারক যখন ইয়াযিদের সামনে আনীত হল সে বড় আনন্দিত হল এবং ইবনে যিয়াদকে অনেক পুরষ্কার দিয়ে ধন্য করল। পরক্ষণেই ইয়াযিদ তার সুর পাল্টে ফেলল। কেননা, সে বুঝতে পারল যে, নবী পরিবারের সাথে এহেন আচরণে সাধারণের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা জন্মাবে। তাদের ঘৃণা খরস্রোতা নদীর ন্যায় তেজস্বিনী স্রোতে সকল অন্যায়-অবিচার ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তাই সে তার আচরণের রূপ পরিবর্তন করে ভরপুর মজলিসে ঘোষণা করল- ইবনে মারজানা ইবনে যিয়াদের ধ্বংস হোক। সে কারবালার ময়দানে আহলে বায়তে রাসূল (দ.) কে অপমানিত করল, সে বড় পাষাণের ন্যায় রক্ত প্রবাহিত করল। আমি তার এ কাজের ওপর সন্তুষ্ট নই। যদি সে হোসাইনকে জীবিত আমার কাছে নিয়ে আসত, তবে আমি বড় খুশী হতাম। কিন্তু এ পাষন্ড বড় অন্যায় করল। আল্লাহ তার ওপর লা'নত করুক।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে কাসীর এ প্রসঙ্গে বলেন-

لما قتل ابن زياد الحسين و من معه بعث برؤوسهم الى يزيد فسر بقتله اولا و حسنت بذلك منزلة ابن زياد عنده ثم لم يلبث الا قليلا حتى ندم و قد لعن ابن زياد على فعله ذلك و قد لعن ابن زياد على فعله ذلك و شمه فيما يظهر و يبدو و لكن لم يعزله على ذلك و لا عاقبه و لا ارسل يعيب عليه ذلك ـ البداية و النهاية

যখন ইবনে যিয়াদ ইমাম হোসাইন ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে শহীদ করে তাদের মস্তকসমূহ ইয়াযিদের নিকট প্রেরণ করল। ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাতের কথা শুনে ইয়াযিদ প্রথমে আনন্দ উৎসব করল এবং তার কাছে ইবনে যিয়াদের মর্যাদা আরো বেড়ে গেল। কিন্তু সে এ আনন্দ দীর্ঘায়িত করল না, পরক্ষণই এজন্য লজ্জিত হল। অবশ্য ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদকে তার অপকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করল ঠিক; কিন্তু তাকে তার পদ থেকে অব্যহতি দিল না এবং তাকে কোন শাস্তিও দিল না।

ইয়াযিদের এ প্রতারণামূলক আচরণের কারণে অনেকেই এ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, ইয়াযিদ ইমাম





হোসাইনের এ নির্মম শাহাদাতের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না এবং সে এতে বড় ব্যথিত ছিল। এরূপ ধারণা পোষণকারীদের প্রতি প্রশ্ন হল- যদি ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদের কাজের ওপর সন্তুষ্ট না হত তবে সে ইবনে যিয়াদ ও ইবনে সা'দ থেকে প্রতিশোধ নেয়নি কেন? প্রতিশোধ নেয়া তো দূরের কথা, তাদেরকে পদচ্যুত পর্যন্ত করল না কেন? সে একটি সরকারী পয়গাম প্রেরণ করে সামান্য ভর্ৎসনাও করল না।

এসব কিছু প্রমাণ করে যে, ইয়াযিদ ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের ওপর সন্তুষ্ট ছিল এবং ইবনে যিয়াদ ও ইবনে সা'দের কৃতকর্মকে যথাযথ মনে করত। কিন্তু সে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বাহ্যিকভাবে ইবনে যিয়াদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল। এটি ছিল তার সিংহাসন দৃঢ় ও দীর্ঘায়িত করার একটি কুট কৌশল।

অধিকন্তু ইয়াযিদ ইমাম হোসাইনের মস্তক মুবারক ও অন্যান্য শহীদগণের মস্তকসমূহ দামেস্কের বাজারে ঘুরিয়ে আনতে বলল। এ কি সেই ইয়াযিদ, যে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল?

অতএব, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নিশ্চয় ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদ ও ইবনে সা'দের এ অপকর্মের ওপর শতভাগ সন্তুষ্ট ছিল।

**ইমাম হোসাইনের মস্তক মুবারকের অনন্য শান :**

বদবখত ইয়াযিদের নির্দেশে ইমাম হোসাইন (রা.) এর মস্তক মুবারক তিনদিন যাবৎ দামেস্কের বাজারে প্রদর্শন করা হয়। হযরত মিনহাল ইবনে আমর থেকে বর্ণিত আছে-

و الله رايت رأس الحسين حين حمل و انا بدمشق وبين يدى الرأس رجل يقرأ سورة الكهف حتى بلغ قوله تعالى ام حسبت ان اصحاب الكهف الرقيم كانوا من اياتنا عجبا فانطق الله الرأس بلسان ذرب فقال اعجب من اصحاب الكهف قتلى و حملى

"আল্লাহর শপথ! আমি ইমাম হোসাইন (রা.) এর মস্তক মুবারক তীরের ওপর বিদীর্ণ দেখেছি,তখন দামেস্কের বাজারে ছিলাম। মস্তক মুবারকের সামনে একটি ব্যক্তি সূরা কাহাফের আয়াত তেলাওয়াত করছিল। সে যখন ام حسبت ان اصحاب الكهف الرقيم كانوا من اياتنا عجبا (তোমরা কি জান নিশ্চয় আসহাবে কাহাফ ও রাকীম আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল।) এ আয়াত পর্যন্ত পৌছল, তখন আল্লাহ তায়ালা ইমামের মস্তক মুবারককে কথা বলার শক্তি দিলেন। এ মস্তক মুবারক স্পষ্ট ভাষায় বলল-"আমার শাহাদাতের কাহিনী ও তীরের ওপর আমার এ মস্তক আরো বেশি আশ্চর্যজনক।"

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাতের কাহিনী ও তাঁর শরীর হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তীরের ওপর নিয়ে তা বাজারে প্রদর্শন করা অবশ্যই আসহাবে কাহাফের ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি আশ্চর্যের। কেননা, আসহাবে কাহাফ কাফেরের ভয়ে ঘর ছেড়েছিল এবং দেশ ত্যাগ করে একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল; কিন্তু ইমাম হোসাইন (রা.) নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে মুসলিম দাবীদার পাষন্ডদের হাতে নির্মম পাশবিকতার স্বীকার হন। আসহাবে কাহাফ সাধারণ মু'মিন বান্দা ছিলেন যারা নিজেদের সৎকর্মের কারণে বেলায়তের মক্বাম হাসিল করেছিলেন। কিন্তু ইমাম হোসাইন ছিলেন সৈয়্যদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামিনের কলিজার টুকরা প্রিয় দৌহিত্র। আসহাবে কাহাফ দীর্ঘদিন পর ঘুম হতে উঠে কথা বলেছিলেন; কিন্তু তারা ছিল জীবিত। আর ইমাম হোসাইন (রা.) এর মস্তক মুবারক শরীর হতে আলাদা হয়ে কথা বলা এটা অনেক বেশি অলৌকিকতার দাবীদার তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

**আহলে বায়তের মদীনায় প্রত্যাবর্তন :**

ইয়াযিদ আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর অবশিষ্ট সদস্যদের মদীনায় প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে ইমাম

যয়নুল আবেদীনকে ডেকে বলল- আল্লাহ ইবনে যিয়াদকে ধ্বংস করুক, আল্লাহর শপথ! আমি ইবনে যিয়াদের স্থানে থাকলে অবশ্যই ইমাম হোসাইনের কথা মেনে নিতাম; কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এটাই ছিল যা তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ। অতএব, তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে অবহিত করবে। অতঃপর ইয়াযিদ নোমান বিন বশীরকে ডেকে বলল- এদেরকে যত্নের সাথে মদীনায় পৌছানোর ব্যবস্থা কর।

আহলে বায়তে রাসূলের (দ.) সাথে নোমান বিন বশীর খুব খাতির যত্ন করে মদীনায় পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন এবং তিনি নিজেই তাদের সাথে মদীনায় আগমন করলেন। পথিমধ্যে নোমান বিন বশীরের সদাচরণে মুগ্ধ হয়ে হযরত যয়নব ও হযরত ফাতমা (ছোট) তাদের কাছে থাকা গহনাপাতি সদাচরণের বিনিময় হিসেবে তার নিকট প্রেরণ করেন। নোমান বিন বশীর তা গ্রহণ না করে বললেন- আমি আপনাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেছি শুধুমাত্র পরকালীন মুক্তির আশায়। এতে আমার পার্থিব কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দের ইচ্ছা নেই। হয়ত এতে আমি আল্লাহ ও রাসূলে পাকের (দ.) সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হব। (তাবারী, ৬:৩৪)

যখন এ নির্যাতিত কাফেলা মদীনায় প্রবেশ করল, তখন তাদের দেখার জন্য মদীনার সকল লোক ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। হযরত উম্মে লোকমান ইবনে আকীল ইবনে আবী তালিব তার গোত্রের রমণীদের দেখে কাঁদতে কাঁদতে কবিতা আবৃত্তি করলেন যার বঙ্গানুবাদ হচ্ছে-

"লোকেরা! তোমরা কি উত্তর দেবে যখন নবী করিম (দ.) জিজ্ঞাসা করবেন- তোমরা শেষ নবীর উম্মত হওয়া সত্ত্বেও এটি কি করলে? আমার পরে তোমরা আমার আহলে বায়তের কতেককে শহীদ করলে আর কতেককে বন্দী করলে! আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার পরে আমার নিকটাত্মীয়দের সাথে অন্যায় আচরণ করবে না।" (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮:১৯৮)

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রা.) বলেন- কারবালার নির্মম সেই ঘটনার পর হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন সর্বদা দিনের বেলায় রোযা রাখতেন এবং রাতের বেলা ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। যখন ইফতারের সময় হত সামনে সামান্য খাবার নিয়ে বসতেন। তখন তিনি অঝোর নয়নে কাঁদতেন এবং বলতেন- 'আমার পিতা ও ভাইয়েরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় পিপাসায় কাতর হয়ে শাহাদাতবরণ করেছেন। আফসোস! তাঁদের সামান্য খাবার পানিও জোটেনি' এ বলে দু'য়েক ঢোক পানি ও দু'একটি খেজুর মুখে দিয়ে তিনি তাঁর অশ্রুজল মিশিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন। তাঁর চোখ থেকে সে দৃশ্যপট এবং পিতা ও ভাইদের স্মৃতি কখনো মুছে যায়নি।

**ফেরাউন ইয়াযিদের গোমরাহীর বিবরণ :**

ইমাম আলী মক্কাম ইমাম হোসাইনের শাহাদতের পর বদবখত ইয়াযিদের ফেরাউনী ও কারূনী মনোভাব আরো চরমরূপ ধারণ করল, তার শয়তানী ও ব্যবিচারের মাত্রায় যোগ হতে থাকে অনৈতিক আচরণের বিভিন্ন রূপ। সে আগে থেকেই মদ্যপায়ী ছিল, ব্যবিচারের মাত্রায় সে যোগ করল- সৎ মা, সহোদর বোন ও কন্যাদের সাথে ব্যভিচার করার মূর্ত প্রতীক হয়ে আবির্ভূত হল পাষন্ড ইয়াযিদ। যার কারণে সাধারণ মানুষ বিশেষত হেজাজবাসী তার চরম বিরোধী হয়ে গেল। তারা ইয়াযিদের ব্যভিচারের কারণে তার বায়াত প্রত্যাখ্যান করল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা.) বলেন- 'আল্লাহর শপথ! আমরা তখনই ইয়াযিদের বায়াত প্রত্যাখ্যান করেছি যখন আমাদের ভয় হল যে, ইয়াযিদের অপকর্মের কারণে আসমান হতে আমাদের ওপর শাস্তি স্বরূপ পাথরবৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। কেননা সে মা, বোন ও কন্যার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হল, শরাব পান করল, নামায ত্যাগ করল।'

যখন ইয়াযিদ দেখল যে, হেজাজবাসী তার চরম বিরোধী হয়ে গেল এবং তার বায়াত প্রত্যাখ্যান করল এবং তাদের বিরোধিতা অন্যান্য এলাকায় প্রভাব ফেলতে পারে এ ভয়ে সে মুসলিম ইবনে উকবার





নেতৃত্বে বিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মক্কা ও মদীনা আক্রমণের জন্য প্রেরণ করে।

এ অপকর্মের তালিকা সেই ইয়াযিদের, যাকে কখনও 'আমীরুল মু'মিনীন' বলা হত, যার নামের সাথে কখনও 'রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু' লেখা হত। বরং কিছু লোক তো এমনও আছে যারা ইয়াযিদকে মু'মিন ও জান্নাতী বলতেও দ্বিধা করে না। আর এ ইয়াযিদের কর্মতালিকা হল- সে নবী করিম (দ.)'র প্রিয় দৌহিত্রকে শহীদ করেছে এবং মক্কা মদীনা আক্রমণের জন্য বিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেছে। বদবখ্‌ত ইয়াযিদের সৈন্যরা মদীনা মুনাওয়ারায় সেই অপকর্মের তুফান প্রতিষ্ঠা করল, যা কল্পনা করতেই হৃদয় কেঁপে উঠে। এরা মদীনাবাসী ও নবীজির প্রতিবেশীদের ওপর চরম নির্যাতন চালাল। হত্যা, মারধর ও লুটতরাজরে বাজার প্রতিষ্ঠা করল। জোর করে ইয়াযিদের নামে বায়াত গ্রহণ করতে বাধ্য করল। হেরেমবাসীদের মধ্যে কেউ উচ্চবাচ্য করলে তাকে শহীদ করা হল। অনেক লোক ইয়াযিদের সৈন্যদের নির্যাতনের ফলে এলাকা ছেড়ে চলে গেল। আর যারা দেশত্যাগ করেনি, তাদের মধ্যে সতেরশত মুহাজির ও আনসার সাহাবী, সাতশত হাফেয, তাবেঈন ও পর্দানশীল রমণীকূলসহ প্রায় দশ হাজার নিরহ ঈমানদারকে শহীদ করা হল এবং তাদের ঘরবাড়ী লুট করা হল। এ যালিমরা তিনদিন পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারার হেরমকে বৈধ ঘোষণা করে যে বর্বরতা ও পাশবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পবিত্র মদীনার সতী রমণীদের বে-পর্দা করা হল। হুযুর নবী করিম (দ.) এর বর্ষিয়ান সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) যিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি মসজিদে নববীতে নামায আদায় করতে বের হলে ইয়াযিদের সৈন্যরা জিজ্ঞাসা করল- আপনি কে? তিনি বললেন- আমি সৈয়্যদুল মুরসালীনের সাহাবী, আমার নাম আবু সাঈদ খুদরী। সেই যালিমরা একথা শুনামাত্র তাঁকে দাঁড়ি ধরে জোরে থাপ্পর মারল এবং অপমানিত করে ঘরে ফিরিয়ে দিল। (নাউযুবিল্লাহ)

এ বদবখ্‌তরা মসজিদে নববীর স্তম্ভের সাথে তাদের ঘোড়া বাঁধল। তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে নামায, আযান ও ইকামত হতে দেয় নি। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রা.) তাবেঈ বলেন- 'আমি পাগলের বেশ ধরে মসজিদে নববীর মিম্বরের পাশে আত্মগোপন করলাম। একবার আমাকে ধরে পাগল মনে করে ছেড়ে দিল। এ সময় দু'জাহানের সর্দার হুযুর নবী করিম (দ.) এর মাযার ছেড়ে ঘরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। তিনদিন পর্যন্ত আমি মসজিদে অবস্থান করলাম। এ সময়ে মসজিদে আযানও হল না, নামাযও হল না। মহান আল্লাহর শপথ! যখন নামাযের সময় হত তখন রওযা মুবারক হতে আযান, ইকামত ও জামাতের আওয়ায আমি শুনতে পেতাম। আমি এ তিনদিন রওযা মুবারকের সেই আওয়াজকে অনুসরণ করে নামায আদায় করেছি।'

হত্যা লুটতরাজের ভয় দেখিয়ে মুসলিম ইবনে উকবা ইয়াযিদের নামে বায়াত গ্রহণ করার জন্য আহবান জানালে কিছু কিছু লোক প্রাণের ভয়ে বায়াত গ্রহণ করল এবং কিছু লোক প্রাণের ভয় না করে তা প্রত্যাখ্যান করল। এ সময় এক কুরাইশী বলল- আমি বায়াত গ্রহণ করলাম আনুগত্যের ওপর, নাফরমানীর ওপর নয়। মুসলিম ইবনে উকবা তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। যখন তাকে হত্যা করা হল তখন তার মা ইয়াযিদ বিনতে আবদুল্লাহ আল্লাহর নামে শপথ করল- যদি আল্লাহ আমাকে শক্তি দেন তবে আমি এ যালিম মুসলিম ইবনে উকবাকে মৃত বা জীবিত আগুনে জ্বালিয়ে মারব। অতঃপর যখন সে যালিম মদীনার পরে মক্কায় আক্রমণের জন্য রওনা হল। পথিমধ্যে অর্ধাঙ্গ হয়ে সে মৃত্যুবরণ করল। তার স্থানে ইয়াযিদের নির্দেশে হোসাইন ইবনে নোমাইরকে সেনাপতি করা হল। মুসলিম ইবনে উকবাকে সেখানে দাফন করে তারা মক্কার পথে অগ্রসর হল। ইয়াযিদী সৈন্যবাহিনী চলে যাওয়ার পর কুরাইশী শহীদের মাতা কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সেই স্থানে আসেন যেখানে মুসলিম ইবনে উকবাকে দাফন করা হয়েছিল। তাকে আগুনে জ্বালিয়ে তার শপথ পূর্ণ করাই উদ্দেশ্য। যখন তারা তার কবর

খুঁড়ল তখন দেখতে পেল- একটি অজগর সাপ তার গলার বেড়ি হয়ে তার মাথার মগজ খাচ্ছে। এ অবস্থা দেখে তারা সকলে ভয় পেল এবং সেই রমণীকে বলল- আল্লাহ যখন এ পাষন্ডের জন্য শাস্তির জন্য ফেরেশতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সুতরাং আপনি তাকে জ্বালানোর ইচ্ছা ত্যাগ করুন। সে রমণী বললেন- না, আমি আমার শপথ অবশ্যই পূর্ণ করব এবং তাকে জ্বালিয়ে আমার অন্তর শান্ত করব। বাধ্য হয়ে লোকেরা তার কবরের পায়ের দিকে খুঁড়তে চেষ্টা করল। যখন সেদিক থেকে মাটি সরাল তখন দেখল পায়ের মধ্যে একটি অজগর সাপ বেড়ি হয়ে তাকে দংশন করছে। সকলে অনুরোধ করল- 'এবার আপনি আপনার ইচ্ছা পরিবর্তন করুন, তার জন্য আল্লাহর এ শাস্তিই যথেষ্ট।' কিন্তু সেই রমণী কিছুতেই মানলেন না। তিনি ওযু করলেন, দু'রাকাত নামায পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন- 'আল্লাহ! তুমি জান এ যালিমের প্রতি আমার রাগ শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্য। আমাকে এ শক্তি দাও যেন আমি আমার শপথ পূর্ণ করতে পারি।' এ দোয়া করার পর রমণী একটি লাঠি নিয়ে উভয় পাশের অজগর সাপকে মারতেই এরা চলে গেল। অতঃপর তিনি মুসলিম ইবনে উকাবার লাশ কবর থেকে বের করে জ্বালিয়ে দিলেন।

মুসলিম ইবনে উকাবার কারণে হত্যা লুটতরাজ এত বেশী হয়েছিল এবং মদীনা পাকের পবিত্রতা বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে এতবেশী সীমালঙ্ঘন হয়েছিল, যার কারণে তার নামই ইতিহাসে 'মুসরিফ' (সীমালঙ্ঘনকারী) হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ (দ.) মদীনা পাক সম্পর্কে বলেছেন-

من اراد اهل المدينة بسوء اذابه الله كما يذوب الملح فى الماء ـ خلاصة الوفاء

"যে ব্যক্তি মদীনাবাসীর অনিষ্ট করতে ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে এভাবে নিঃশেষ করবেন যেভাবে পানি লবণকে নিঃশেষ করে।" (খোলাসাতুল ওয়াফা)

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন- হুযুর নবী করিম (দ.) ইরশাদ করেন-

من اخاف اهل المدينة ظلما اخافه الله و عليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين لايقبل الله يوم القيامة صرفا و عدلا

"যে ব্যক্তি বিনা কারণে মদীনাবাসীকে সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করবেন। তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের লা'নত হবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার কোন আমল কবুল করবেন না।" (জযবুল কুলুব)

উপরিউক্ত হাদীস হতে প্রমাণিত হল যে, মদীনা ও মদীনাবাসীকে অপমান করার শাস্তি কেমন হবে।

ইয়াযিদ ও তার সৈন্যবাহিনীর পরিণতি কী তা কুরআন মজীদের এ আয়াতে বিদৃত হয়েছে-

ان الذين يوذون الله و رسوله لعنهم الله فى الدنيا و الاخرة و اعد لهم عذابا مهينا ـ ৩৩:৫৭

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দ.)কে কষ্ট দেয় তাদের ওপর দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর অভিশম্পাত এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

**মক্কা মুকাররমায় হামলা :**

ইয়াযিদ সিংহাসনে বসার পর পরই মদীনার গভর্ণর ওয়ালিদ ইবনে উকবার মাধ্যমে হযরত ইমাম হোসাইন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)কে বায়াত গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। হযরত ইমাম হোসাইনকে যখন মদীনার গভর্ণর ডেকে পাঠান তখন তিনি সরাসরি ইয়াযিদের বায়াত প্রত্যাখ্যান করলেন। মদীনার গভর্ণর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকেও ডেকে





পাঠান কিন্তু তিনি তার ডাকে সাড়া দেননি। তিনি সে রাতেই মদীনা হিজরত করে মক্কায় চলে আসেন। হিজরতের পর থেকে তিনি মক্কায় শান্তিতে বসবাস করেন। যখন হেজাজবাসী ইয়াযিদের অপকর্মের কারণে তার প্রতি চরমভাবে ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করল তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের মক্কাবাসীকে ইয়াযিদের বিরুদ্ধে একত্রিত করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিলেন-

"ইরাকীরা বিশেষত কুফাবাসীরা এতবড় গাদ্দার ও মুনাফিক যে, তারা নবী দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.)কে আহবান করল এবং তাকে সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিল কিন্তু এ গাদ্দারদের দল সাহায্য-সহযযোগিতা তো করলই না বরং তারা ইয়াযিদের হুকুমতকে স্বীকার করে নিল। আর হযরত ইমাম হোসাইন অপমানের জীবন থেকে ইজ্জতের মৃত্যুকে প্রাধান্য দিলেন। শত্রুর সামনে শির অবনত করলেন না। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অনুগ্রহশীল হোন এবং তার হত্যাকারীদেরকে অপমানিত করুন। যেসব লোক ইমাম হোসাইনের সাথে এ আচরণ করেছে আমরা তাদের থেকে কিভাবে নিরাপদ হতে পারি এবং তাদের আনুগত্য গ্রহণ করতে পারি? আর সে তো আনুগত্য পাওয়ার উপযুক্ত নয়। আল্লাহর শপথ! তারা এমন এক লোককে শহীদ করেছে, যিনি ছিলেন সারারাত সেজদায় অবনতকারী এবং সারাদিন রোজা পালনকারী। নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তার চেয়ে বেশী হকদার কে ছিলেন। তিনি ধর্মীয় ও বুযুর্গীর দিক থেকে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহর শপথ! তিনি কুরআনের বিনিময়ে গোমরাহী প্রচারকারী ছিলেন না। আল্লাহর ভয়ে তাঁর কান্নাকাটির কোন সীমা ছিল না। তিনি তার রোযাগুলোকে মদ্যপানে নষ্ট করতেন না। তার খাস মজলিসে আল্লাহর যিকির বাদ দিয়ে শিকারী কুকুরের আলোচনা হত না।"

এ কথাগুলো ইবনে যুবায়ের ইয়াযিদের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন। অতঃপর ইবনে যুবায়ের (রা.) বললেন- অচিরেই ইয়াযিদ জাহান্নামের ইন্ধন হবে। (তাবারী, ৬:৩৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) এর এ ভাষণের পর লোকেরা বলল- আপনি আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করার জন্য আপনি সর্বসাধারণকে ঘোষণা দিন। তিনি প্রস্তবানুযায়ী ঘোষণা দিয়ে দিলেন। মক্কা ও মদীনার সকল লোক তার হাতে বায়াত গ্রহণ করা শুরু করল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া ব্যতীত সকলেই তার হাতে বায়াত গ্রহণ করল। লোকেরা ইয়াযিদের সকল কর্মচারীকে মক্কা ও মদীনা হতে বের করে দিল। এভাবেই হেজাজ এলাকায় ইয়াযিদের শাসন শেষ হল।

এ বিষয়ে অবহিত হওয়া মাত্র ইয়াযিদ এক বিশাল সৈন্যবাহিনী মদীনা ও মক্কা আক্রমণের জন্য প্রেরণ করল। এ বাহিনী মদীনার ওপর যে নির্মম পাশবিকতা চালিয়েছে তার বিবরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। মদীনা আক্রমণের পর তারা হোসাইন ইবনে নুমাইরের নেতৃত্বে মক্কায় হামলা করল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের মক্কায় অবরুদ্ধ হন। ইয়াযিদ বাহিনী চুষট্টি দিন মক্কা অবরুদ্ধ করে রাখে। লোকদের ব্যভিচারে হত্যা করল এবং কা'বাগৃহে এতবেশি পাথর নিক্ষেপ করল যে পুরো এলাকা পাথরে ভরে গেল।

"এ মিনজনিক সেই উষ্ট্রির ন্যায় যা দ্বারা এ মসজিদের দেওয়াল পাথর নিক্ষেপ করে ক্ষত-বিক্ষত করা হল।"

এ বে-দ্বীনরা কা'বাগৃহে এতবেশী পাথর নিক্ষেপ করেছিল, যার ফলে কা'বার দেওয়ালে আগুন ধরে গিয়েছিল। কা'বার পবিত্র গিলাফ ও দেওয়াল পুঁড়ে গিয়েছিল এবং মসজিদে হারামের স্তম্ভ ভেঙ্গে গিয়েছিল। ইয়াযিদবাহিনীর এ নির্মম বর্বরতা ও পাশবিকতায় হেরমে কা'বা বে-নেকাব হয়ে পড়েছিল। দু'মাস যাবৎ মক্কাবাসীরা বড় কষ্টে দিনাতিপাত করেছিল।

যুদ্ধ চলাকালীন খবর আসল যে, বদবখ্ত ইয়াযিদ মৃত্যুবরণ করেছে। যেইমাত্র ইয়াযিদের মৃত্যু সংবাদ আসল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বললেন- হে, সিরিয়াবাসী! তোমাদের শয়তানের মৃত্যু হয়েছে। ইয়াযিদের মৃত্যুর পর ইয়াযিদবাহিনীর শক্তি সাহস খর্ব হল এবং ইবনে যুবায়ের ও তার সঙ্গী-সাথীদের

সাহস বৃদ্ধি পেল। তারা ইয়াযিদবাহিনীর ওপর আক্রমণ শুরু করলে ইয়াযিদবাহিনী সিরিয়ার প্রত্যাবর্তন করল। এভাবে মক্কা ও মক্কাবাসী ইয়াযিদের বর্বরতা থেকে রক্ষা পেল।

যারা ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত কাহিনী এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর অমীয় বাণী বর্ণনা করেছেন, তারা হলেন-

১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.);
২. হযরত উম্মুল ফযল (রা.);
৩. হযরত আনাস (রা.);
৪. উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.);
৫. হযরত আবু হোরায়রা (রা.);
৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.);
৭. হযরত আবি সালমা (রা.);
৮. হযরত মুহাম্মদ ইবনে ওমর (রা.);
৯. হযরত ইয়াহইয়া হাদরামী (রা.) ও
১০. হযরত আসবাগ ইবনে বানানাহ (রা.)।

**কারবালার প্রান্তরে নবী পরিবারসহ সকল শহীদের নাম তালিকা :**

কারবালার ময়দানে ইমাম হোসাইনসহ মোট ৭২ জন শহীদ হন। যাদেরকে বনূ আসাদ গোত্রের লোকেরা পরদিন দাফন করেন।

**নবীপরিবারের মধ্যে যারা শাহাদত বরণ করেন তাঁরা হলেন-**

**ইমাম আলী মকাম এর ভাইগণের মধ্যে-**

১. হযরত জাফর (রা)
২. হযরত আব্বাস (রা)
৩.হযরত মুহাম্মদ (রা)
৪. হযরত ওসমান (রা)
৫. হযরত আবু বকর (রা)

**ইমাম আলী মকাম এর পুত্রগণের মধ্যে-**

৬. হযরত আলী আকবর (রা.)
৭. হযরত আলী আসগর (রা.)

**হযরত ইমাম হাসান (রা.) এর পুত্রগণের মধ্যে-**

৮. হযরত আবদুল্লাহ (রা)
৯. হযরত কাসেম (রা)
১০. হযরত আবুবকর (রা)

**হযরত জাফর (রা.) এর পুত্রগণের মধ্যে-**

১১. হযরত আউন (রা)
১২. হযরত মুহাম্মদ (রা)

**হযরত আকীলের (রা.)পুত্রগণের মধ্যে-**





১৩. হযরত জাফর (রা)
১৪. হযরত আবদুল্লাহ (রা)
১৫. হযরত আবদুর রহমান (রা)
১৬. হযরত মুসলিম ইবনে আকীল (রা), যিনি কূফায় পূর্বেই শাহাদত বরণ করেন।
১৭.হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে আকীল (রা)
১৮. মুহাম্মদ ইবনে আবু সাঈদ ইবনে আকীল (রা) শাহাদত বরণ করেন। (বেদায়া নেহায়া- ৮:১৮৯)
১৯. হযরত আলী ইবনে আব্বাস (রা.)

**৭২জনের মধ্যে বাকী শহীদগণের নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হল :**

**কারবালায় শহীদ হযরত রাসূলে খোদা (দ.) এর সাহাবীগণ :**

২০. হযরত হাবীব ইবনে মুজাহের (রা.)
২১. হযরত মুসলিম ইবনে আউসাজা আল আসাদী (রা.)
২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের আল কালবী (রা.)
২৩. হযরত আনস ইবনে হারেস (রা.)
২৪. হযরত বুরাইর ইবনে হোদাইর হামেদানী (রা.)
২৫. হযরত জুহাইর ইবনে কাইন বাজালী (রা.)
২৬. হযরত হাজ্জাজ ইবনে মাসরুক আল জু'ফী (রা.)

**ইমাম হোসাইন (রা.) এর সঙ্গী-সাথীগণ :**

২৭. হযরত আবদুল্লাহ উমাইর আল কালবী (রা.)
২৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আযরা আল গেফারী (রা.)
২৯. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আযরা আল গেফারী (রা.)
৩০. হযরত নাফে ইবনে হেলাল আল জামালী (রা.)
৩১. হযরত জাবের ইবনে হাজ্জাজ আততামীমী (রা.)
৩২. হযরত জাবালা ইবনে আলী আশ শায়বানী (রা.)
৩৩. হযরত জুনাদা ইবনে হারেছ ইবনে সুলায়মান (রা.)
৩৪. হযরত জুনাদা ইবনে কা'ব আনসারী (রা.)
৩৫. হযরত হানযালা ইবনে আসয়াদ আস শাবামী (রা.)
৩৬. হযরত হাবাশ ইবনে কাইস নাহমী (রা.)
৩৭. হযরত যাইন ইবনে মালেক আততাইমী (রা.)
৩৮. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আব্দে রাব্বিহী আল আনসারী (রা.)
৩৯. হযরত উমর ইবনে জুনাদা (রা.)
৪০. হযরত আমর ইবনে কারজা আল আনসারী (রা.)
৪১. হযরত ওহাব ইবনে আবদুল্লাহ আল কালবী (রা.)
৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বাশার খেলমী (রা.)
৪৩. হযরত ওয়াকিয়া ইবনে সাঈদ ইবনে আল হাতেম আততায়ী (রা.)
৪৪. হযরত আসমার ইবনে হেশাম ইবনে আল হাতেম আততায়ী (রা.)
৪৫. হযরত মুসলিম ইবনে কুজাইর ইবনে আল হাতেম আততায়ী (রা.)
৪৬. হযরত আসলাম আত তুরকী (রা.)

৪৭. হযরত সাইফ ইবনে হারেছ ইবনে সুরাইহ (রা.)
৪৮. হযরত হারেছ ইবনে সুরাইহ (রা.)
৪৯. হযরত কাসেম ইবনে হাবীব (রা.)
৫০. হযরত মাসউদ ইবনে হাজ্জাজ আততাইমী (রা.)
৫১. হযরত যিয়াদ ইবনে গরিজ আস শায়দাবী (রা.)
৫২. হযরত জাহের ইবনে আমর আল কিন্দী (রা.)
৫৩.হযরত সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ আল হানাফী (রা.)
৫৪. হযরত সালমান ইবনে নাযার আল বাজালী (রা.)
৫৫. হযরত সুয়ায়েদ ইবনে আমর ইবনে আবি মোতা আল খাসযামী (রা.)
৫৬. হযরত সাইফ ইবনে মালেক আবদী (রা.)
৫৭. হযরত জারগাসা ইবনে মালেক তাগলবী (রা.)
৫৮. হযরত শোওযাব ইবনে আবদুল্লাহ আশ শাকেরী (রা.)
৫৯. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সালেম আল ইযদী (রা.)
৬০. হযরত আবেস ইবনে আবী শাবীব শাকেরী (রা.)
৬১. হযরত উমর ইবনে আবদুল্লাহ জুন্দী (রা.)
৬২. হযরত মাওকা ইবনে সামানা (রা.)
৬৩. হযরত নোমান ইবনে আমর আররাসি (রা.)
৬৪. হযরত আয়েদ ইবনে যিয়াদ কাবাদী (রা.)
৬৫. হযরত আয়েদ ইবনে মগভীল খাওকী (রা.)
৬৬. হযরত হোর ইবনে ইয়াযিদ (রা.)
৬৭. হযরত মুয়াস ইবনে ইয়াযিদ আররিয়াহী (রা.)
৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ আররিয়াহী (রা.)
৬৯. হযরত আবদে আলা ইবনে ইয়াযিদ আররিয়াহী (রা.)
৭০. হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর খাদেম- হযরত মুনজেহ (রা.)
৭১. হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর দুধভাই- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুকতুর (রা.)
৭২. হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর গোলাম- হযরত আবু যর (রা.)

এছাড়াও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর পত্র নিয়ে কূফায় গমনকারী হযরত কায়েস ইবনে মুসাহহার (রা.) নরপিশাচ ইবনে যিয়াদের হাতে শাহাদত বরণ করেন।

মহামহিম প্রভূর কাছে ফরিয়াদ, এসকল শহীদের ফয়ূজ যেন দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে আমাদের নসীব হয়। আমিন।

---

মূল : শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল ক্বাদেরী
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ
প্রভাষক- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।





# পবিত্র মুহাররম, আশুরা এবং আহলে বাইত

মাওলানা মুহাম্মদ বখতেয়ার উদ্দীন*

মুহাররম চান্দ্রবৎসরের প্রথম মাস। ফযিলতের বিবেচনায় রমজান শ্রেষ্ঠ হলেও তার পরের স্থান মুহাররমের। আক্ষরিক অর্থে মুহাররম মানে সম্মানিত। সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা-দূর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এ মাসেই। আর এ মাস আলোচিত হয়েছে একটি বিশেষ কারণে। তার নাম আশুরা।

হযরত মায়মুন ইবনে মেহরান এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (দ.) ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি মুহাররমের দশ তারিখ রোযা রাখে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে দশ হাজার ফেরেশতা, দশহাজার শহীদ, দশ হাজার হজ্ব ও ওমরাহকারীর সওয়াব দান করবেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.)হতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে নবী পাক (দ.) ইরশাদ করেন- রমজানের রোযার পর উত্তম রোযা হল মুহাররম মাসের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হল তাহাজ্জুদের নামায। সূত্র : মুসলিম শরীফ, মিশকাত ১৭৬ পৃ.

**মুহাররমের দশ তারিখে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী :**

১. আশুরার দিনে আল্লাহ পাক লওহ-কলম সৃষ্টি করেছেন।
২. এ দিনে আল্লাহ পাক আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন।
৩. হযরত জিব্রাঈল (আ.) এবং মুকাররাবীন ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মুহাররমের দশ তারিখে।
৪. হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হয়েছে এই দিবসে এবং বেহেশত হতে অবতরণের সাড়ে তিনশত বৎসর পর তাঁর দোয়া কবুল হয়েছিল আশুরার এই দিনে।
৫. আশুরার দিনেই আল্লাহ পাক হযরত ইদ্রিস (আ.) কে অতি উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন।
৬. হযরত নূহ (আ.) এর অনুসারীদেরকে তুফান থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল এই দিবসেই।
৭. মুহাররমের দশ তারিখেই হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে নমরূদের অগ্নিকুন্ড হতে নাজাত দেয়া হয়েছিল।
৮. হযরত ইয়াকুব (আ.) এর কাছে হযরত ইউসুফ (আ.)কে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল এই দিনেই।
৯. আশুরার দিনেই হযরত ইউনুস (আ.)কে মাছের পেট হতে মুক্তি দেয়া হয়েছিল।
১০. আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আ.)কে ফেরআউনের কবল হতে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ফেরআউনকে তার দলবলসহ নীল নদীতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন এই দিনেই।
১১. এ দিনেই আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আ.) এর তাওবা কবুল করেছিলেন।
১২. আশুরার দিনে আল্লাহ পাক রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন।
১৩. সর্বশেষ হিজরী ৬১ সনের মুহাররমের দশ তারিখ আমাদের প্রিয়নবীজির (দ.) আদরের দুলাল, মা ফাতিমার (রা.) কলিজার টুকরো ইমাম হোসাইন (রা.) কুখ্যাত ইয়াযিদের কালো হাত থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে কারবালা ময়দানে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন।
১৪. পরিশেষে এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (দ.) মদীনা শরীফে এসে দেখতে পেলেন যে, ইহুদীরা আশুরা দিবসে রোযা পালন করছে। নবীজি তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল- এ দিনে আল্লাহ পাক আমাদের নবী হযরত মূসা (আ.)কে ফেরআউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন

এবং ফেরআউনকে নীল নদে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। আমাদের নবীর নাজাতের শোকরিয়া আদায়ের জন্য আমরা এ দিবসে রোযা পালন করে থাকি। নবীজি ইরশাদ করলেন- তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা (আ.)এর আরো নিকটবর্তী ও ঘনিষ্ট। এরপর হতে নবী পাক (দ.) প্রতিবছর এদিনে নিজেও রোযা রাখতেন এবং উম্মতদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন।

সূত্র : বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃ. ১৮০

'গুনিয়াতুত ত্বালেবীন' গ্রন্থে রয়েছে- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি আশুরার রোযা রাখবে, আল্লাহ তায়ালা তার আমলনামায় ষাট বছরের নামায-রোযার সওয়াব দান করবেন এবং তাকে এক হাজার শহীদের সওয়াব দান করবেন।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে আশুরার গুরুত্ব এবং মুহাররমের তাৎপর্য আর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে যা সবচেয়ে বেশী আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত তা হলো- ঐতিহাসিক কারবালার ময়দানে আহলে বায়তে রাসূলের আত্মত্যাগ। সেদিন আওলাদে রাসূল ইমাম হোসাইন (রা.) সহ আহলে বায়তের ৭২ জন সদস্যের কুরবানীর বিনিময়ে ইসলাম বিশ্বের বুকে আবার জীবিত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত বেঁচে আছে।

**আহলে বায়ত উম্মতের মুক্তির ঠিকানা :**

হযরত আবু জর (রা.) বর্ণনা করেন- আমি নবী পাক (দ.) এর কাছে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন- আমার আহলে বায়ত তথা আমার বংশধরের দৃষ্টান্ত হল- হযরত নূহ (আ.) এর জাহাজের ন্যায়। যে এতে আরোহন করেছে মুক্তি পেয়েছে; আর যে বিমুখ হয়েছে সে ধ্বংস হয়েছে।

সূত্র : মুসনদে আহমদ, মিশকাত পৃ. ৫৭৩

**আহলে বায়ত কারা :**

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে পাক (দ.) ভোর বেলায় তাঁর হুজরায় (কক্ষে) প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর দেহ মুবারকে ছিল কাল নকশাবিশিষ্ট চাদর। একটু পরে ফাতিমা (রা.) আসলে নবীজি তাঁকে চাঁদরের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। এরপর আসল মওলা আলী (রা.)। নবীজি তাঁকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। অতঃপর আসলেন ইমাম হাসান ও হোসাইন। নবীজি তাদের উভয়কেও চাদরে আবৃত করে নিলেন আর কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন-

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم بطهيرا

অর্থ : হে আহলে বায়ত! নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

অতঃপর দোয়া করলেন- اللهم هولاء اهل بيتى و خاصتى فاذهب عنهم الرجس و طهركم تطهيرا

অর্থ : হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বায়ত এবং ঘনিষ্টজন। আপনি এদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভুত করুন আর এদেরকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করুন।

কেউ কেউ বলেন- এই দোয়া করার পরই আয়াতখানা অবতীর্ণ হয়েছিল।

**আহলে বায়তকে মুহাব্বতের গুরুত্ব :**

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর হতে নবীজি (দ.) খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমাতুয যাহরা (রা.) এর ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতেন- 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বায়ত, ইন্নামা ইউরীদুল্লাহ লিইউযহিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল বায়তে ওয়া ইউতাহ্হিরাকুম তাত্বহীরা।'





হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর মতে, এই আমল সাতদিন পর্যন্ত জারি ছিল।

হযরত জাবির (রা.) বলেন- 'আমি বিদায় হজ্বের দিন আরাফাতের ময়দানে হুযুরে আকরম (দ.)কে কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর ওপর আরোহিত অবস্থায় বলতে শুনেছি- 'হে লোকেরা! আমি তোমাদের মধ্যে যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা মজবুতভাবে ধারণ করে রাখতে পার তাহলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হল, আল্লাহর কিতাব এবং আমার বংশধর।'

সূত্র ঃ তিরমিযী, সূত্র : মিশকাত পৃ. ৫৬৫

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন- 'আল্লাহর কসম করে বলছি যার কুদরতি হাতে আমার জীবন, নিশ্চয় আমার আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা নবীজির আত্মীয় স্বজন আমার নিকট অধিক প্রিয়।'

সূত্র : বুখারী শরীফ

একদা হযরত আবু হোরায়রা (রা.) নিজের গায়ের চাদর দিয়ে ইমাম হোসাইন (রা.) এর চরণযুগল মুছে দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় ইমাম হোসাইন (রা.) একটু বিচলিত কণ্ঠে বলে উঠলেন- হায়! হায়! আপনি এ কি করছেন? জবাবে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বললেন- হে নবীজাদা! আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আপনাদের মহান মর্যাদা সম্পর্কে আমি যা জানি তা অন্য লোকেরা জানলে সবাই আপনাদেরকে কাঁধের ওপর নিয়ে ঘুরে বেড়াত।

ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন- একদা খলিফা হেশাম ইবনে আবদুল মালিক কা'বাঘর তাওয়াফকালে হাজারও চেষ্টা করেও হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে পারছিলেন না। হঠাৎ দেখলেন মানুষের ভীড় কমে গেল এবং আর লোকেরা দু'দিকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অমনি একজন সুদর্শন পুরুষ সহজে গিয়েই হাজরে আসওয়াদ চুম্বন দিয়ে আসলেন। হিশাম ইবনে আবদুল মালিক চিন্তা করলেন এতবড় খলিফা হওয়ার পরও কেউ তার জন্য একটু রাস্তা করে দিল না, আর এই লোকটাকে সবাই তার সম্মানে রাস্তা করে দিল! এ অবস্থা দেখে সিরিয়াবাসী এক লোক বলে ওঠল, ইনি কে? যাকে মানুষ এত সম্মান করছে? অথচ খলিফার প্রতি কারো কোন দৃষ্টিই নাই? খলিফা সেই বুযুর্গ ব্যক্তিকে চিনতে পারলেন, ইনি আওলাদে রাসূল ইমাম যইনুল আবেদীন (রা.)। চেনার পরও ঈর্ষান্বিত হয়ে বললেন- আমি তাকে চিনি না। একথা শুনে সেখানে উপস্থিত আরবের একজন প্রসিদ্ধ কবি ফরযদাক বলে ওঠলেন-

هذا الذى تعرفه البطحاء و طأته + و البيت يعرفه و الحل و الحرم

"ইনি তো সেই ব্যক্তি যাকে মক্কার পাথুরে ভূমি আর সমতল ভূমিও চেনে। আরো চেনে বায়তুল্লাহর হিল আর হেরেম শরীফ।"

আহলে বায়তে রাসূলের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায়। আর তিনিই তাদের ভালবাসার প্রতি তাকিদ দিয়েছেন কুরআনে করীমে। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة فى القربى

অর্থ : হে রাসূল! আপনি বলুন, (আমার উম্মতরা!) আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। কেবল চাই আমার বংশধরদের প্রতি তোমাদের ভালবাসা।

তাফসীরে মুযহেরীর লেখক আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.)'র উস্তাদ আল্লামা মির্যা মুযহের জানে জানাঁ (র.) বলতেন- আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসা ঈমানের ভিত্তি। সেই মহাত্মাগণের প্রতি ভালবাসা ব্যতিত আমার কোন আমলই নাজাতের উসিলা নয় বলে আমি মনে করি।

তিনি আহলে বায়তের প্রতি মুহাব্বত আর শ্রদ্ধার কারণে আওলাদে রাসূল তথা সৈয়দ বংশের লোকদেরকে সীমাহীন সম্মান করতেন। এমনকি ছাত্রদেরকে পাঠদানের সময় যদি আশে পাশে আওলাদে রাসূলের কোন ছোট শিশুকেও খেলাধুলা করতে দেখতেন সাথে সাথে দাঁড়িয়ে সম্মান করতেন। এমনকি যতক্ষণ তাদেরকে দেখা যেত ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন।

মাওলানা মুহাম্মদ বখতেয়ার উদ্দীন
প্রভাষক, কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া মাদ্রাসা,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

SahihAqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)





# ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদাত : নবী চরিত্রের একটি অধ্যায়

মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আবছার তৈয়বী*

ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়, দু'টি বিষয় ইসলামের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে আলোচিত ও আলোড়িত হয়েছে, অন্য কোন বিষয় এত আলোচিত ও আলোড়িত হয়নি। একটি হল সীরাতুন্নবী (দ.) বা নবী করিম (দ.) এর পূর্ণাঙ্গ জীবন-যাপন পদ্ধতি। অন্যটি হল- শাহাদাতে ইমাম হোসাইন (রা.)।

**সীরাতুন নবী (দ.) ও ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত :**

অসংখ্য ধর্মবেত্তা বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের দিক-নির্দেশনার জন্য তাশরীফ এনেছেন, তাদের সীরাত এবং জীবনের ওপর তাঁদের অনুসারীরা অনেক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। কিন্তু নবীয়ে আকরম (দ.) ছাড়া কোন শ্রেণী-পেশার মানুষ ও জাতির মধ্যে এমন কোন পথপ্রদর্শক নেই, যার জন্ম থেকে ওফাত পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেক দিকের বিস্তারিত বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে এবং জন্ম থেকে ওফাত পর্যন্ত তাঁর জীবনের এমন কোন অংশ নেই, যার বর্ণনা আমাদের কাছে বিদ্যমান নেই। চৌদ্দশ' বছর চলে যাওয়ার পরও সীরাতুন নবী (দ.) এর কোন দিক আমাদের দৃষ্টির বাইরে নেই। এ প্রেক্ষিতে হুযুরে আকরম (দ.) এর সীরাত একটি আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিষয়। ঠিক সেভাবে সত্য ও মিথ্যার, ভাল ও মন্দের লাখো সংঘর্ষ হয়েছে, হাজারো শাহাদাত সংঘটিত হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও অসংখ্য শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে; কিন্তু অদ্যাবধি কোন শাহাদাত এভাবে গ্রহণযোগ্য, স্মরণযোগ্য ও প্রচার পায়নি, যেভাবে ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত পেয়েছে। সাড়ে তেরশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত আজও প্রাণবন্ত। তার প্রচার ও স্মরণ কমছে না; বরং দিন দিন তা বাড়ছেই। এমনকি হোসাইনিয়্যাত (ইমাম হোসাইনের আদর্শের অবস্থান) প্রত্যেক স্তরে সত্য, আর এজিদিয়াত (এজিদের আদর্শ) প্রত্যেক স্তরে ফিতনা ফ্যাসাদের নিদর্শন হয়ে রয়েছে।

**শাহাদাতে ইমাম হোসাইন (রা.) নবী চরিত্রের একটি অধ্যায় :**

অসংখ্য নবী (আ.) ও সাহাবী (রা.) শাহাদাতের নেয়ামত দ্বারা ধন্য হয়েছেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, নবী না হয়েও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) যে খ্যাতি লাভ করেছেন, তা অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি। শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হওয়ার কারণে নবীয়ে আকরম (দ.) এর স্মরণ কিয়ামত পর্যন্ত জীবন্ত থাকবে। কেননা, হুযুরে আকরম (দ.) এর নবুওয়ত বিশ্ব বিস্তৃত, যা স্থান কাল এর সীমা অতিক্রম করেছে। এজন্য এটা তাঁর পবিত্র স্মরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, তা সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং কখনও শেষ হবে না; কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য যদি শাহাদাতে হোসাইন (রা.) এর স্মরণের দৃষ্টিতে দেখা হয় তো অন্তর সেদিকে যায় যে, ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত হুযুর আকরম (দ.) এর সীরাতে তৈয়্যবার পবিত্র কিতাবের কোন অধ্যায় নয় তো? আল্লাহ তায়ালা সীরাতুন্নবী (দ.) এর এ দিকের পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য তাঁর সন্তান সায়্যিদিনা ইমাম হোসাইন (রা.) কে নির্বাচিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শাহাদাতে ইমাম হোসাইন (রা.) এর স্থায়ী স্মরণ ও খ্যাতি এজন্য যে, এ শাহাদাত মূলত সীরাতুন নবী (দ.) এর একটি অধ্যায়। হুযুর (দ.) এর জীবনের নানা দিকের একটি দিক এবং তাঁর ফাযায়েল ও কামালাতের একটি অংশ। এ শাহাদাতের অস্তিত্ব মুস্তফা (দ.) এর সীরাত থেকে আলাদা নয়। ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত যে নবী করিম (দ.) এর পবিত্র জীবনের একটি অধ্যায় এটা প্রমাণ করার জন্য ভূমিকা হিসেবে আমরা এটাই বলব যে, 'শাহাদাত' আল্লাহর নেয়ামতসমূহের মধ্যে একটি মহান নেয়ামত। কেননা, আল্লাহ

তায়ালা তাঁর পুরস্কৃত বান্দাদের মধ্যে শহীদদেরও গণ্য করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

من يطع الله و الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين ـ النساء:٦٩

অর্থ : 'যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে আল্লাহর পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাদের-নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালেহীনদের সাথে হবে।' (সূরা নিসা-৬৯)

আর তারা সেই পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দা, যাদের পথকে আল্লাহ তায়ালা 'সিরাতে মুস্তাকীম' বলেছেন এবং সে পথের নির্দেশনা চাওয়ার কথা বলেছেন।

**সূরা ফাতেহা ও হেদায়াত চাওয়া :**

সূরা ফাতেহার মধ্যে সকল মুসলমানকে সে দোয়ার কথা স্মরণ করে দিয়েছেন-

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ـ الفاتحة:٥,٦

অর্থ : (হে আল্লাহ!) আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন; সে লোকদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছে। (সূরা ফাতেহা- ৫-৬)

اهدنا الصراط المستقيم এর শব্দসমূহের সাথে আল্লাহর দরবারে মানুষের অন্তর থেকে এই ডাক সুউচ্চ হয় যে, হে রাব্বুল আলামীন! আমাদের বলে দাও যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? আমাদের জীবনের ঠিকানা কোথায়? যা অর্জনের জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

যখন উদ্দেশ্যের অনুভূতি জেগে উঠে এবং জীবনের ঠিকানা নির্দিষ্ট হয়ে সামনে আসে তখন বান্দার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ডাক উঠে, 'হে হেদায়াত দানকারী! আমাদেরকে মনযিলে মাকসুদে পৌছে দিন'। তবে হেদায়াতের উদ্দেশ্য দু'টি বিষয় ছাড়া পূর্ণ হয় না; বরং তার জন্য জরুরী যে, মনযিলে মাকসুদে পৌছার নিশ্চয়তা সহজে অর্জিত হওয়া। কেননা, জীবনের এই কণ্টাকাকীর্ণ সফর বড়ই বিপদজনক। বেশকিছু শক্তি মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য নিয়োজিত। শয়তানের সবচেয়ে বড় হামলাও সিরাতে মুস্তাকীমে হয়। কুরআন মজীদ নিজেই সাক্ষ্য দেয় যে, ইবলীশ আল্লাহর দরবারে কসম খেয়ে বলেছিল-

لاقعدن لهم صراطك المستقيم ـ الاعراف: ١٦

অর্থ : নিশ্চয় আমি মানুষের পথভ্রষ্ট করার জন্য তোমার রাস্তায় প্রতিবন্ধক হয়ে বসে থাকব। (সূরা আরাফ-১৬)

সুতরাং হে প্রভু! আমাকে দৃঢ়পদে থাকার তৌফিক দাও যে, আমি সত্যি যেন নিজের ঠিকানায় পৌছতে পারি। যেন এমন না হয় যে, সঠিক পথে চলতে চলতে পদস্খলিত হয়ে যাই এবং নিজ ঠিকানায় পৌছতে ব্যর্থ হই। অতএব, আমাকে সে পথে পরিচালিত কর, যা নিরাপদ ও সংরক্ষিত; যাতে না আছে ডাকাতের ভয়, না শয়তান কর্তৃক পদস্খলিত হওয়ার ভয়; যে পথে চললে দৃঢ়পদে থেকে উদ্দেশ্য হাসিল হয়। সুতরাং হেদায়াত এর বিষয় এবং সিরাতে মুস্তাকীম এর অর্থ নির্দিষ্ট করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

صراط الذين انعمت عليهم ـ الفاتحة: ٦

অর্থ : 'সেই লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ'। (সূরা ফাতেহা- ৬)

**সিরাতে মুস্তাকীম কী?**

সিরাতে মুস্তাকীম এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, সিরাতে মুস্তাকীম আল্লাহর পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাগণের পথ। যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন তবে লোকদেরকে এভাবেও দোয়া করার জন্য বলতে পারতেন যে, হে আমার বান্দারা! এভাবে দোয়া কর- "হে আল্লাহ! আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত কর; সেই পথ যা তোমার কুরআনের পথ, সেই ওহীর রাস্তা যা তুমি আসমান থেকে অবতীর্ণ





করেছ।" আর এতে কোন সন্দেহ নাই যে, হেদায়াতের প্রস্রবণ তো কুরআন এবং আল্লাহর ওহী। কিন্তু যদি শুধু এটাই বলা হয় যে, আল্লাহর কোরআন এবং আল্লাহর ওহী সঠিক পথ, তাহলে এটা কল্পনার বস্তু হত, বাস্তব নয়। কেননা, কোন দৃষ্টিভঙ্গি তখনই কার্যকর হয় যখন ব্যক্তি পর্যায়ে তার নমুনা পেশ করা যায়। আর শুধু কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবতা ততক্ষণ পর্যন্ত হেদায়ত অর্জন করতে পারে না, যতক্ষণ না সেই কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গি কোন মানুষের মধ্যে নমুনা হিসেবে চোখের সামনে প্রতিভাত না হয়। কেননা, মানুষ অনুভবকে বুদ্ধির চেয়ে ভালভাবে বুঝতে পারে।

**নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য :**

নবীগণের (আ.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এটাও যে, হেদায়াত যেন ব্যক্তির মাধ্যমে লোকদের সামনে আসে। আর সেই ব্যক্তি নমুনাকে দেখে বিশ্ব মানবতা হেদায়ত অর্জন করতে পারে। যদি শুধুমাত্র আল্লাহর ওহী ও কালামে ইলাহীর দ্বারা মাখলুকের হেদায়ত করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হত, তাহলে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে নবীগণ (আ.)কে কখনও পাঠাতেন না; বরং আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে শক্তিমান যে, তিনি তাঁর হেদায়তের বার্তা ওহী এবং এলহামের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সরাসরি পৌছে দিতেন।

মাওলানা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী (র.) উদাহরণ হিসেবে কত সুন্দরই না বলেছেন-
"আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে শক্তিমান যে, প্রত্যেক ব্যক্তি জাগ্রত হলে তার শিয়রে আল্লাহর কালাম তার হেদায়ত ও পয়গাম কাগজে লিখিত পেত যে, এটা আমার কালাম; আর এটা আমার হুকুম, এর ওপর আমল করো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এমনটি করেননি, বরং কোটি কোটি মানুষের হেদায়তের জন্য এক ব্যক্তিকে আদর্শ বানিয়েছেন, হেদায়তের মূর্ত প্রতীক বানিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন-

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة ـ الاحزاب:٢١

অর্থ : 'নিশ্চয়, রাসূলুল্লাহ (দ.) এর পবিত্র সত্তাতেই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে'। (সূরা আহযাব- ৩৩)

**ব্যক্তির মাধ্যমে হেদায়ত দান করার হিকমত :**

সাহাবায়ে কেরামগণ (রা.) হুযুর (দ.)কে স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁর কথা নিজ কানে শুনেছেন, তাঁর মজলিসে বসেছেন, তাঁর সাথে সফর করেছেন, সর্বদা তাঁর সাথে ছিলেন, লেন-দেন করেছেন, মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করেছেন, বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব তাঁর কাছে পেয়েছেন। কেননা তাঁর সাথে তাদের সরাসরি ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। সুতরাং হেদায়াত ব্যক্তির মাধ্যমে হয়ে চোখের সামনে এসে গেছে। কিন্তু তা কিতাব আকারে এবং আমলী আদর্শ পেশ করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে।

যখন হুযুর আকরম (দ.) এর বেছাল হয়ে যায় তখন তাঁর এই আমলী আদর্শ হাদীস এবং সুন্নাহ নামে গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হয়ে যায়। যদিও আমাদের সামনে তাঁর (দ.) আমলী আদর্শ কিতাবাকারে এসেছে তথাপিও আমরা হুযুর (দ.) এর কথামালা সরাসরি শোনা, নূরানী অবয়ব দেখা এবং তাঁর খেদমতে বসা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। অতএব, সাহাবায়ে কেরাম হুযুর (দ.) এর যিয়ারত এবং তাঁর থেকে যে উপকার লাভের সুযোগ পেয়েছেন তা আমাদের জন্য সহজ নয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত কারো জন্য সহজ হবে না।

কুরআন মজীদ ও হাদীসে পাক গ্রন্থাকারে আমাদের সামনে বিদ্যমান আছে। যেভাবে কুরআন মজীদের তাফসীরে ভিন্নতা আছে সেভাবে হাদীসের অর্থ নিয়েও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। স্মর্তব্য যে, এমন কোন মতভেদ সাহাবায়ে কেরামের জীবনে হয়নি। কেননা, তাঁরা সর্বদা হুযুর (দ.) এর সাথে থাকতেন। যদি কোন প্রকার মতানৈক্য দেখা দিত, তাহলে তাঁরা হুযুর (দ.) থেকে জেনে নিয়ে সাথে সাথে তা দূর করে

ফেলতেন। কিন্তু এখন যদি কেউ কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ করেন, যেমনটি বর্তমানে হচ্ছে এবং প্রত্যেকের দাবী এটাই যে, 'আমি যে অর্থ বয়ান করছি তাই-ই সঠিক এবং অন্যরা যে অর্থ করছে তা ভুল'। তাহলে কীভাবে তার সমাধান হবে? মূল কর্তৃপক্ষ কে? যে বলবে, 'এটা সঠিক আর ওটা ভুল'।

প্রকৃতপক্ষে কোরআন ও সুন্নাহ তো হেদায়তের প্রস্রবন। কোরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন অর্থের যে কোন একটিই সঠিক এবং এর অনুসরণ করা ওয়াজিব। এজন্য এমন একটি মাপকাটি হওয়া চাই, যার ওপর ভিত্তি করে পূর্ণ অর্থ বুঝা যায়, যা আসল অর্থ হিসেবে প্রতিভাত হয়। আল্লাহ তায়ালা সেই মাপকাঠি নির্ধারণ করে বর্ণনা করেছেন যে, صراط الذين انعمت عليهم ـ الفاتحة: ٦ এর সঠিক অর্থ এবং ব্যাখ্যা নির্ধারণ করতে চাইলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করে আমার সৃষ্টির সেসব লোকের আমলকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ কর, যাদের ওপর আমার অনুগ্রহ হয়েছে। আর যারা আমার গযব ও নানা প্রকার গোমরাহী থেকে নিরাপদ রয়েছেন। কেননা, তাদের চলনপদ্ধতিই সঠিক পথ। সুতরাং যে অর্থ ও ব্যাখ্যা তাদের তা-ই গ্রহণ কর এবং অন্যটি বর্জন কর।

**হেদায়ত ও গোমরাহীর নির্ধারণ মানুষের মাধ্যমে হয় :**

আল্লাহ তায়ালা হেদায়ত ও গোমরাহী মানুষের মাধ্যমে নির্ধারণ করেছেন। যাদের ওপর আমার অভিসম্পাত হয়েছে তারা গোমরাহীর দিশারী। আর যাদের ওপর আমার অনুগ্রহ হয়েছে তারাই হেদায়তপ্রাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে কোরআন মজিদ আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, যদি তোমরা হেদায়াত তালাশ করতে চাও, তবে তা তোমাদের বুদ্ধির সাহায্যে মিলবে না। কেননা, যদি তোমরা কোরআন ও সুন্নাহর একটি অর্থ নির্ধারণ করে ফেল এবং বল যে, 'এটাই কুরআন ও নবীর (দ.) হেদায়ত; বাকী সব ভুল' তবে তা প্রনিধাণ যোগ্য নয়; এর মাধ্যমে ফায়সালা করাও সম্ভব নয়। কেননা, এ দাবী তো প্রত্যেক ব্যক্তি করতে পারে; বরং গোমরাহ ব্যক্তিরা এ দাবীই করে থাকে।

সুতরাং হেদায়ত অন্বেষণকারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের মাধ্যমে বলেছেন যে, হে হেদায়ত অন্বেষণকারীগণ! আস, আমি তোমাদের বলি যে, কোনটি হেদায়তের পথ। আমি কোটি কোটি মানুষের মাঝে আমার প্রিয়নবী (দ.)কে হেদায়তের মূল কেন্দ্রবিন্দু রূপে পাঠিয়েছি। যিনি সরাসরি আমার হেদায়তকে ধারণ করেন এবং একে কর্মজীবনে আদর্শ হিসেবে মানুষের সামনে পেশ করেন। যেভাবে আমি নিজ রাসূল (দ.) এর ফয়েজের মাধ্যমে উম্মতের মধ্যেও প্রত্যেক যুগে আদর্শ কায়েম করেছি। যাদের কারণে আমার রহমত নাযিল হয়। আমার অনুগ্রহরাজি বৃষ্টির ন্যায় তাদের অন্তঃকরণে পতিত হয়। তারা সেই লোক, যাদের অন্তরের সম্পর্ক আমার মাহবুব (দ.) এবং আমার সত্তার সাথে হয়। তারা জাহেরী ও বাতেনীভাবে হেদায়তপ্রাপ্ত তারাই অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা এবং যদি কোন্ স্থানে কোন্ মতভেদ দেখা দেয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দ.) যেই মূল কথাটি বলেছেন তা কোন্‌টি? তবে তার ফায়সালা নিজ বুদ্ধিতে করো না, বরং এটা দেখ যে, আমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দারা কোন পথে চলেছেন। যে পথে তাদের চলতে দেখ, সে পথ অবলম্বন কর। সে পথই আমার রাসূল (দ.) এর পথ এবং তা-ই হেদায়তের পথ।

**অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা কারা :**

কোরআনে হাকীম যখন এ বর্ণনা দিয়েছে যে, যাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ হয়েছে তাদের পথই সঠিক পথ, তখন মনে এ প্রশ্ন আসে যে, আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা কারা? কেননা, যে কেউ এটা বলতে পারে যে, সে-ই অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

من يطع الله و الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين ـ النساء: ٦٩





অর্থ : যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের বান্দাদের মধ্যে নবীগণের, সিদ্দীকিনদের, শহীদগণের এবং পূণ্যবানদের সাথে হবে। (সূরা সিনা : ৪৯)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, চার স্তরের মানুষ আমার অনুগ্রহভাজন। প্রথম স্তর- নবীগণ, দ্বিতীয় স্তর- সত্যবাদীগণ, তৃতীয় স্তর- শহীদগণ এবং চতুর্থ স্তর- পূণ্যবানগণ।

**হেদায়তের কেন্দ্রবিন্দু কি শুধু নবীগণ?**

কিছু লোক মনে করে যে, হেদায়তের কেন্দ্রবিন্দু শুধু নবীগণ (আ.)। তাঁরা ছাড়া তাঁদের উম্মতের মধ্যে অন্য কারো থেকে হেদায়ত অর্জন করা যায় না। এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা যদি হেদায়ত ও সিরাতে মুস্তাকীম এর জন্য শুধু নবীগণ অর্থাৎ ব্যক্তি নবীকেই নির্দিষ্ট করা হয় এবং নবীর ফয়েজ দ্বারা পরবর্তী উম্মত পর্যন্ত পরিব্যপ্ত না হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগ্রহভাজন বান্দার মধ্যে শুধু নবীগণকেই গণ্য করতেন। যদি এরূপ হত তবে যারা নবীর জাহেরী জীবনের যুগ না পাবে, সরাসরি তাঁকে না দেখবে, তাঁর কথা না শুনবে, মজলিসে বসে জিজ্ঞেস না করবে, তাদের জন্য এ বিষয় জরুরী হবে যে, অন্য কোন ব্যক্তির অবয়বে আদর্শ বিদ্যমান থাকা। যার আদর্শ মতভেদের সময় অনুসরণ করা যাবে। যা দেখে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। রাসূল (দ.) এর পরে রাসূলের সীরাত জানার জন্যও কোন আদর্শ থাকাটা জরুরী। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা নিজ হেদায়তের প্রতিবিম্ব রাসূলকে বানিয়েছেন। আর রাসূলের হেদায়তের প্রতিবিম্ব সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং পূণ্যবান বান্দাদেরকে বানিয়েছেন। আর তাদের মাধ্যমে হেদায়তের ধারা কেয়ামত পর্যন্ত চালু করে দেন।

যে ব্যক্তি এটা বলে যে, সে শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মানবে, কোরআন ও হাদীসের কথা মানবে, এ ছাড়া আর কোন কথা মানবেনা। সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, সৎকর্মশীলগণ, আউলিয়ায়ে কেরাম, আইম্মায়ে ইজাম, বুযুর্গানে দ্বীন এবং পূর্বসূরী পুণ্যবানদের কথা মানবে না, সে সরাসরি কোরআনের হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বলে সাব্যস্ত হবে এবং প্রকৃতপক্ষে সে নিজের কথারই বিরুদ্ধাচরণ করবে। কোরআনের কথা সে তো মানেই নি। কেননা, কোরআন শরীফ নবীগণের (আ.) পরে আরও তিন স্তর পর্যন্ত বর্ণনা করেছে এবং সবাইকে আল্লাহ নিজের অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁদের সবার পথই হেদায়তের পথ। সিদ্দীকিনের পথ হেদায়তের পথ। শহীদ ও পূণ্যত্মাদের পথ হেদায়তের পথ। এসব পথ নবুয়তের রাজপথে গিয়ে মিলিত হয়।

সবাই নবুয়তের আলো থেকে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন, সবাই ওখান থেকে বাতি জ্বালিয়েছেন এবং পরবর্তীতে একটি বাতি থেকে লক্ষ কোটি বাতি জ্বলতে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের বংশধারা বিদ্যমান থাকবে, হেদায়তের এই ব্যক্তি আদর্শগণ নিজেদের বাতি দ্বারা গোমরাহ মানুষদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন।

**চারটি বড় অনুগ্রহ :**

এ দুনিয়াতে এবং আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে লক্ষ কোটি নিয়ামত দান করেছেন। এসব নিয়ামত যখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছে, তখন চার নিয়ামতে নবুওয়াত, সিদ্দীকিয়াত, শাহাদাত ও সালেহীয়্যত-এ বিভক্ত হয়ে যায়। এ চার নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নিয়ামত। এ নিয়ামতসমূহ চার স্তরে বিভক্ত। ১. নবী ২. সিদ্দীক ৩. শহীদ ও ৪. সালেহীন। যেমনটি সূরা নিসার উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

**হুযুরে আকরম (দ.) এর সত্তা সকল গুণাবলীর সমাহার :**

এটা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ তায়ালা যত নিয়ামত দুনিয়াতে দান করেছেন সেসব নিয়ামত নবী করিম

(দ.) এর পবিত্র সত্তায় একত্রিত করেছেন। হুযুর (দ.) এর সত্তা 'জামিউন নিয়াম' বা সমূদয় নিয়ামতের একত্রিতকারী। আল্লাহ তায়ালার এমন কোন নিয়ামত নেই যা প্রিয়নবী (দ.) এর জীবনে নেই। ইউসুফ (আ.) এর সৌন্দর্য, ঈসা (আ.) এর ফুঁক, মূসা (আ.) হাতের আশ্চর্য গুণাবলী তথা সকল পূর্ণতা ও সৌন্দর্য যা বিভিন্ন নবীগণের কাছে ছিল তার সবই একসাথে পূর্ণমাত্রায় প্রিয়নবী (দ.) এর পবিত্র সত্তায় বিদ্যমান। জনৈক কবি কত সুন্দরই না বলেছেন-

حسن یوسف دم عیسی ید بیضاء داری + انچہ خوبان ہمہ دارند تو تنہا داری

**নবীয়ে আকরম (দ.) সকল নিয়ামতের বন্টনকারী :**

আল্লাহ তায়ালা সকল নিয়ামতকে নবী করিম (দ.) এর উসিলায় সমূদয় সৃষ্টির মাঝে বন্টন করেছেন। সহীহ বোখারী শরীফে আছে হুযুর (দ.) ইরশাদ করেছেন-

انما انا قاسم و الله یوتی- صحیح البخاری : کتاب العلم

অর্থ : নিশ্চয়ই (আল্লাহর সকল নিয়ামত) আমিই বন্টনকারী আর আল্লাহ তা দান করেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম)

সুতরাং কেউ কোন নিয়ামত পেলে তা নবী করিম (দ.) এর নূরানী দরবার থেকেই পায়।

ইমাম শরফুদ্দীন বুসরী (র.) তাঁর প্রসিদ্ধ 'কসিদায়ে বুরদাহ'-তে বলেন-

وکلهم من رسول الله ملتمس + غرفا من البحر او رشفا من الدیم

فان من جودك الدنیا و ضرتها + ومن علومك علم اللوح و القلم

অর্থ : (১) 'তারা (নবীগণ) সবাই আল্লাহর রাসূলের কাছে সাহায্যপ্রার্থী, যেমন সমুদ্রের এক অঞ্জলী পানি বা বৃষ্টির এ ফোঁটা পানি'।

(২) 'তাঁর বদান্যতায় দুনিয়া ও তার মধ্যে যা আছে তার সবই অস্তিত্বশীল এবং লওহ-কলম তাঁর ইলমের একটি অংশ'।

নবীগণ প্রত্যেকে এবং পৃথিবীর অন্য মানুষেরা প্রয়োজনে নিজের আশা আকাঙ্ক্ষার ঝুলি নিয়ে আপনার উদার বদান্যতার দরবারে দাঁড়িয়ে আছে। যার যা কিছু মিলে তা আপনার নূরানী দরবার থেকেই মিলে। নিশ্চয়ই দুনিয়ার নিয়ামত ও আখেরাতের নিয়ামত সবই আপনার খাঞ্চা থেকে সবাই পায়।

অতএব, নবীগণের নবুওয়তের নিয়ামত, সিদ্দীকীনের সিদ্দীকিয়্যতের নিয়ামত, শহীদগণের শাহাদাতের নিয়ামত এবং সালেহীনের সালেহিয়্যতের নিয়ামত। মোটকথা, এ পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তা যাকে যে নিয়ামত দান করেছেন তার সবই নিজ মাহবুব (দ.) এর ফয়েজের মাধ্যমে দান করেছেন।

**সকল নিয়ামতের অর্জন মুস্তাফা (দ.)'র মাধ্যমে :**

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাহবুব (দ.) কে 'জামেউস সিফাত' এবং নিজের সকল নিয়ামত হুযুর (দ.) এর সত্তায় একত্রিত করেছেন। নিয়ামতের এই পূর্ণতা তাঁর মধ্যে এতবেশী ছিল যে, দুনিয়ার কোন মানুষই কোন নিয়ামতে তাঁর চেয়ে অগ্রগণ্য নয়। আমরা দেখেছি যে, নবীগণের নবুওয়তের নিয়ামত হুযুর (দ.) থেকে পেয়েছেন। তিনি নিজেই নবুওয়তের নিয়ামতে প্রাচুর্যবান ছিলেন। সিদ্দীকীনদের নিয়ামতও তাঁর ফয়েজ থেকে মিলেছে। কেননা, তিনি নিজেই সিদ্দীকিয়্যতের সর্বোচ্চ মকামে ছিলেন। সালেহীনদের সালেহীয়্যতের নিয়ামত তাঁর সালেহিয়্যতের রহমত থেকে মিলেছে। কেননা, তাঁর পবিত্র সত্তা সালেহিয়্যতের নিয়ামতে ভরপুর ছিল। এখন এ প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, যখন নবীগণের নবুওয়ত,





সিদ্দীকিনদের সিদ্দীকিয়্যাত, সালেহীনদের সালেহিয়্যত এর নিয়ামত নবী মুস্তফা (দ.) থেকে মিলেছে, যদি একথা সঠিক হয় তাহলে শহীদদের শাহাদাত এর নিয়ামত কিভাবে আসল? কেননা হুযুর আকরম (দ.) জাহেরীভাবে শাহাদাতের নিয়ামত পান করেন নি।

**নবী করিম (দ.) শাহাদাতের গুণে গুণান্বিত হওয়াটা জরুরী :**

একথা সর্বজনবিদিত যে, হুযুর আকরম (দ.) এর পবিত্র সত্তার ওপর কোন আংশিক বিষয়েও প্রাধান্য নেই। এখন এ প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, আক্বা (দ.) জাহেরীভাবে শাহাদাতের গুণে গুণান্বিত হওয়া দেখা যায় না, তবে সর্ববিষয়ে ও সর্বগুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে তাঁর (দ.) মধ্যে শাহাদাতের গুণ থাকা আবশ্যক এবং তা এভাবে যে, দুনিয়াতে আর কারও সেভাবে শাহাদাত নসীব হবে না। এর জবাব এটা যে, দুই কারণে শাহাদাতের গুণ তাঁর (দ.) পবিত্র সত্তায় পাওয়া যাওয়াটা জরুরী।

**প্রথম কারণ :**

রাসূলুল্লাহ (দ.) এর শাহাদাতের গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রথম কারণ হলো- যখন আল্লাহ তায়ালা হুযুর (দ.)কে তাঁর সমস্ত নিয়ামতের অধিকারী এবং 'আফযালুল বশর' বানিয়েছেন। তবে এর চাহিদা এটা যে, দুনিয়ার কোন মানুষ আল্লাহর কোন নিয়ামতের অংশও তাঁর (দ.) থেকে বেশী অর্জন করবে না। তাঁর বরকতময় সত্তার মধ্যে সকল নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে একত্রিত। এখন যদি আমরা এটা বলি যে, (আল্লাহর পানাহ) হুযুর (দ.) শাহাদাতের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত (কেননা বাহ্যিক জীবনে তিনি শাহাদাত পাননি)। তবে এ অবস্থায় নবীগণ (আ.) এবং লক্ষ কোটি মানুষ যাদের শাহাদাতের নিয়ামত মিলেছে তারা সবাই তাঁর (দ.) ওপর শাহাদাতের নিয়ামতের কারণে আংশিক ফযিলত নিয়ে যাবেন। আর আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তায় এটা সহ্য হবে না যে, কোন ব্যক্তি নবী করিম (দ.) থেকে (যিনি নিয়ামতের কেন্দ্রবিন্দু এবং উৎসস্থল, যার কাছ থেকে নিয়ামতের শুরু এবং যার কাছে নিয়ামতের শেষ হয়) আংশিক ফজিলতও নিয়ে যাবে এবং তারা এমন এক নিয়ামতের ফজিলত খোদার দরবারে পেশ করবে যা থেকে তাঁর (দ.) পবিত্র সত্তা বঞ্চিত। এজন্য এটা জরুরী যে, হুযুর (দ.)ও শাহাদাতের নিয়ামতে প্রাচুর্যময় হবেন এবং শাহাদাত এভাবে হবে যে, তা পরিপূর্ণ হবে।

**দ্বিতীয় কারণ :**

শাহাদাতের গুণে হুযুর (দ.) এর পবিত্র সত্তার গুণান্বিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ এ যে, কোন পূণ্যকাজে রাসূল (দ.) এর আদর্শের অনুসরণ ছাড়া নেকী পাওয়া যায় না। অতএব, কোরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

من یطع الرسول فقد اطاع الله ـ النساء: ٨٠

অর্থ : যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। (সূরা নিসা- ৮০)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন- قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی- ال عمران:٣١

অর্থ : (হে মাহবুব!) আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। (সূরা আলে ইমরান- ৩১)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন- لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة ـ الاحزاب:٢١

অর্থ : নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূল (দ.) এর মাঝে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব- ৩৩)

আক্বা (দ.) আর পবিত্র সত্তাকে উত্তম আদর্শ করার কারণ এ যে, প্রত্যেক সে আমলকে নেকী হিসেবে স্বীকার করা হবে যা এমন পদ্ধতিতে করা হবে, যে পদ্ধতিতে হুযুর আকরম (দ.) করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ আমরা যে খাবার খাই তাতে নেকী হয় না; বরং চাহিদা পূর্ণ হয় মাত্র। কিন্তু যদি আমরা সে খাবার তাঁর (দ.) আমল অনুসারে খাই, তাহলে সে খাবার নেকী হয়ে যায়। আমরা নিজের শরীরের আরামের জন্য শয়ন করি; কিন্তু যদি ক্বিবলামুখী হয়ে শয়ন করি তাহলে তাতেও নেকী হবে। কেননা, আক্বা (আ.) এর শোয়ার নিয়ম এরকমই ছিল।

খাবার খাওয়া ও শয়ন করা এজন্যই নেকীতে পরিণত হয় যে, তাতে হুযুর (দ.) এর আনুগত্য অন্তর্ভুক্ত। কোন আমল তাঁর আনুগত্য ছাড়া নেকীতে পরিণত হয় না। যখন একথা সঠিক বলে মেনে নিই তখন তাঁর (দ.) অনুসরণ করা যায় না যতক্ষণ না ঐ বিষয় নিজের সত্তার মাঝে বিদ্যমান থাকে এবং সে আমলকে হুযুর নিজে করেছেন এমন হয়। সুতরাং শাহাদাতের মত আমলকে নেকী হিসেবে সাব্যস্ত করা তখনই সম্ভব হবে, যদি খোদার রাস্তায় জান কুরবান করার আমল আমরা নবী করিম (দ.) এর বরকতময় জীবনে দেখতে পাই এবং তাঁর পবিত্র সত্তা শাহাদাতের গুণে গুণান্বিত হয়।

হুযুর নবী করিম (দ.) এর বরকতময় সত্তা জাহেরীভাবে শাহাদাতের গুণে গুণান্বিত দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্যদিকে আমরা দেখি যে, আল্লাহ তায়ালা নিজের রাস্তায় জান কুরবান করা এবং শাহাদাতকে নেকী হিসেবে গণ্য করেছেন। সুতরাং এটা জরুরী যে, আক্বা (আ.) এর পবিত্র সত্তা শাহাদাতের নিয়ামত থেকে যেন খালি না হয়। অন্যথায় শাহাদাতকে নেকী হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

যখন একথা সাব্যস্ত হল যে, তিনি (দ.) শাহাদাতের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত নন এবং তাঁকে আল্লাহ তায়ালা শাহাদাতের নিয়ামতও পরিপূর্ণভাবে দিয়েছেন, তবে আসুন আমরা দেখি যে, আল্লাহ তায়ালা হুযুর (দ.) এর বরকতময় সত্তায় কিভাবে শাহাদাতের নিয়ামত দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন।

**আমলের দুই অবস্থা :**

প্রত্যেক আমল দুই ধরনের হয়। যথা ১. আমলের আভ্যন্তরীণ ও আত্মিক অবস্থা; এটি আমলের আসল অবস্থা। ২. আমলের বাহ্যিক অবয়ব; এটি আমলের রূপক অবস্থা।

প্রথম অবস্থা আমলের বাতেনী দিক। দ্বিতীয় অবস্থা আমলের জাহেরী দিক। যেমন- আমরা নামায পড়ি; এটি একটি আমল এবং তার প্রকৃত অবস্থা হল আল্লাহর স্মরণ। আর যে অবস্থায় যে অবয়বে এবং যেসব শর্ত আদায় করে আমরা নামায পড়ি তা এর রূপক অবস্থা। সুতরাং প্রত্যেক আমল আত্মিক ও বাহ্যিক অবয়বে বিদ্যমান থাকে।

শাহাদাতও একটি আমল। সেই শাহাদাতেরও আত্মিক ও বাহ্যিক দু'টি অবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ একটি মূল অবস্থা; আরেকটি রূপক। এখন আমরা দেখব যে, শাহাদাতের মূল কাঠামো কী এবং রূপক কাঠামো কী? শাহাদাতের আত্মিক অবস্থা কী এবং জাহেরী অবস্থা কী? আর এ শাহাদাতের গুণ নবী আকরম (দ.) এর পবিত্র সত্তায় বিদ্যমান ছিল কি-না?

**শাহাদাতের মূল কাঠামো :**

শাহাদাতের আত্মা হল, খোদার রাহে জান কুরবান করার আকাঙ্ক্ষা। আর নিহত হওয়া শাহাদাতের বাহ্যিক অবস্থা। নবীয়ে আকরম (দ.) এর পবিত্র সত্তায় শাহাদাতের আমল তালাশ করার জন্য প্রথমে আমরা শাহাদাতের রূহকে দেখব যে, হুযুর আকরম (দ.) এর পবিত্র সত্তায় তা বিদ্যমান ছিল কিনা?

**নবীয়ে রহমত (দ.) এর মধ্যে শাহাদাতের রূহ বিদ্যমান ছিল :**

শাহাদাতের রূহ হল, খোদার রাহে জান কুরবান করার আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা আক্বা (আ.) এর পবিত্র





সত্তায় বড় বেশিমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কেননা হাদীসসমূহের মধ্যে একাধিকবার একথা এসেছে যে, হুযুর (দ.) আল্লাহর রাহে জান কুরবান করার জন্য বড়ই আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (দ.)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন যে, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ। যদি মুসলমানের অন্তরে এ পেরেশানি হত যে, আমি তাদের ছেড়ে জেহাদের জন্য বের হয়ে যাব আর আমার কাছে এত বাহন নেই যে, সবাইকে সাথে করে নিয়ে যাব; তবে আমি প্রত্যেক দলের সাথে বের হতাম, যারা আল্লাহর পথে জেহাদে বের হয়।

و الذى نفسى بيده لوددت انى اقتل فى سبيل الله ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل ثم احيى - صحيح البخارى : كتاب الجهاج باب تمنى الشهادة

অর্থ : আর সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি চাই যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই, তারপর জীবিত হই। তারপর নিহত হই। তারপর আবার জীবিত হই। আবার নিহত হই। আবার জীবিত হই। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, কিতাবুল জিহাদ)

প্রকৃতপক্ষে হুযুর (দ.) এর খোদার রাহে জান কুরবান করার বড়ই আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি চাইতেন যে, আল্লাহ যদি আমাকে কোটি কোটি জীবনও দিতেন, তবে আমি প্রতিটি জীবন তাঁর রাস্তায় কুরবান করে দিতাম। এভাবে খোদার রাহে জান কুরবান করার এবং শহীদ হওয়ার মাত্রাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা হুযুর (দ.) এর পবিত্র সত্তায় পাওয়া গেল। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, শাহাদাতের রূহ আক্বা (দ.) এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

**নিয়্যতের ওপর আমল নির্ভরশীল :**

আমলের নির্ভরতা নিয়্যতের ওপর। যদি নিয়্যত পাওয়া যায় কিন্তু আমল করা না হয়, তারপরেও সওয়াব মিলবে। কেননা, প্রত্যেক আমলের সওয়াব তার নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল। যেমন নিয়্যত হবে তেমনই সওয়াব পাওয়া যাবে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু যুদ্ধের ময়দানে হয়; কিন্তু সে ব্যক্তির আল্লাহর রাস্তায় জান কুরবান করার আকাঙ্ক্ষা না থাকে; বরং এই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, যদি মারা যাই তাহলে শহীদ বলা হবে। আর যদি বেঁচে যাই তাহলে লোকেরা তাকে গাজী বলবে; অথবা পুরস্কার ও সম্মান পাওয়ার লোভ ছিল, তবে এমন ব্যক্তি যদি কোন কাফিরের তলোয়ার অথবা গুলিতে মারাও যায়, তবে সে শহীদ হবেনা। তার কারণ এই যে, যদিও তার মৃত্যু যুদ্ধের ময়দানে কাফেরের হাতে সংঘটিত হয়, কিন্তু শাহাদাতের রূহ তথা আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে না থাকায় তার এ মৃত্যু শাহাদাত হিসেবে সাব্যস্ত হবে না।

তার বিপরীতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا و سعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره الى الله - النساء : ١٠٠

অর্থ : যে কেউ আল্লাহর পথে ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেরুবে, সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা এবং প্রশস্ততা পাবে। আর যে নিজের ঘর থেকে আল্লাহ এবং রাসূলের (দ.) দিকে হিজরত করে বের হয়, তারপর যদি তার মৃত্যু আসে তাহলে তার প্রতিদান আল্লাহর যিম্মায় হয়ে যায়। (সূরা নিসা- ১০০)

যদিও আমল জাহেরীভাবে পূর্ণ হয়নি; কিন্তু তারপরেও আল্লাহ তায়ালার দরবারে তার আমলের প্রতিদান রয়েছে। কেননা, সে আমলের পূর্ণতার নিয়্যতে ঘর থেকে বের হয়েছিল। তাই আক্বায়ে দু'জাহান (দ.) এরশাদ করেছেন- انما الاعمال بالنيات - صحيح البخارى : كتاب الوحى

অর্থ : নিশ্চয় আমলের (প্রতিদান) নির্ভরশীলতা নিয়্যতের ওপর। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ওহী)

অন্যত্র বলেছেন-

ان الله لاينظر الى صوركم و اموالكم و لكن ينظر الى قلوبكم و عمالكم- صحيح مسلم : كتاب البر

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও ধনসম্পদের দিকে দেখেন না; কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তর এবং আমলসমূহের দিকে দেখেন। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ধন-সম্পদ এবং আকৃতি-প্রকৃতি ব্যতিরেকে তোমাদের অন্তর ও তোমাদের নিয়্যতকে দেখেন যে, এই আমল তুমি কোন্ নিয়্যতে করেছ।

অতঃপর পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে একথা প্রমাণিত হল যে, শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যা শাহাদাতের রূহ বা আত্মা, তা হুযুর (দ.) এর কাছে মাত্রাতিরিক্তভাবে বিদ্যমান ছিল। এখন এ প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, শুধু মূল কাঠামো (শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা) পাওয়া যাওয়াকে শাহাদাত বলা হয় না। শাহাদাতকে তখন শাহাদাত বলা হবে, যখন মূল কাঠামোর সাথে রূপক কাঠামোও পাওয়া যায়। সুতরাং শাহাদাতের রূপক কাঠামো অর্থাৎ খোদার রাহে জান কুরবান করার বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতি হুযুর (দ.) এর পবিত্র সত্তায় পাওয়া যাওয়া জরুরী।

**শাহাদাতের রূপক কাঠামো :**

খোদার রাহে নিহত হওয়াকে শাহাদাতের রূপক কাঠামো বলা হয়। এ রূপক কাঠামো দুই প্রকার।

১. অপ্রকাশ্য শাহাদাত : একে গোপন বা ছোট শাহাদাতও বলা হয়। যেমন- কাউকে পানিতে ডুবিয়ে অথবা কাউকে বিষপানে হত্যা করা।

২. প্রকাশ্য শাহাদাত- তাকে বাহ্যিক শাহাদাত এবং বড় শাহাদাতও বলা হয়। যেমন- কোন মুসলমান যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের হাতে নিহত হওয়া।

এখন আমরা শাহাদাতের রূপক কাঠামোর উভয় প্রকার নবীয়ে আকরম (দ.) এর বরকতময় সীরাতে তালাশ করব।

**আমলের শুরু ও শেষ :**

প্রত্যেক আমলের একটি শুরু এবং আরেকটি শেষ পয়েন্ট থাকে। শাহাদাতের একটি শুরু ও একটি শেষ পয়েন্ট আছে। আক্বা (দ.) এর পবিত্র জীবনে গোপন শাহাদাতের শুরু আছে এবং প্রকাশ্য শাহাদাতের শুরুও আছে।

**গোপন শাহাদাতের শুরু :**

আক্বা (আ.) এর পবিত্র জীবনের গোপন শাহাদাতের শুরুর পয়েন্ট বিদ্যমান আছে। নিম্নোক্ত ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। খায়বর যুদ্ধে এক ইহুদীর স্ত্রী যয়নব বিনতে হারেছ বিষমিশ্রিত ছাগলের ভুনা গোশত হুযুর (দ.) এর খেদমতে হাদিয়া পেশ করল। তিনি এর থেকে কিছু খেয়ে নিলেন। তখন সেই ভুনা গোশত তাকে খবর দিল যে, 'আমি বিষমিশ্রিত'। তিনি তখনই হাত উঠিয়ে নিলেন। তাঁর (দ.) সাথে একজন সাহাবী বশির বিন বারা (রা.)ও সেই বিষ মিশ্রিত গোশত খেয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বিষক্রিয়ায় শহীদ হয়ে যান।

**মুস্তফা (দ.) এর হিফাযত আল্লাহ পাকের যিম্মায় :**

আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাহবুব নবীর (দ.) হিফাযতের যিম্মা নিয়েছেন। যেমন- খায়বর যুদ্ধে বিষমিশ্রিত গোশত খাওয়ার ফলে হযরত বশির বিন বারা (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে,





সে গোশতে এত অধিক পরিমাণ বিষ মিশ্রিত ছিল যে, যা প্রাণ সংহারের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এই বিষ মিশ্রিত গোশত খাওয়ার পরও আক্বা (দ.) শহীদ হননি, যদিও সেই বিষের ক্রিয়া ইনতেকাল পর্যন্ত তাঁর শিরা-উপশিরায় বিদ্যমান ছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, নবীয়ে আকরম (দ.) তাঁর ইনতেকালের সময় ইরশাদ করেছেন-

يا عائشة مازال احد الم الطعام الذى اكلت بخيبر و هذا اوان وجدت انقطاع ابهرى من ذالك السم- مشكواة المصابيح : باب وفاة النبى ﷺ

অর্থ : হে আয়েশা! আমি খায়বরের মধ্যে যে বিষমিশ্রিত খাবার খেয়েছিলাম তার কষ্ট তো সবসময় অনুভব করে আসছি। কিন্তু এখন (এই অসুখে এমন মনে হচ্ছে যে,) সেই বিষক্রিয়ায় আমার রগ ছিড়ে প্রাণ বের হয়ে যাবে। (মিশকাত, বাবু ওফাতুন্নবী দ.)

বিষমিশ্রিত গোশত খাওয়ার পরও হুযুর (দ.) এর শাহাদাত সংঘটিত না হওয়া এ কারণে ছিল যে, আল্লাহ তাঁর মাহবুব (দ.) এর সাথে ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন- و الله يعصمك من الناس- المائدة : ٦٧

অর্থ : আর আল্লাহ মানুষ থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদা- ৬৭)

হুযুর (দ.) এর মৃত্যু মানুষের হাতে না হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের ওয়াদা ছিল এবং এটা জরুরী ছিল যে, যদি তাঁর মৃত্যু বিষক্রিয়া অথবা তলোয়ারের মাধ্যমে কাফের বা দুশমনের হাতে সংঘটিত হত, তবে যেলোক নতুনভাবে ইসলামে প্রবেশ করছিল এবং ইসলামের সাথে তাদের আনুগত্য ও হৃদ্যতা বেশি ছিলনা, তাঁর (দ.) শাহাদাতের ফলে সে লোকদের অন্তরে এ খেয়াল আসত যে, এই নবী তো মানুষের হাতে মারা গেছেন। এখন ইসলামের কি হবে? ফলে তারা ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিত। কিন্তু নবী করিম (দ.) এর ওফাত, একজন ব্যক্তির ওফাত হত না; বরং ইসলামেরই মৃত্যু হয়ে যেত। সুতরাং ইসলামের মিশনকে জিন্দা রাখার জন্য তাঁর (দ.) জীবিত থাকাটা ছিল জরুরী।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, উহুদ যুদ্ধে হুযুর (দ.) কে শহীদ করে দেয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়লে বড় বড় সাহাবীগণ মনোবল হারিয়ে ফেলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে দেন। আমরা যার জন্য লড়ছিলাম তিনি যখন জীবিত নেই, তো আমাদের লড়াই করে কি লাভ? কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ইসলামের মিশনকে কামিয়াবি করার জন্য এবং গতিশীল রাখার জন্য তাঁর (দ.) জীবনকে মানুষের থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

**প্রকাশ্য শাহাদাতের শুরু :**

অপ্রকাশ্য শাহাদাতের ন্যায় হুযুর (দ.) এর বরকতময় জীবনে প্রকাশ্য শাহাদাতও বিদ্যমান ছিল। প্রকাশ্য শাহাদাতের চারটি শর্ত রয়েছে।

১. যুদ্ধের ময়দানে কাফির কর্তৃক কোন অস্ত্র দ্বারা কোন হামলা হওয়া।
২. আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া।
৩. কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা যাওয়ার ফলে রক্ত প্রবাহিত হওয়া।
৪. প্রাণ বের হয়ে যাওয়া।

উহুদ যুদ্ধে কাফেররা হুযুর (দ.) এর ওপর পাথর এবং তীর দ্বারা হামলা করেছিল। তাঁর দান্দান মুবারকের মধ্যে একটি দাঁতের কিছু অংশ পাথরের আঘাতে শহীদ হয়ে যায়। যেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। এতে করে প্রকাশ্য শাহাদাতের প্রথম তিনটি শর্ত পাওয়া গেল এবং চতুর্থ শর্তের ব্যাপারে গুজব ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু চতুর্থ শর্ত পাওয়া যাওয়াটা সম্ভব ছিল না। কেননা আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন-

و الله يعصمك من الناس- المائدة : ٦٧

এখানে এটি চিন্তার বিষয় যে, হুযুর (দ.) এর পবিত্র দাঁতের একটি অংশ ভেঙ্গেছিল, পুরো দাঁত ভাঙ্গেনি। তার কারণ এই যে, যদি পুরো দাঁত ভেঙ্গে যেত তাহলে এর কারণে পবিত্র চেহারার সৌন্দর্য্যে ঘাটতি হত.এবং এটা আল্লাহর কাম্য হত না। সুতরাং দাঁতের অংশ এমনভাবে ভেঙ্গেছে যেমন উজ্জ্বল হীরার টুকরো ভেঙ্গে যায়। এর ফলে ঐ হীরার উজ্জ্বলতায় কোন ঘাটতিতো দেখা দেয়ই না; বরং এর উজ্জ্বলতা আরো বেশি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তাঁর দাঁতের অংশ ভাঙ্গার ফলে তাঁর দান্দান মুবারকের সৌন্দর্য্য আরও বেড়ে গেল।

অতএব, অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য উভয় প্রকারের শাহাদাতের শুরু হুযুর (দ.) এর হায়াতে তৈয়্যবায় বিদ্যমান ছিল; কিন্তু পরিণতি ছিল না। কেননা তাঁর ওফাত স্বাভাবিক ছিল।

**মৃত্যুর অবস্থা :**

মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার তিনটি পর্যায় আছে।
১. মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যু হবে; এ মৃত্যু শাহাদাত নয়।
২. নিজে বিষ খেয়ে অথবা অন্য উপায়ে আত্মহত্যা করে; এ মৃত্যুও শাহাদাত নয়।
৩. অন্য কারও হাতে মজলুম হয়ে মৃত্যুবরণ করা; এটা শাহাদাতের মৃত্যু।

হুযুর (দ.) ওফাত স্বাভাবিক হয়েছে। কেননা, তিনি নিজেই তো মৃত্যু সংঘটিত করতে পারেন না। কারণ তা আত্মহত্যা হত। আর অন্য কারো হাতে তার মৃত্যু হওয়াটাও অসম্ভব ছিল। কেননা আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা- والله يعصمك من الناس۔ المائدة : ٦٧ আয়াতটি এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। এখন একদিকে আল্লাহর ওয়াদা যে, কোন কাফেরের ষড়যন্ত্রে হুযুর (দ.) এর মৃত্যু না হওয়া এবং অন্যদিকে এটাও আল্লাহর ইচ্ছা যে, তাঁর (দ.) সত্তা শাহাদাতের গুণে গুণান্বিত হোক। কেননা তিনি শারীরিকভাবে সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিলেন। সুতরাং এটা জরুরী ছিল যে, শাহাদাতের রূহ, অপ্রকাশ্য শাহাদাত ও প্রকাশ্য শাহাদাতের শুরু তো হুযুর (দ.) এর পবিত্র সত্তায় পাওয়া যাবে; কিন্তু অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য শাহাদাতের পূর্ণতা তাঁর বরকতময় শরীর ব্যতিরেকে অন্য এমন শরীরে সংঘটিত হবে যে, উক্ত শরীরে হওয়া কাজটি তাঁর (দ.) সাথে গভীর সম্পর্ক হওয়ার ভিত্তিতে তা স্বয়ং তাঁর শরীরে সংঘটিত হওয়াই সাব্যস্ত হবে।

**উভয় শাহাদাতের পরিপূর্ণ প্রকাশ :**

যেহেতু শাহাদাত দুইভাবে সংঘটিত হয়। একটি গোপন শাহাদাত, অপরটি প্রকাশ্য শাহাদাত। আল্লাহ তায়ালা হুযুর (দ.) এর পবিত্র সীরতে শাহাদাত অধ্যায় পরিপূর্ণ করার জন্য দুইজনকে নির্বাচিত করেছেন। যাতে একজন অপ্রকাশ্য শাহাদাতের কারণ হন, অর্থাৎ বিষক্রিয়ায় শহীদ হন এবং অন্যজন প্রকাশ্য শাহাদাতের কারণ হন, অর্থাৎ অসহায় ও মজলুম অবস্থায় দুশমনের হাতে শহীদ হন।

সেই নির্বাচিত ব্যক্তির জন্য এটাও জরুরী ছিল যে, তারা উভয়ে রাসূল (দ.) এর নিজের আপনজন হবেন। তা এজন্য যে, যদি আপনজন ছাড়া অন্য কারো মাঝে তাঁর এগুণ প্রকাশ পেত তবে তাঁর (দ.) ওপর তাদের এহসান থাকত। আর আল্লাহ তায়ালা হুযুর (দ.) এর ওপর কারো এহসান থাকাটা পছন্দ করেন না। সুতরাং এটা জরুরী যে, সেই দুই ব্যক্তি তাঁর শুধু আপনজনই হবেন না, বরং বাহ্যিকভাবে আকৃতি-প্রকৃতিতেও তাঁর সাথে মিল থাকবে এবং বাতেনীভাবেও তাঁর সাথে মিল থাকবে।

অতএব, অপ্রকাশ্য শাহাদাত ও প্রকাশ শাহাদাতের সে আমল যা হুযুর (দ.) এর জীবনে শুরু হয়েছিল সেই দুই শাহাদাতের পূর্ণতার জন্য আল্লাহ তায়ালা দুই শাহজাদা সায়্যিদুনা ইমাম হাসান (রা.) কে অপ্রকাশ্য শাহাদাতের জন্য, আর সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন (রা.)কে প্রকাশ্য শাহাদাতের জন্য নির্বাচিত করেছেন।





**হাসনাইন করীমাইন (রা.)কে নির্বাচিত করার কারণ :**

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শাহাদাতের পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য আল্লাহ তায়ালা হাসনাইন করীমাইনকে এজন্য নির্বাচিত করেছেন যে, এ দু'জন হযরত নবীয়ে করীম (দ.) এর খুবই আপনজন ছিলেন। তাঁরা তো ছিলেন তাঁর দৌহিত্র। কিন্তু তিনি (দ.) তাঁদেরকে কখনো 'নাতি' বলে সম্বোধন করেননি; বরং সর্বদা 'বেটা' বা 'সন্তান' বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর পবিত্র খুন শাহাজাদাদ্বয়ের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত ছিল। হাসনাইন করীমাইনের জন্য হুযুর (দ.) এর আপনজন না হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। তারপরও তাঁরা আক্বা (দ.) এর শরীরের অংশ এবং তাঁর সাথে পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল।

**হাসনাইন করীমাইন (রা.) রাসূলে করীম (দ.) এর অংশবিশেষ :**

হাসনাইন করীমাইন (রা.) রাসূলে পাকের (দ.) সন্তান এবং রাসূল (দ.) এর অংশ। তাঁরা উভয়ে রাসূল (দ.) এর অংশ হওয়াটা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, কুরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم و نسائنا و نسائكم و انفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ال عمران: ٦١

অর্থ : হে হাবীব (দ.)। পাদ্রীদের বলে দিন যে, আমরা এবং তোমরা নিজেদের সন্তান, নিজেদের স্ত্রীলোক এবং নিজেদেরকে ডেকে নিই। অতঃপর মোবাহেলা করি এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর লা'নত করি। (সূরা আলে ইমরান- ৬১)

এ আয়াতে করীমা 'আয়াতে মুবাহেলা' নামে প্রসিদ্ধ। এ বরকতময় আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী করিম (দ.) সাইয়্যিদা ফাতেমা যাহরা (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)কে সাথে নিয়ে পাদ্রীদের মোকাবেলায় মুবাহেলার জন্য তাশরীফ নিয়ে যান এবং সে সময় তিনি ইরশাদ করলেন- اللهم هولاء اهلى ۔ صحيح مسلم : كتاب الفضائل

অর্থ : হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বায়ত। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)

অতএব, উল্লেখিত আয়াতে মুবারাকা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হাসনাইন করীমাইন (রা.) 'আবনা আনা' (আমাদের সন্তান) সাব্যস্ত। অর্থাৎ তারা হুযুর আকরম (দ.) এর সন্তান। কুরআনুল করীম এর ফরমান মোতাবেক নাতি সন্তানের মাক্বাম অর্জন করেছেন। এ কারণে হযরত ঈসা (আ.)কে বনী ইসরাঈলের মধ্যে গণ্য করা হয়; অর্থাৎ তাঁকে হযরত ইয়াকুব (আ.) এর সন্তান হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁকে তাঁর মায়ের সম্পর্কের দ্বারা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে গণ্য করা হয়। সেভাবে হাসনাইন করীমাইন (রা.)ও হুযুর সরওয়ারে দু'আলম (দ.) এর আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা যাহরার (রা.) সম্পর্কের দ্বারা রাসূল (দ.) এর সন্তান হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন।

এ প্রেক্ষিতে হযরত ওসামা বিন যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি হুযুর আকরম (দ.)কে দেখেছেন যে, তিনি (দ.) হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.) উভয় শাহাজাদাকে নিয়ে বসেছিলেন এবং এরশাদ করছিলেন-

هذان ابناى و ابنا ابنتى اللهم انى احبهما فاحبهما من يحبهما۔ الترمذى : ابواب المناقب

অর্থ : এরা উভয়ে আমার এবং আমার মেয়ের সন্তান। হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে ভালবাসি, তুমিও তাদেরকে ভালবাস। আর সেসব বান্দার সাথে ভালবাসা রাখ, যারা তাদেরকে ভালবাসে। (তিরমিযী, বাবুল মানাক্বিব)

**নবী করিম (দ.) এর সাথে হাসনাইন করীমাইন (রা.) এর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সাদৃশতা :**

হাসানাইন করীমাইন (রা.) নবীয়ে আকরম (দ.) এর সাথে সাদৃশ্যতা ছিল। এ সাদৃশ্যতা শুধু

বাহ্যিকভাবে ছিল না; বরং বাতেনীভাবেও ছিল। জাহেরী সাদৃশ্যতা সম্পর্কে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী মরতুজা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসসূত্রে জানা যায়, তিনি বলেছেন-

الحسن اشبه برسول الله ﷺ ما بين الصدر الى الراس و الحسين اشبه برسول الله ﷺ ما كان اسفل من ذلك۔

الترمذى : ابواب المناقب

অর্থ : হাসান (রা.) বক্ষ থেকে মাথা পর্যন্ত রাসূল (দ.) এর সাথে বেশি সাদৃশ্যময় ছিল। আর হোসাইন (রা.) বক্ষ থেকে পা পর্যন্ত হুযুর (দ.) এর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যময় ছিল। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল মানাক্বিব)

এছাড়া বর্ণনাসমূহে এমনও বর্ণনা করা হয়েছে যে, উভয় শাহজাদা আক্বা (দ.) এর সাথে এতই বেশি সাদৃশ্যময় ছিলেন যে, যদি উভয়ে একত্রিত হতেন তখন উভয়কে দেখলে তাঁর (দ.) ছবি মনে হত।

অতএব, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হুযুর আকরম (দ.) এর বেছাল শরীফের পরে যদি কখনও তাঁর জিয়ারতের জন্য অস্থিরতা অনুভব করতেন এবং তাঁদের দৃষ্টি নবীয়ে আকরম (দ.) এর পবিত্র চেহারা মুবারক দেখার জন্য উদগ্রীব হত, তখন হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও ইমাম হোসাইন (রা.) উভয়কে সামনে একত্রিত করে দেখে নিতেন। এভাবে উভয়কে একই সময়ে দেখে নবী করিম (দ.) এর আপাদমস্তক দেখার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হত।

হযরত উকবা ইবনুল হারেছ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আসরের নামায পড়ে বের হলেন এবং কোথাও যাওয়ার জন্য চলতে থাকলেন। সেসময় তাঁর সাথে হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) রাস্তার মধ্যে দেখলেন যে, হযরত হাসান (রা.) বাচ্চাদের সাথে খেলছেন। তিনি তাঁকে আপন কাঁধে উঠিয়ে নিলেন এবং বলতে লাগলেন-

بابى مشبه بالنبى ﷺ ليس شبيها بعلى و على يضحك ۔مشكوة المصابيح : كتاب المناقب

অর্থ : আমার পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। ইনি (হাসান রা.) নবী আকরম (দ.) এর সাথে খুব বেশি সাদৃশ্যময় এবং আলীর সাথে কম সাদৃশ্যময়। তা শুনে হযরত আলী (রা.) হাসতে লাগলেন। (মিশকাতুল মাসাবিহ)

হযরত আবু হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত-

رايت رسول الله ﷺ فكان الحسن بى على يشبهه ۔ الترمذى : ابواب المناقب

অর্থ : আমি রাসূল (দ.)কে দেখেছি, হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) তাঁর সাথে বেশী সাদৃশ্যময় ছিলেন। (সুনানে তিরমিযী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল মানাক্বিব)

তিরমিযী শরীফেরই বর্ণনা- হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন- আমি ইবনে যিয়াদের কাছে ছিলাম। সেসময় হযরত হোসাইন (রা.)'র শির মুবারক আনা হল। তখন সে একটি ছড়ি দিয়ে তাঁর নাকের ওপর মারছিল এবং বলছিল- 'তার মত কোন সৌন্দর্যময় লোক আমি দেখিনি। তার স্মরণ কেন করা হয়?' হযরত আনাস (রা.) বললেন- اما انه كان من اشبههم برسول الله ﷺ ۔ الترمذى : ابواب المناقب

অর্থ : হোসাইন (রা.) সেসব লোকের মধ্যে ছিলেন, যিনি রাসূল (দ.) এর সাথে সবচেয়ে সাদৃশ্যময় ছিলেন। (সুনানে তিরমিযী, ২য় খণ্ড)

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে আরও বর্ণিত আছে-

لم يكن احدا اشبه بالنبى ﷺ من الحسن بن على ۔ مشكوة المصابيح: كتاب المناقب





অর্থ : নবী করিম (দ.) এর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যময় হযরত হাসান ইবনে আলী ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

হযরত আনাস (রা.) ইমাম হোসাইন (রা.) সম্পর্কেও বলেছেন, তিনিও রাসূল (দ.) এর সাথে খুব বেশি সাদৃশ্যময় ছিলেন। (মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল মানাক্বিব)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ হতে সহজেই বুঝা যায় যে, হাসনাইন করীমাইন হুযুর আকরম (দ.) এর সাথে পরিপূর্ণ জাহেরীভাবে সাদৃশ্যময় ছিলেন।

**হুযুর (দ.) এর সাথে বাতেনী সাদৃশ্য :**

হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র রাহমাতুল্লিল আলামিন (দ.)'র সাথে শুধু বাহ্যিক সাদৃশ্য ছিল না; বরং তাঁর (দ.) সাথে বাতেনী সাদৃশ্যও ছিল।

হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমার মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি হুযুর (দ.) এর সাথে কখন দেখা করেছিলে? আমি বললাম, তাঁর সাথে তো অনেক আগেই আমার দেখা হয়েছে। এটা শুনে আমার মা পেরেশান হলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমাকে অনুমতি দিন, মাগরিবের নামায আমি হুযুর আকরম (দ.) এর সাথে পড়ব এবং আমার ও তোমার জন্য দোয়া চাইব। অতএব, আমি হুযুর (দ.) এর দরবারে হাজির হলাম, তাঁর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। এমনকি ইশার নামাযও আদায় করলাম। তারপর তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন। আমিও তাঁর পিছু নিলাম। তিনি আমার চলার আওয়াজ শুনে বললেন- কে, হুযায়ফা নাকি? আমি আরয করলাম: জ্বি - হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন- তোমার কি সমস্যা? আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার মাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর তিনি বললেন- এটি একটি ফেরেশতা, যে এ রাতের আগে কখনও পৃথিবীতে আসেনি; সে আল্লাহর নিকট অনুমতি চাইল যে, সে আমাকে সালাম করার জন্য হাজির হবে এবং আমাকে এ সুসংবাদ দেবে যে,

فاطمة سيدة نساء اهل الجنة و ان الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة۔ الترمذى : ابواب المناقب

অর্থ : হযরত ফাতেমা জান্নাতের রমনীদের সর্দার; আর হাসান (রা.) ও হোসাইন (রা.) উভয়ে জান্নাতের যুবকদের সর্দার। (তিরমিযী, কিতাবুল মানাক্বিব)

হুযুর (দ.) উভয় জাহানের সর্দার। আর তিনি হাসনাইন করীমাইনকে জান্নাতের যুবকদের সর্দার সাব্যস্ত করেছেন। একথা দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য যে, জান্নাতে যারাই থাকবে সবাই যুবকই হবে। যেভাবে নবী করিম (দ.) এর সর্বজন গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব অর্জিত হয়েছে, ঠিক সেভাবে হাসনাইন করীমাইন (রা.)কেও সর্বজন নের্তৃত্ব দান করা হয়েছে। হাসনাইন করীমাইনকে সর্বজন নের্তৃত্ব দান করা এটাই প্রমাণ করে যে, হুযুর (দ.) এর সাথে তাঁদের বাতেনী সাদৃশ্য রয়েছে।

এভাবে হুযুর (দ.) আরও ইরশাদ করেছেন-

ان الحسن و الحسين هما ريحانتاى من الدنيا۔ مشكوة المصابيح : كتاب المناقب

অর্থ : নিশ্চয় হাসান ও হোসাইন (রা.) দুনিয়াতে আমার দু'টি ফুল। (মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল মানাক্বিব)

প্রকাশ থাকে যে, ফুলের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও খুশবো নিজের হয় না। এই সৌন্দর্য্য ও খুশবো আসলে মূলেরই হয়। আর এই দুই ফুলের (হাসান ও হোসাইন) নিকট নবী করিম (দ.) থেকে সৌন্দর্য্যের ফয়েজ মিলেছে। হাসনাইন করীমাইনকে ফুল বলার দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে, তাঁর সাথে তাঁদের রূহানী সাদৃশ্য রয়েছে।

নবীয়ে আকরম (দ.) এর সাথে হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র বাতেনী এবং রূহানী সাদৃশ্যতার অনুমান একথাতেই বুঝা যায় যে, একজনের ভালবাসা অন্যজনের ভালবাসা হিসেবে এবং একজনের শত্রুতা অপরজনের সাথে শত্রুতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হাসানাইন করীমাইন (রা.)কে মুহাব্বত করা রাসূল করিম (দ.)কে মুহাব্বত করার নামান্তর; এবং হাসনাইন করীমাইন (রা.)'র সাথে শত্রুতা পোষণ করা হুযুর (দ.)'র সাথে শত্রুতা করার নামান্তর।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর (দ.) বলেছেন-

من احبهما احبنى و من احبنى احبه الله و من احبه الله ادخله الجنة و من ابغضهما ابغضنى و من ابغضنى ابغضه الله ومن ابغضه الله ادخله النار۔ المستدرك :١٦٦

অর্থ : যে তাদের উভয়কে ভালবাসবে সে যেন আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল সে আল্লাহকে ভালবাসল। আর যে আল্লাহকে ভালবাসল, তাকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে তাদের উভয়ের সাথে শত্রুতা রাখল, সে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করল। আর যে আমার সাথে শত্রুতা করল, সে আল্লাহর সাথে শত্রুতা পোষণ করল। আর যে আল্লাহর সাথে শত্রুতা পোষণ করল, তাকে আল্লাহ তায়ালা দোযখে প্রবেশ করাবেন। (আল মুসতাদরাক লিল হাকেম, ৩য় খণ্ড, ১৬৬পৃ.)

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ও ইমাম হোসাইন (রা.) উভয়ে হুযুর আকরম (দ.) এর সাথে বাতেনী সাদৃশ্যতার প্রতিবিম্ব ছিল। এই কথার প্রমাণ এরচেয়ে আর কি বেশি হতে পারে যে, মাহবুবে খোদা (দ.) ইরশাদ করেছেন- حسين منى و انا من حسين احب الله من احب حسينا۔ الترمذى : ابواب المناقب

অর্থ : হোসাইন (রা.) আমার থেকে এবং আমি হোসাইন (রা.) থেকে। যে হোসাইনকে ভালবাসবে আলল্লাহ তাকে ভালবাসবে। (সুনানে তিরমিযী, ২য় খণ্ড, মানাকিব অধ্যায়)

**حسين منى এর অর্থ :**

হুযুর (দ.) এর বাণী حسين منى (হোসাইন আমার থেকে) তো বুঝা যায়। কেননা, তিনি তার সন্তান ও নাতি। তিনি (দ.) পূর্ণ সত্তা আর হোসাইন (রা.) তাঁরই অংশ। কিন্তু و انا من حسين (আমি হোসাইন থেকে) একথা কিভাবে বুঝে আসবে? কেননা কিছু অংশ তো পরিপূর্ণ সত্তা থেকে হয়, কিন্তু পরিপূর্ণ সত্তা কিছু অংশ থেকে হয় না। সন্তান তো বাবা থেকে হয়, নাতি নানা থেকে হয়। কিন্তু পিতা সন্তান থেকে, নানা নাতি থেকে হয় না। যদি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহলে এ হাদীসের অর্থ বুঝা যায়।

حسين منى থেকে হুযুর (দ.) ঐ বিষয়ের প্রতি ইশারা করেছেন যে, ইমাম হোসাইন (রা.) যা কিছু হোক না কেন তার মধ্যে জাহেরী ও বাতেনী যা সৌন্দর্য মাধুর্য খুশবো আছে, তার সবকিছুই আমার থেকে প্রাপ্ত এবং و انا من حسين থেকে তিনি ঐ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমার ফাযায়েল এবং কামালাত এর এক প্রকার প্রকাশ তার মাধ্যমে হবে। আমার ফযিলত ও কামালাতের একটি দিক শাহাদাতের পরিপূর্ণ প্রকাশ হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর মাধ্যমে হবে।

অতএব, আক্বায়ে দু'জাহান (দ.) এর গোপন শাহাদাত যার শুরু খায়বার যুদ্ধে হয়েছিল তার পূর্ণতা এভাবে হয়েছে যে, হযরত ইমাম হাসান (রা.) কে বিষপান করোনো হয়েছিল। যার ফলে তার তন্ত্রী সত্তর টুকরো হয়ে বের হয়ে গিয়েছিল। আর হুযুর (দ.) এর প্রকাশ্য শাহাদাত যার শুরু হয়েছিল উহুদ যুদ্ধে, তার পূর্ণতা কারবালার ময়দানে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।





## ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত : নবীর (দ.) শাহাদাতের পূর্ণ প্রকাশ

হযরত ইমাম হাসান (দ.) এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) উভয়ের শাহাদাতে নবী আকরম (দ.) এর শাহাদাতের পরিপূর্ণ প্রকাশ ছিল। জাহেরীভাবে তো হাসনাইনে করীমাইনের শাহাদাত হুযুর (দ.) এর শাহাদাতের পরিপূর্ণ প্রকাশ হওয়াটা বুঝে আসে না। কিন্তু একটি উদাহরণ দ্বারা একথাটির সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

একটি গাছের দুটি শাখায় ফল ধরেছে। তো বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা বলা যাবে যে, এই ফল শাখা থেকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ফল শাখার নয়; বরং মূল গাছের, যা শাখার আকৃতিতে প্রসারিত হয়ে দেখা যাচ্ছে। ঠিক সেভাবে রহমতে দু'আলম (দ.) হলেন- 'শাজরে নবুওয়াত' বা নবুওয়াত বৃক্ষ। আর এই গাছের একটি শাখা ইমাম হাসান (রা.) এর শাখায় বাহ্যিকভাবে অপ্রকাশ্য শাহাদাতের ফল ধরেছে। আর হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাখায় প্রকাশ্য শাহাদাতের ফল ধরেছে। বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, অপ্রকাশ্য শাহাদাত ইমাম হাসান (রা.) এর আর প্রকাশ্য শাহাদাত ইমাম হোসাইন (রা.) এর। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ইমাম হাসান (রা.) এর অপ্রকাশ্য শাহাদাত হুযুর (দ.) এর অপ্রকাশ্য শাহাদাতের এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর প্রকাশ শাহাদাত আক্বা (দ.) এর প্রকাশ্য শাহাদাতের পরিপূর্ণ প্রকাশ। উভয়ই শাখার ফল হাসান (রা.) এবং হোসাইন (রা.) এর ফল নয়; বরং শাজরে মুস্তফা (দ.) বা নবীবৃক্ষের ফল।

**হুযুর আকরম (দ.) এর ছেলে সন্তান না থাকার কারণ :**

হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাতকে হুযুর আকরম (দ.) এর শাহাদাতের পূর্ণতা সাব্যস্ত করা কোন আকস্মিক অথবা দূর্ঘটনা অথবা কারও কল্পনাপ্রসূত ধারণা নয়, বরং প্রথম দিন থেকে আল্লাহর ইচ্ছা এই বিষয়ের ফায়সালা করেছিল যে, নবী করিম (দ.) এর অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য শাহাদাতের পরিপূর্ণ প্রকাশ হাসনাইন করীমাইন (রা.) এর ওপর হবে।

মাহবুবে খোদা (দ.) এর অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য শাহাদাত এর প্রকাশ তার সত্তায় হতে পারত না। কেননা আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা و الله يعصمك من الناس۔ المائدة : ٦٧ অর্থাৎ 'আর আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন' একথাটির বিরোধী ছিল।

এই শাহাদাতের প্রকাশ দুইভাবে হতে পারত। প্রথমত: এটা যে হুযুর (দ.) এর ছেলে সন্তান থাকত, যার ওপর এই শাহাদাতের প্রকাশ হত। কিন্তু এটা সম্ভব ছিল না, কেননা হুযুর (দ.) 'খাতেমুন নবীয়্যিন'। কুরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

ما كان محمدا ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين ۔ الاحزاب : ٤٠

হুযুর পাক (দ.) এর শাহযাদা শৈশবকালে ইনতেকাল করেছেন। যেহেতু তিনি খাতেমুন নবীয়্যিন এবং সকল নবীর (আ.) ওপর তাঁর ফযিলত একথা সাব্যস্ত করে যে, তিনি (দ.) কোন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের পিতা হবেন না। সেজন্য পূর্ববর্তী নবীগণ (আ.) যখন আল্লাহর নিকট দাঁড়াতেন, তখন নিজেও নবী হতেন এবং তাঁদের ছেলেও নবী হতেন। এটা দুইগুণ ফযিলত। আল্লাহ তায়ালা হুযুর (দ.) কে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের পিতা বানান নি। কেননা যদি সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হত আর নবুয়্যত না পেতেন তাহলে ফযিলতের মধ্যে কম হয়ে যেত। যদি সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হত এবং নবুওয়াত পেত তবে হুযুর (দ.) 'খাতেমুন নবীয়্যিন' হতেন না।

শাহাদাতের প্রকাশের দ্বিতীয় প্রকার এটা ছিল যে, তাঁর (দ.) অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য শাহাদাতের পূর্ণতা

কোন এমন শরীরের ওপর হবে যে, তার সাথে গভীর সম্পর্কের কারণে সেই শরীরে সংঘটিত হওয়া আমল তাঁর (দ.) শরীরের ওপর হওয়াটা সাব্যস্ত করে। অতএব, সে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা হাসনাইন করীমাইন (রা.) কে নির্বাচিত করলেন। তাঁদের শুধু তাঁর (দ.) অংশ হওয়ার গৌরব অর্জিত হয়নি; বরং জাহেরী ও বাতেনীভাবে তাঁর সাথে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য ছিল।

**হাসান (রা.) ও হোসাইন (রা.)'র নাম রাখার কারণ :**

হাসনাইনে করীমাইন (রা.)'র জন্মের পর তাদের এই নাম তাদের পিতা মাতা রাখেন নি; বরং হুযুর আকরম (দ.) স্বয়ং রেখেছেন। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত-

لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول اللهﷺ فقال اروني ابني ما سميتوه قال قلت حربا قال بل هو حسن فلما ولد الحسين سميته حربا فجاء رسول اللهﷺ فقال اروني ابني ما سميتوه قال قلت حربا قال بل هو حسين ـ المسند لاحمد: ٩٨

অর্থ : যখন হাসান জন্মগ্রহণ করলেন তখন আমি তাঁর নাম 'হারব' রাখলাম। রাসূল (দ.) তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, আমাকে আমার সন্তান দেখাও; তোমরা তার কি নাম রেখেছো? হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি আরয করলাম- 'হারব'। তিনি (দ.) বললেন- না, এটা তো 'হাসান'। অতঃপর যখন হযরত হোসাইন (রা.) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন আমি নাম রাখলাম 'হারব'। রাসূলুল্লাহ (দ.) তাশরীফ আনলেন এবং বললেন- 'আমাকে আমার সন্তান দেখাও, তোমরা তার কি নাম রেখেছো?'। হযরত আলী (রা.) বললেন- আমি আরয করলাম- হারব। তিনি (দ.) বললেন- না, এ তো হোসাইন। অতঃপর যখন আমার তৃতীয় সন্তান জন্ম নিল, তারপর তার নাম রাখলাম 'হারব'। নবী করিম (দ.) তাশরীফ আনলেন এবং বললেন- আমার সন্তান দেখাও, তোমরা তার নাম কি রেখেছো? হযরত আলী (রা.) বললেন- আমি আরয করলাম- হারব। তিনি (দ.) বললেন- না এ তো মুহসিন। অতঃপর বললেন- আমি তাদের নাম হারূন (আ.) এর সন্তান শব্বার, শব্বীর ও মুশাব্বির এর নামের ওপর রাখলাম। (মুসনাদে ইমাম আহমদ- ১:৯৮)

হুযুর (দ.) উভয় শাহযাদার নাম বদল করে হাসান ও হোসাইন কেন রাখলেন? এটা এমন একটি প্রশ্ন যার উত্তর সহজে বুঝে আসেনা। কিন্তু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, প্রথম নাম বদল করে হাসান এবং দ্বিতীয় নাম বদল করে হোসাইন নাম রাখার মধ্যে একটি বিশেষ হেকমত ছিল। তা এই যে, হাসান (রা.) এবং হোসাইন (রা.) দুটি শব্দের মধ্যে (হুসনা) শব্দটি লুকায়িত। সৌন্দর্যকে 'হুসনা' বলা হয়। হুসনা এর মূল হাসান এবং হোসাইন উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। কোন কোন অভিধানে হুসনা শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে- الشهادة لانها حسنة العواقب অর্থাৎ হুসনা শাহাদাতকে বলা হয়। তা এজন্য যে, এটা সৌন্দর্যময় পরিণতি।

নবী আকরম (দ.) পয়গাম্বরের দৃষ্টিতে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানতেন যে, হযরত ইমাম হাসান (রা.) তাঁর অপ্রকাশ্য শাহাদাতের প্রকাশের জন্য নিয়েছেন এবং হোসাইন (রা.) তাঁর প্রকাশ্য শাহাদাতের প্রকাশের জন্য জন্ম নিয়েছেন। যেন শহীদ হওয়ার এই সৌন্দর্যময় পরিণাম আছে তা তাঁর নামের সাথে প্রযোজ্য হয় এজন্য ইমাম হাসানের নামা শাব্বারের পরিবর্তে হাসান এবং দ্বিতীয় নাম শাব্বীরের পরিবর্তে হোসাইন রেখেছেন। যেন এ নাম স্বয়ং প্রকাশ্য শাহাদাতের পরিপূর্ণ প্রকাশ বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে নবী আকরম (দ.) উভয় শাহযাদার নাম বদল করে আল্লাহর ইচ্ছার দিকে ইঙ্গিত করলেন যে, উভয় শাহযাদার ভাগ্যলিপি শাহাদাতের নেয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ।





**কিছু সুক্ষকথা :**

উভয় শাহযাদার নাম হাসান (রা.) ও হোসাইন (রা,) রাখার কারণে কিছু রহস্য অনুধাবন হয় :

১. হযরত হাসান (রা.) এর শাহাদাত রহস্যময় ছিল এবং হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত প্রকাশ্য ছিল। রহস্যময় শাহাদাত গোপন শাহাদাতকে বলে। পক্ষান্তরে, প্রকাশ্য শাহাদাত জাহেরী শাহাদাতকে বলে। অতএব, ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত গোপন শাহাদাত ছিল। এজন্য তাঁর শাহাদাতের কথা আজও গোপন রয়েছে। আর হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত যেহেতু প্রকাশ্য ছিল, তাই তাঁর শাহাদাতের কথা পৃথিবীর সবখানেই আলোচিত হয়ে আসছে।

২. আরবী ভাষার ব্যাকরণে একটি বিধান যে, যে শব্দে অক্ষর বেশি হবে তার অর্থও বেশি বুঝাবে এবং যে শব্দে অক্ষর কম হয় তার অর্থও কম বুঝাবে। 'হাসান' শব্দে তিন অক্ষর এবং 'হোসাইন' শব্দে চার অক্ষর। অতএব, বড় নাতি থেকে এমন শাহাদাত সংঘটিত হয়েছে যা আভ্যন্তরীণভাবে ছোট ছিল। সুতরাং বড় নাতির নাম 'হাসান' রাখা হয়েছে, যা তিন অক্ষরে প্রকাশ। আর ছোট নাতির এমন শাহাদাত প্রকাশ পেয়েছে যে, যা খুবই বড়। সুতরাং ছোট নাতির নাম হোসাইন রাখা হয়েছে, যা চার অক্ষরের সমাহার। হাসান এবং হোসাইন (রা.) উভয় নামের অক্ষর কমবেশি হওয়ার ওপর একথাই বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁদের মধ্যে কার ওপর কোন শাহাদাত সংঘটিত হবে।

৩. যখন হযরত ইমাম হাসান (রা.) জন্ম নিলেন, তখন হুযুর (দ.) তাঁর নাম 'শাব্বার' না রেখে 'হাসান' রাখলেন। আর যখন ইমাম হোসাইন (রা.) জন্ম নিলেন তখন হুযুর (দ.) 'শাব্বীর' না রেখে 'হোসাইন' রাখলেন। 'হোসাইন' শব্দে 'ইয়া' তাসগীর (ছোট) অর্থে বুঝায়। এ নামকে তিনি প্রথমে রাখেননি। কেননা, তাঁর জানা ছিল যে, এই সন্তানের দ্বারা আমার শাহাদাতের একদিক পূর্ণ হবে। এরপরে আরও একজন ছোট ভাই জন্ম নেবে যার দ্বারা আমার শাহাদাতের অন্যদিক পূর্ণ হবে। সুতরাং বড়জনের নাম 'হাসান' এবং ছোটজনের নাম 'হোসাইন' রাখলেন।

উপরোল্লেখিত আলোচনার মাধ্যমে একথা ভালভাবে বুঝা গেল যে, ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত মূলত হুযুর (দ.) এর পবিত্র সীরাতের একটি অধ্যায়, যা و الله يعصمك من الناس ـ المائدة : ٦٧ এর আল্লাহর প্রতিজ্ঞার বিরোধী হওয়ার কারণে তাঁর (দ.) জাহেরী হায়াতে লিখা হয়নি। যা লিখার জন্য আল্লাহ তায়ালা হুযুর (দ.) এর নাতি যাকে হুযুর (দ.) নিজের সন্তান বলে ডাকতেন তাকেই নির্বাচিত করেন। এভাবে ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত সীরাতুন্নবী (দ.) এর একটি অধ্যায়। হুযুর (দ.) এর জীবনীর নানাদিকের একটি দিক এবং তাঁর ফাযায়েল ও কামালাতের মধ্যে একটি কামাল হতে সবসময়ের জন্য মর্যাদাবান, কবুলিয়্যাত ও স্থায়িত্ব পেয়ে গেল।

---

মূল- শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল ক্বাদেরী

অনুবাদক : মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আবছার তৈয়বী।

# প্রিয়নবী (দ.) ও আহলে বায়তে রাসূল (দ.)'র মুহাব্বত ঈমানের পরিচায়ক

মাওলানা ছাইফুর রহমান নিজামী*

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাহমাতিল্লিল আলামিন। ওয়াআলিহী, ওয়া আসহাবিহী, ওয়া আযওয়াজিহী, ওয়া আহলে বাইতিহী আজমাঈন।

সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর অফুরন্ত শুকরিয়া জ্ঞাপন ও প্রিয়নবীর ওপর অগনিত দরূদ ও সালাম পেশ করছি। প্রতিবছরের মত এবছরও মহাসমারোহে চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত জমিয়াতুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গনে জনাব মাওলানা জালালুদ্দিন আলক্বাদেরী, প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা ও খতিব জমিয়াতুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম এর তত্ত্বাবধানে কারবালার গৌরবোজ্বল সংগ্রামের ইতিহাস তথা দুনিয়ার বুকে একমাত্র সত্যভিত্তিক জীবন প্রিয়নবীর দ্বীনকে হেফাযত করার দৃঢ় অঙ্গিকার ও সংকল্পে আবদ্ধ মহান আহলে বায়তে রাসূলের পবিত্র শাহাদাতের ইতিহাস পর্যালোচনা উপলক্ষে ১০ দিন ব্যাপী শাহাদাতে কারবালা মাহফিল আয়োজকদের আমি আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই এবং এতে আমিও অন্যান্য সকল নবীপ্রেমিক সুন্নী জনগণ আনন্দিত।

নবী পাক (দ.) ও তাঁর আওলাদকে ভালবাসা ঈমানের পরিচায়ক। প্রিয়নবী (দ.) হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কে বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁদের ঘ্রাণ নিতেন। (তিরমিযী)

হযরত হাসান (রা.) প্রিয়নবীর সিনা মুবারক হতে শির মুবারকের মত ছিলেন এবং হযরত হোসাইন (রা.) প্রিয়নবীর অবশিষ্ট শরীর মুবারকের মত ছিলেন। (তিরমিযী)

আল্লাহ পাক বিশেষ ফেরেশতার মাধ্যমে প্রিয়নবীকে অবগত করিয়েছেন যে, হযরত ফাতেমা (রা.) বেহেশতী নারীদের সর্দার। আর হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) বেহেশতী যুবকদের সর্দার। (তিরমিযী)

প্রিয়নবী (দ.) বলেছেন- আমার পরিবারের উদাহরণ তোমাদের নিকট হযরত নূহ (আ.) এর কিশ্‌তীর মত। যারা বিশ্বাস করে নূহ (আ.) এর কিশ্‌তীতে আরোহন করেছিলেন তারা মহাপ্লাবণের করাল গ্রাস হতে মুক্তি পেয়ে গেছে। আর যারা উঠে নাই তারা ডুবে মরেছে। (ইমাম আহমদ)

অর্থাৎ যারা প্রিয়নবীর পরিবার তথা আওলাদে রাসূলের মুহাব্বতে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করেছে, তাঁদেরকে মান্য করেছে তারাই নাজাতপ্রাপ্ত। রাসূলে পাক (দ.) প্রার্থনা করেছেন- হে আল্লাহ! আমি হাসান ও হোসাইনকে ভালবাসি, তুমিও তাদেরকে ভালবাস। আর যারা তাদেরকে ভালবাসবে তুমি তাদেরকেও ভালবাসিও। (তিরমিযী)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে পাক (দ.) হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.) এর শরীরের ঘ্রাণ নিতেন, তাঁদেরকে জড়িয়ে ধরতেন এবং বলতেন- যারা আমাকে ভালবাসবে, হাসান ও হোসাইনকে ভালবাসে, তাদের মাতাপিতাকে ভালবাসে, তারা কিয়ামত দিবসে আমার সাথে আমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। (তিরমিযী)

রাসূলে পাক (দ.) আরো বলতেন- ফাতিমা আমার শরীরের অংশ বিশেষ। যা তাকে রাগান্বিত করে তা আমাকেও রাগান্বিত করে।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে ফাতেমাকে গালিগালাজ করে সে কাফের। (মাদারেজ ২:৫৩৩)

আমরা সুন্নীগণ আহলে বায়তে রাসূলের মায়ার নৌকায় আরোহন করেছি। আমরা কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা হতে পরিত্রাণ পাব। আর যারা এতে আরোহন করেনি তারা ধ্বংস হবে। যেমন খারিজীরা আহলে বায়তে রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত। আর যারা সাহাবীগণকে মানে নাই, তারাও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। (মিরকাত ৫:৬১০)

**প্রিয়নবীর (দ.) আত্মীয় বলতে যাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে তাঁরা নিম্নরূপ :**

১. প্রিয়নবীর দাদা আবদুল মুত্তালিবের দিক হতে নিকটবর্তীগণকে বুঝানো হয়।

২. প্রিয়নবীর সাহাবীগণ (রক্ত সম্পর্কিত)।

৩. হযরত আলী, মা ফাতেমা, হাসান, হোসাইন, মুহসিন ও উম্মে কুলসুম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) হযরত ফাতেমা (রা.)'র দিক হতে।

৪. হযরত জাফর বিন আবু তালেব এবং তাঁর আওলাদগণ। যেমন- আবদুল্লাহ, আউন, মাহমুদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)।

৫. আক্বীল ইবনে আবু তালেব এবং তাঁর আওলাদ মুসলিম ইবনে আকিল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)।

৬. হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, তাঁর আওলাদ ইয়াআলি, ওমারা ও ওমামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)।

৭. হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর ১০ সন্তান। যেমন- হযরত ফযল, আবদুল্লাহ, কাসেম, ওবাইদুল্লাহ, হারেস, মাবাদ, আবদুর রহমান, কাসীর, আউন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)।

৮. হযরত মআতাব ইবনে আবি লাহাব, আব্বাস ইবনে আবি লাহাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। আব্বাস ইবনে আতাবা ইবনে আবি লাহাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।

৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর বোন জিনাদরাআ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।

১০. হযরত আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর ছেলে হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।

১১. হযরত রাউফল বিন হারেস বিন আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর দুই ছেলে হযরত মুগীরা ও হারিস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।

১২. হযরত উমাইয়া, আরওয়া, আতেকা, সুফীয়া, হযরত আবদুল মুত্তালিবের মেয়ে ছফীয়া মুসলিম হয়েছিলেন। বাকীদের মধ্যে মতভেদ আছে।

১৩. যাদেরকে প্রিয়নবী (দ.) স্বীয় কালো কম্বলের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন তারা হলেন- হযরত আলী, মা ফাতেমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। নবীজি আরও বলেছিলেন- হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবার। এর মধ্যে প্রিয়নবীর স্ত্রীগণও শরীক ছিলেন।

প্রিয়নবীর পরিবারকে মুনাফিক ব্যতিত কোন মুসলমান মুহাব্বত না করে পারে না। যারা প্রিয়নবীর পরিবারকে শহীদ করেছে, বিশেষ করে ইয়াযিদ ও তার সাথীরা কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে মুসলিম জাতির ইমামে আকবর হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)কে শহীদ করেছে, তারা বেহেশতী নয়। ইয়াযিদ হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র শহীদ হওয়ার ওপর রাজি ছিল এবং সে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদাতের সুসংবাদ চেয়েছিল এবং প্রিয়নবীর আওলাদকে অসম্মান-অপমান করেছিল। এটা যুগে যুগে সকলের কাছে সুবিদিত।

আল্লামা ইবনে হাম্বল লিখেছেন- আমরা ইয়াযিদের ওপর লা'নত করতে ইতস্ততঃ করি না। বরং তাকে





আমরা কাফের বলি। (শাজরাতুজ জাহাব, ১:৬১)

কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী লিখেছেন- সালেহ ইবনে আহমদ বিন কাতল বলেছেন- আমি আমার পিতা আহমদ বিন হাম্বল হতে ইয়াযিদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। প্রত্যুত্তরে আমার পিতা বলেছিলেন- হে আমার সন্তান! কোন ব্যক্তি মু'মিন হয়ে ইয়াযিদের মায়ার কথা বলতে পারে না। কেননা, আল্লাহ পাক স্বয়ং পবিত্র কুরআনে ইয়াযিদী চরিত্রের লোকদের ওপর লা'নত দিয়েছেন। যেমন- আবার কী তোমার থেকে আশা আছে যে, তুমি যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পেয়ে যাও, তবে তুমি দেশের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে, আর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে দেবে। এমন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ লা'নত করেছেন, তাকে বধির ও অন্ধ করে দিয়েছেন। (তাফসীরে মাযহারী, পৃ. ৪৩৪)

আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী (র.) লিখেছেন- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আরো বলেছেন, হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)কে ক্বতল করার চেয়ে আর বড় ফ্যাসাদ ও গোলযোগ এ দুনিয়াতে আর হতে পারে না।

আল্লামা আলুসী বাগদাদী (র.) লিখেছেন- আলেমদের একটি দল ইয়াযিদের কাফের হওয়া এবং তার ওপর লা'নত দেয়ার পক্ষে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন। আল্লামা জুজী, আবু ইয়ালা, আল্লামা তাফতাজানী, আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী প্রমূখ প্রনিধানযোগ্য।

আল্লামা আবুল ওয়ারদী তার ইতিহাসে লিখেছেন- যখন প্রিয়নবী (দ.)'র পরিবারের বন্দীদেরকে সিরিয়ায় আনা হলো তখন ইয়াযিদ তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিল, 'আমি রাসূলুল্লাহ (দ.) থেকে আমার ঋণ উসুল করে নিয়েছি।

আল্লামা আলুসী (র.) স্বীয় তাফসীর রূহুল মা'আনীতে উল্লেখ করেছেন- খবিস ইয়াযিদ প্রিয়নবীর (দ.) রিসালতকে বিশ্বাস করত না। সে পবিত্র খানায়ে কা'বা ও মদীনা শরীফের মধ্যে প্রিয়নবীর আওলাদে পাকগণের অসম্মানী করেছে।

তাই প্রতি বছর আওলাদে রাসূলের স্মরণে এ ধরণের মহাসমারোহে সুন্নী মহাসম্মেলনের উদ্যোগ সমগ্র মুসলিম জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবিচল থাকার অনুপ্রেরণা, শক্তি, সাহস যোগাবে এবং কাফের ইয়াযিদসহ সকল বাতিল মত পথ থেকে বেঁচে থাকার এক বড় উপায় ও অবলম্বন। এ ধরণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সকল সুন্নী আলেম, পীর-মাশায়েখের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পীরে কামেল হাফেজ ক্বারী হযরতুল আল্লামা
ছাইফুর রহমান নিজামী শাহ
(আম্বাবাদের পীর সাহেব কেবলা)

# শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা পরিষদ

জমিয়াতুল ফালাহ কমপ্লেক্স, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

## উপদেষ্টা পরিষদ

১. হযরতুলহাজ্ব শাহ্ সূফী সৈয়দ আব্দুল মুনয়িম - সাজ্জাদানশীন, ইছাপুর দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।
২. আলহাজ্ব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী - সাবেক মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও সভাপতি, জমিয়তুল ফালাহ মুসল্লী কমিটি, চট্টগ্রাম।
৩. আলহাজ্ব সূফী মুহাম্মদ মিজানুর রহমান - চেয়ারম্যান, পি.এইচ.পি. গ্রুপ, চট্টগ্রাম।

## কার্যকরী পরিষদ

১. আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-ক্বাদেরী - সভাপতি
২. আলহাজ্ব মাওলানা নূর মোহাম্মদ সিদ্দিকী - সহ সভাপতি
৩. আলহাজ্ব এম এ মনছুর (ও.আর. নিজাম রোড) - সহ সভাপতি
৪. আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ (ও.আর. নিজাম রোড) - সহ সভাপতি
৫. আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ (সাবেক কমিশনার) - সহ সভাপতি
৬. আলহাজ্ব এস এম আবদুল লতিফ - সাধারণ সম্পাদক
৭. আলহাজ্ব আনোয়ারুল হক - যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক
৮. আলহাজ্ব সিরাজুল মোস্তফা - যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক
৯. আলহাজ্ব ডা. মুজিবুল হক চৌধুরী - সাংগঠনিক সম্পাদক
১০. আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল হাই মাসুম - কোষাধ্যক্ষ
১১. অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহমদ - দফতর সম্পাদক
১২. এস. এম. সিরাজুদ্দৌলাহ - প্রচার সম্পাদক

## সদস্য মণ্ডলী

১. আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন - আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া
২. আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন - আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া
৩. আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক - আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া
৪. আলহাজ্ব সেকান্দর মিয়া - সাবেক কমিশনার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
৫. আলহাজ্ব সেকান্দর মিয়া - ষোলশহর, চট্টগ্রাম
৬.আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করিম -
৭. সৈয়্যদ মোহাম্মদ মর্তুজা হোসাইন - ইফকো হাউজ, জি.ই.সি মোড়, চট্টগ্রাম
৮. এফ. এম. মাহমুদুর রহমান -
৯. আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম চৌধুরী - অটো ল্যান্ড

১০. মোহাম্মদ লেয়াকত আলী - ওয়াসা, চট্টগ্রাম।
১১. আলহাজ্ব আবুল কালাম - হালিশহর, চট্টগ্রাম।
১২. আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল হামিদ - এফ. সি. এম. এ, হালিশহর, চট্টগ্রাম।
১৩. আলহাজ্ব আলী ইমাম - আমিরবাগ, চট্টগ্রাম।
১৪. আলহাজ্ব সেকান্দর মিয়া - মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম।
১৫. আলহাজ্ব আবদুচ সত্তার চৌধুরী - মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম।
১৬. মোহাম্মদ আকবর হোসাইন - মধুবন, ব্যাটারী গলি, চট্টগ্রাম।
১৭. মোহাম্মদ রুহুল আমিন - ব্যাটারী গলি, চট্টগ্রাম।
১৮. ফজল আহমেদ - সি.টি.ভি. মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম।
১৯. মোহাম্মদ সেলিম - লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।
২০. আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ -
২১. মাওলানা মুহাম্মদ শায়েস্তা খান -
২২. মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার -
২৩. হাফেজ মুহাম্মদ সালামত উল্লাহ -

SahihAqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)





# শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা পরিষদ

জমিয়তুল ফালাহ কমপ্লেক্স, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

## আজীবন সদস্য

১. হযরতুলহাজ্ব শাহ্ সূফী সৈয়দ আব্দুল মুনয়িম - সাজ্জাদানশীন, ইছাপুর দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।
২. আলহাজ্ব সূফী মুহাম্মদ মিজানুর রহমান - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৩. আলহাজ্ব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী - পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।
৪. আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-ক্বাদেরী - অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
৫. আলহাজ্ব এস এম আবদুল লতিফ - মেট্রোপোল চেম্বার, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
৬. আলহাজ্ব আবদুল হাই মাসুম - সৈকত ট্রেডিং এজেন্সীজ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৭. আলহাজ্ব এম এ মনছুর - ও.আর. নিজাম রোড আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।
৮. শাহজাদা সৈয়দ মোহাম্মদ সিরাজুদ্দৌলা - মোহনা মঞ্জিল, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
৯. মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ - সাবেক প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাষ্ট্রিজ।
১০. হাজী আবুল কালাম - পশ্চিম নাসিরাবাদ, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
১১. মোহাম্মদ ইকবাল - আশকারদিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম।
১২. আলহাজ্ব এইচ. এম. কাদের নেওয়াজ - শুলকবহর, চট্টগ্রাম।
১৩. আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
১৪. আলহাজ্ব জাফর আহমদ - রওশন ভিলা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
১৫. আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক - রূপালী ভবন, হালিশহর, চট্টগ্রাম।
১৬. মোহাম্মদ নুরুল আবছার - ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম।
১৭. মাওলানা ছৈয়দ নুরুল কবির আল কাদেরী - পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৮. মুহাম্মদ আবদুর রহিম - লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।
১৯. এ. এন. এম. শফিউল বশর - ইমেজ সেটিং লি. আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
২০. সৈয়দ ফজলুল হক (দিদার) - রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
২১. শরফুদ্দিন আহমদ - ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
২২. আলহাজ্ব মোহাম্মদ সেকান্দর মিয়া - মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম।
২৩. মোহাম্মদ গোলাম সাদেক - লাভলেইন, চট্টগ্রাম।
২৪. শেখ শাহযাদা গোলাম আবদুল কাদের কাওকার - শাহপুর দরবার শরীফ, কুমিল্লা।
২৫. মোহাম্মদ হাছিব উদ্দীন মোল্লা - গুলশান, ঢাকা।
২৬. মোহাম্মদ ইমতিয়াজ উদ্দিন মোল্লা - গুলশান, ঢাকা।
২৭. ফাতেমা তুজ্ জোহরা - গুলশান, ঢাকা।
২৮. এম. এন. মোহাম্মদ নাছিম উদ্দীন মোল্লা - গুলশান, ঢাকা।
২৯. মোহাম্মদ আকতার পারভেজ - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৩০. মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৩১. মোহাম্মদ আমির হোসেন - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।

## আজীবন সদস্য

৩২. মিসেস সিলভিয়া রহমান আলী - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৩৩. মোহাম্মদ আলী হোসেন - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৩৪. তাজিন মিজান আনোয়ার - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৩৫. মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৩৬. মিসেস তাজরুবা বশর - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৩৭. আয়মান মিজান ইকবাল - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৩৮. নোবেদ মিজান ইকবাল - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৩৯. মিসেস শাহিদা ইকবাল - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৪০. মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৪১. তাবাসসুম মিজান মহসিন - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৪২. মাহাজাবীন মিজান মহসিন - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৪৩. হুমায়রা মিজান মহসিন - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৪৪. ভিকটর মিজান মহসিন - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৪৫. মিসেস ফাবিয়ানা মহসিন - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৪৬. মোহাম্মদ মহসিন চৌধুরী - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৪৭. মিসেস তাহমিনা রহমান - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৪৮. আলহাজ্ব মোহাম্মদ শামসুল হক - ও.আর.নিজাম রোড আ/এ, চট্টগ্রাম।
৪৯. মোহাম্মদ ওসমান গনি - ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৫০. মোহাম্মদ নুরুল আলম - দেওয়ানহাট, চট্টগ্রাম।
৫১. শেখ আবদুল্লাহ - লালখানবাজার, চট্টগ্রাম।
৫২. শেখ আমানত খান - লালখানবাজার, চট্টগ্রাম।
৫৩. মোহাম্মদ আনাম চৌধুরী - দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।
৫৪. সুফী মোহাম্মদ মোরশেদ আহমদ খন্দকার - লাকসাম, কুমিল্লা।
৫৫. আলহাজ্ব এস.এম. মর্তুজা হোসেন - নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
৫৬. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন হাজারী - লালখানবাজার, চট্টগ্রাম।
৫৭. মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী - দামপাড়া, চট্টগ্রাম।
৫৮. মোহাম্মদ আলমগীর - ফকিরহাট, চট্টগ্রাম।
৫৯. মোহাম্মদ আবদুল হামিদ - বন্দর, চট্টগ্রাম।
৬০. মোহাম্মদ আবু তাহের - খুলশী, চট্টগ্রাম।
৬১. শেখ আহমদ - পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
৬২. মোহাম্মদ লেয়াকত আলী - খুলশী, চট্টগ্রাম।
৬৩. মোহাম্মদ নুরুল আলম - জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম।
৬৪. মোহাম্মদ সোলায়মান - দামপাড়া, চট্টগ্রাম।
৬৫. মোহাম্মদ আলমগীর ইসলাম বঈদী - আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম।





## আজীবন সদস্য

৬৬. আলহাজ্ব কাজী ছৈয়দ মুহাম্মদ শামসুল আলম - পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
৬৭. শেখ শাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী - খুলশী, চট্টগ্রাম।
৬৮. মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৬৯. আলহাজ্ব নুর মোহাম্মদ - খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
৭০. দিদারুল আলম চৌধুরী - আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৭১. আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ - বলুয়ারদিঘী, চট্টগ্রাম।
৭২. শেখ মোহাম্মদ সাজেদুল হক - পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
৭৩. শামসুন্নাহার বেগম - পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
৭৪. জামাল আহমদ - পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
৭৫. প্রফেসর কামাল উদ্দিন আহমেদ - চান্দগাঁও আ/এ, চট্টগ্রাম।
৭৬. মোহাম্মদ আতাউর রহমান চৌধুরী - রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।
৭৭. আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন - দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম।
৭৮. কাজী মোহাম্মদ আহসানুল মোরশেদ - মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।
৭৯. মোহাম্মদ খায়রুল আনোয়ার - রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
৮০. মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব বাহাদুর - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৮১. তাওহীদুল আলম আল কাদেরী - হাটহাজারী দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।
৮২. আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইয়াকুব - কে.বি. ফজলুল কাদের রোড, চমেক, চট্টগ্রাম।
৮৩. মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন মোল্লা - গুলশান, ঢাকা।
৮৪. দিলশাদ আহমেদ - নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।
৮৫. মোহাম্মদ সালামত উল্লাহ - হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৮৬. সৈয়দ মহিউদ্দিন মোহাম্মদ জাকের উল্লাহ - মেট্রোপোল চেম্বার, চট্টগ্রাম।
৮৭. ড. আবদুল জলিল - কোতোয়ালী, কুমিল্লা।
৮৮. আলহাজ্ব মোহাম্মদ সোলায়মান - পরিচালক, এয়ারবাংলা ইন্টারন্যাশনাল, চট্টগ্রাম।
৮৯. মাহাবুব আলম - ১৩১, কে.বি. ফজলুল কাদের রোড, চ.মে.ক, চট্টগ্রাম।
৯০. এ.কে.এম. সরোয়ার আলম - জয়নগর, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
৯১. সৈয়দ মুহাম্মদ সেহাব উদ্দিন আলম - চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
৯২. হাজী মোহাম্মদ হোসেন - কুলগাঁও, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।
৯৩. মাশুক মোহাম্মদ সেলিম আসলাম সাইফ - আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
৯৪. আল্‌হাজ্ব মুহাম্মদ আবুল মকসুদ শিকদার - স্বজন সুপার মার্কেট, বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।
৯৫. সৈয়দ মুঈনুদ্দিন মুহাম্মদ জাকের উল্লাহ - লালখানবাজার, চট্টগ্রাম।
৯৬. মুহাম্মদ আবুল কাশেম - শ্যামলী আ/এ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।